পূজার উৎসব প্রচলিত হইয়াছে, আজ তন্নিদ্ধারণে আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি।

মহামুনি মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যে বর্ণিত হইয়াছে যে, দেবী দুর্গমাখ্য মহাসুরকে বিনাশ করিয়া দুর্গা নাম লাভ করিয়াছেন। (তত্রৈব বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরং।) দুর্গা অর্থাৎ মহাবিঘ্ন, ভববন্ধ, কুকর্ম, শোক, দুঃখ, নরক, জন্ম ও যমভয়াদি দেবীর নামে বিনষ্ট হইয়া থাকে, তজ্জন্য তাঁহাকে সকলে দুর্গা বলে। এই শেষ ব্যুৎপত্তিও সর্ব্ববাদিসম্মত। ফলতঃ যিনি প্রথম দুর্গা নামের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, শেষোল্লিখিত সাত্ত্বিকগুণসম্পন্ন ব্যুৎপত্তিগুলি তাঁহার অভিপ্রেত কি না—এখন তাহা জানিবার উপায় নাই। কোন্ কোন্ মহাত্মা প্রথম দেবী পূজা প্রকাশ করেন, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে তাহার উল্লেখ আছে। সৃষ্টির আদিতে গোলোকের রাসমণ্ডলে এবং বৃন্দাবনে পরমাত্মা কৃষ্ণ দেবীর অর্চ্চনা করেন। তৎপরে ব্রহ্মা, মধু-কৈটভ ভয়ে ভীত হইয়া দেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ ত্রিপুরারি শিব সতীর পূজা করেন। এইরূপে প্রথমে তিনি দেবতাগণ কর্ত্তৃকই আরাধিত হইয়াছিলেন। এই সমস্ত বৃত্তান্ত হইতে কিছুমাত্র ঐতিহাসিক সত্যের উপলব্ধি হয় না। দেবকীর্ত্তি স্বতন্ত্র কথা; মানুষের তাহাতে কিছুই বক্তব্য নাই। মুনি ঋষি কিম্বা কোন ভূপালাদি যদি দেবী-পূজা প্রকাশ করিতেন, তবে সময়াদি নির্দ্ধারণ করিতে অনেকটা সাহস জন্মিত। ফলতঃ আমাদিগের আচার্য্যগণের এই শৈলী ছিল, তাঁহারা যেন দেবীর প্রতি অচলা ভক্তি জন্মাইবার নিমিত্ত তাঁহাদের উপাসনা পদ্ধতির মূল দেবগণে অন্তর্নিহিত অথবা অলৌকিক কাণ্ডে পর্য্যবসিত করিতেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ হইতে আমরা ইহাও জ্ঞাত হইতেছি যে, হিঙ্গুলাপীঠে দুর্গার একটা প্রতিমা ছিল।

হিঙ্গুলায়াং তথাষ্টম্যামিষে মাসি সিতে শুভে।
শ্রীদুর্গাপ্রতিমাং দৃষ্ট্বা করোতি জন্মখণ্ডনং॥

আশ্বিন মাসের শুক্লাষ্টমীতে হিঙ্গুলায় দুর্গা প্রতিমা দর্শন করিলে পুনর্ব্বার জন্ম হয় না।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ কত দিনের পুস্তক, তাহা নিশ্চিত করিতে পারিলে দেবী-প্রতিমা কোন্ সময়ে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা কথঞ্চিৎ অবধারিত হইতে পারে। বিষ্ণুপুরাণে দৃষ্ট হয়ঃ—

ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা।
তথান্যং নারদীয়ঞ্চ মার্কণ্ডেয়ঞ্চ সপ্তমম্॥
আগ্নেয়মষ্টমঞ্চৈব ভবিষ্যং নবমং তথা।
দশমং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং লৈঙ্গমেকাদশং স্মৃতং।
বারাহং দ্বাদশঞ্চৈব স্কান্দঞ্চাত্র ত্রয়োদশম্।
চতুর্দ্দশং বামনঞ্চ কৌর্ম্মং পঞ্চদশং স্মৃতং।
মাৎস্যঞ্চ গারুড়ঞ্চৈব ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ ততঃ পরম্।

প্রথম ব্রহ্ম পুরাণ প্রণীত হইয়াছিল, দ্বিতীয় পদ্ম পুরাণ, তৃতীয় বিষ্ণু পুরাণ, চতুর্থ শিব পুরাণ, পঞ্চম ভাগবত, ষষ্ঠ নারদীয় পুরাণ, সপ্তম মার্কণ্ডেয় পুরাণ, অষ্টম অগ্নি পুরাণ, নবম ভবিষ্য পুরাণ, দশম ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, একাদশ লিঙ্গ পুরাণ, দ্বাদশ বরাহ পুরাণ, ত্রয়োদশ স্কন্দ পুরাণ, চতুর্দ্দশ বামন পুরাণ, পঞ্চদশ কূর্ম্ম পুরাণ, ষোড়শ মৎস্য পুরাণ, সপ্তদশ গরুড় পুরাণ, এবং অষ্টাদশ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

এই অষ্টাদশপুরাণের তৃতীয় স্থলে বিষ্ণুপুরাণ স্থাপিত হইয়াছে। বিষ্ণু পুরাণ পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে, অথচ পরবর্ত্তী অন্যান্য পুরাণ কয়েক খানির নাম বিষ্ণুপুরাণে দৃষ্ট হয়। পাঠক! তবে সহজেই বুঝিয়া লউন বিষ্ণুপুরাণ কেমন প্রাচীন। পূর্ব্বকালে মুনিবাক্য বলিলেই অবিতর্কিতচিত্তে তাঁহার পূজা করিতে হইত, তখন যিনি যাহা কহিতেন, তাহাই শোভা পাইত। কিন্তু যুগমাহাত্ম্যে মানবধর্ম্ম পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। এখন লোকের বিশ্বাস বিভিন্ন, মনের গতি বিভিন্ন। যুক্তিযুক্ত বাক্য হইলেই জনসমাজে আদৃত হয়। অসঙ্গত বাক্য সকলেই উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়া জ্ঞান করেন। বিষ্ণুপুরাণে অষ্টাদশপুরাণের নাম উপলব্ধি হয়, অতএব উহা সর্ব্বশেষে রচিত হইয়াছে, ইহাই সম্ভাবিত। ব্রাহ্মণদের আর একটী মহৎ রোগ আছে। বিষ্ণু-পুরাণ যদি তদ্রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে, তবে ধন্বন্তরি নাড়ী ধরিলেও তাহার প্রকৃত নিদান নিরূপিত হইবে না। ব্রাহ্মণেরা নূতন পুস্তক প্রাচীন করিয়া তুলিতে যেমন মূর্ত্তিমন্ত, প্রাচীন পুস্তকে নবীন শ্লোক সন্নিবেশিত করিয়া দিতেও সেইরূপ তৎপর। বিষ্ণুপুরাণ জনসমাজে পুরাণ বলিয়া আদর-ণীয় করিবার নিমিত্ত উহার মধ্যে কোন কোন শ্লোক সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, এমন হইতে পারে। যাহা হউক, এ বিচিকিৎস্য রোগের ঔষধ নাই,—কোন শ্লোকটী কাহার সঙ্কলিত, তাহা কেহই স্থির করিতে পারিবেন না। সুতরাং

উহা সকল পুরাণের শেষে গ্রথিত হইয়াছে, অগত্যা আমাদিগকে তাহাই স্বীকার করিতে হইল।

প্রথম ব্রহ্মপুরাণে পার্ব্বতীর জন্মাদিবিবরণ লিখিত হইয়াছে। মহাভারতাদি পুরাতন গ্রন্থে হরপার্ব্বতীর বৃত্তান্ত দৃষ্ট হয় বটে; কিন্তু তত্তৎ পুস্তকেও অনেক গোল। আমাদের পরম উপাদেয় বস্তু মহাভারতের কোন অংশ যে কাহার রচিত এবং তত্তৎ অংশ কোন সময়েই বা সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে নির্ণয় করিবার কিছু মাত্র উপায় নাই। কেবল যুক্তি ও প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলীর পৌর্ব্বাপর্য্যের সহায়তায় নিবিড় অন্ধকার-মধ্যে তড়িদ্বৎ আলোকে এক এক বার সত্য উদ্ভূত হয়। কোন কোন পুস্তকে বিরাট পর্ব্বের প্রারম্ভে ভগবতীর স্তব দৃষ্ট হয়, আবার কোন কোন পুস্তকে উহা দৃষ্ট হয় না। দুই একটী শ্লোকের অভাব হইলে ততটা দোষাবহ হইত না। কিন্তু সমগ্র একটী বিষয় নাই; ইহার তাৎপর্য্য আর কিছু নহে,—মহাভারতে ভগবতীর স্তব অধুনা বিনিবেশিত হইয়াছে, তজ্জন্য উহা সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হয় নাই। অতি পুরাতন আর্য্য ঋষিগণ প্রথমে পঞ্চভূতের অর্চ্চনায় নিরত ছিলেন। তৎপরে তাঁহারা নিরাকারবাদী হন এবং যোগশাস্ত্রের অনুশীলন করেন। তৃতীয়তঃ ব্রাহ্মণেরা বিষ্ণুর উপাসক হইয়াছিলেন। এই সময়ে শাক্যসিংহের বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নানা দেশে জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল। অবশেষে হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে বৌদ্ধমতের কথঞ্চিৎ সমন্বয়ের পর শৈবোপাসনা ভারতে প্রচলিত হয়। এই সময় হিন্দুদিগের পুরাণাদিতে দেবীমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছিল। মহাভারতে ও রামায়ণে বিষ্ণু মাহাত্ম্যেরই আধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। অষ্টাদশ পুরাণেও বিষ্ণুর মহিমা সমধিক কীর্ত্তিত হইয়াছে। যাহা হউক, পুরাণের প্রথম সৃষ্টিকালে হরপার্ব্বতীও সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হন নাই। তাঁহাদেরও লীলাপ্রভৃতির প্রসঙ্গ পুরাতন পুরাণাদিতে গ্রথিত হইয়াছে। ভাগবত পুরাণ সত্যই যদি ব্যাড়ির রচিত হয়, তবে কত কাল দেবীর উপাসনা ব্রাহ্মণমণ্ডলে প্রচলিত হইয়াছে, তাহার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। সোমদেব ভট্টকৃত কথাসরিৎসাগরে উল্লিখিত আছে যে, বররুচি ব্যাড়ি এবং পাণিনি এই তিন জন সহাধ্যায়ী ছিলেন (১)। মহাভারত এবং রামায়ণাখ্য প্রস্তাবে আমরা উল্লেখ করিয়াছি, ২২৩৩ বৎসর

(১) শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ও কথাসরিৎসাগরের মতানুসারে ব্যাড়িকে

অতীত হইল নন্দরাজের রাজত্বকালে পাণিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। যদি ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ এবং শিবপুরাণ, ভাগবতের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া পরিগণিত হয়, তবে দুই সহস্র বৎসরের অধিক গত হইল ব্রাহ্মণেরা দেবীর অর্চ্চনা করিয়া আসিতেছেন, ইহাই নিশ্চিত হইতে পারে।

বঙ্গদেশ এবং মিথিলা তন্ত্রশাস্ত্রের সূতিগৃহ সন্দেহ নাই, কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এবং রাজপুতানাতেও অতি প্রাচীন কালে দেবীপূজার আড়ম্বর ছিল। রাজপুতানার অন্তর্গত আমের নগরে অদ্যাবধি যশোহরের কালীর অর্চ্চনা হইতেছে। জাপান দ্বীপে একটী অপূর্ব্ব শ্বেত প্রস্তরের দুর্গা প্রতিমা পাওয়া গিয়াছিল। উহা অদ্যাপি কলিকাতা নগরের আসিয়াটিক সোসাইটীতে রক্ষিত হইতেছে। অনেকে অনুমান করেন, ঐ দেবীমূর্ত্তি অধুনাতন জয়পুরাদি প্রদেশে ক্ষোদিত হইয়াছিল। এই অনুমান সমূলক ও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে। আগ্রা এবং জয়পুরাদি নগরে অদ্যাবধি ঐরূপ শিলার নানাবিধ সুচিক্কণ প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। অতএব স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, উক্ত দেবীপ্রতিমা ঐ সকল অঞ্চলের কোন স্থানে ক্ষোদিত হইয়াছিল। এখন পাঠক বিবেচনা করুন, দুর্গাপূজাপদ্ধতি তত্র স্থলে প্রচলিত না থাকিলে দুর্গাপ্রতিমা গঠন করিতে লোকের প্রবৃত্তি জন্মিবে কেন? দেবীমাহাত্ম্যোক্ত বিন্ধ্যপর্ব্বত-অবস্থিতা বিন্ধ্যবাসিনী অদ্যাপি মির্জাপুরে অবস্থিতি করিতেছেন। কৌশিকী মহিষাসুরাদি মহা মহা পরাক্রান্ত দৈত্যদিগকে বিনাশ করিয়া স্তবকারী অমরবৃন্দকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক এই অঙ্গীকার করিলেন—

বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে।
শুম্ভোনিশুম্ভশ্চৈবান্যাবুৎপৎস্যেতে মহাসুরৌ॥
নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা।
ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী॥

বৈবস্বত মনুর (সপ্তম) অধিকার কালে অষ্টাবিংশতি-যুগে শুম্ভ নিশুম্ভ নামে দুই মহাসুর উৎপন্ন হইবে। তৎকালে আমি নন্দগোপের গৃহে তৎপত্নী যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিব এবং তখন আমি বিন্ধ্যাচলে থাকিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিব।

পাণিনির মহাধ্যায়ী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। নন্দরাজের রাজ্যকালে "উপবর্ষ পণ্ডিতস্য কাত্যায়নাপরপর্য্যায়ো বররুচির্ব্যাড়িঃ পাণিনিশ্চেতি ত্রয়ো বুধাশ্ছাত্রা বভূবুঃ" (সিদ্ধান্ত কৌমুদী)

অতীত হইল নন্দরাজের রাজত্বকালে পাণিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। যদি ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ এবং শিবপুরাণ, ভাগবতের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া পরিগণিত হয়, তবে দুই সহস্র বৎসরের অধিক গত হইল ব্রাহ্মণেরা দেবীর অর্চ্চনা করিয়া আসিতেছেন, ইহাই নিশ্চিত হইতে পারে।

বঙ্গদেশ এবং মিথিলা তন্ত্রশাস্ত্রের সুতিগৃহ সন্দেহ নাই, কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এবং রাজপুতানাতেও অতি প্রাচীন কালে দেবীপূজার আড়ম্বর ছিল। রাজপুতানায় অন্তর্গত আমের নগরে অদ্যাবধি যশোহরের কালীর অর্চ্চনা হইতেছে। জাপান দ্বীপে একটী অপূর্ব্ব শ্বেত প্রস্তরের দুর্গা প্রতিমা পাওয়া গিয়াছিল। উহা অদ্যাপি কলিকাতা নগরের আসিয়াটিক সোসাইটীতে রক্ষিত হইতেছে। অনেকে অনুমান করেন, ঐ দেবীমূর্ত্তি অধুনাতন জয়পুরাদি প্রদেশে ক্ষোদিত হইয়াছিল। এই অনুমান সমূলক ও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে। আগ্রা এবং জয়পুরাদি নগরে অদ্যাবধি ঐরূপ শিলার নানাবিধ সুচিক্কণ প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। অতএব স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, উক্ত দেবীপ্রতিমা ঐ সকল অঞ্চলের কোন স্থানে ক্ষোদিত হইয়াছিল। এখন পাঠক বিবেচনা করুন, দুর্গাপূজাপদ্ধতি তত্র স্থলে প্রচলিত না থাকিলে দুর্গাপ্রতিমা গঠন করিতে লোকের প্রবৃত্তি জন্মিবে কেন? দেবীমাহাত্ম্যোক্ত বিন্ধ্যপর্ব্বত-অবস্থিতা বিন্ধ্যবাসিনী অদ্যাপি কুজাপুরে অবস্থিতি করিতেছেন। কৌশিকী মহিষাসুরাদি মহা মহা পরাক্রান্ত দৈত্যদিগকে বিনাশ করিয়া স্তবকারী অমরবৃন্দকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক এই অঙ্গীকার করিলেন—

> বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে।
> শুম্ভোনিশুম্ভশ্চৈবান্যাবুৎপৎস্যেতে মহাসুরৌ॥
> নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা।
> ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী॥

বৈবস্বত মনুর (সপ্তম) অধিকার কালে অষ্টাবিংশতি-যুগে শুম্ভ নিশুম্ভ নামে দুই মহাসুর উৎপন্ন হইবে। তৎকালে আমি নন্দগোপের গৃহে তৎপত্নী যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিব এবং তখন আমি বিন্ধ্যাচলে থাকিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিব।

পাণিনির সহাধ্যায়ী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। নন্দরাজের রাজ্যকালে "উপবর্ষ পণ্ডিতস্য কাত্যায়নাপরপর্য্যায়ো বররুচির্ব্যাড়িঃ পাণিনিশ্চেতি ত্রয়ো মুখ্যাশ্ছাত্রা বভূবুঃ" (সিদ্ধান্ত কৌমুদী)

পাঠক ! জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,—তবে কি দুর্গোৎসব প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে বঙ্গবাসীরা শৈব কিম্বা বৈষ্ণব ছিলেন ? আমরা সে কথা বলিতেছি না। বঙ্গবাসিগণ বহুকাল পূর্ব্বেই শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বে পার্ব্বণোপলক্ষে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দেব দেবীর পূজার প্রথা বড় চলিত ছিল না। নিবিড় নিকুঞ্জ বনে, শ্মশানে মশানে দেবালয় মধ্যে এক খণ্ড প্রস্তর পড়িয়া থাকিত। সাধকেরা তাহাই সিন্দুর চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া অর্চ্চনা করিতেন। বঙ্গদেশে অনেক পুরাতন দেবশিলা আছে, তাহার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি যত্নপূর্ব্বক ক্ষোদিত নহে।

দুর্গা পূজা পদ্ধতি ত্রিবিধ, সাত্ত্বিকী রাজসী এবং তামসী। জপ, যজ্ঞ, নিরামিষ নৈবেদ্য, দেবীসূক্ত জপ, ও দেবী মাহাত্ম্য পাঠ, বহ্নিতে তর্পণ ইত্যাদি সাত্ত্বিক পূজার নিয়ম। বলিদান, সামিষ নৈবেদ্য, জপ, যজ্ঞ-বিরহিত সুরা মাংসাদি উপচার দ্বারা পূজাকে রাজসী কহে। বিনা মন্ত্রে দেবীর অর্চ্চনা তামসী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কিরাত এবং ম্লেচ্ছাদি নীচ জাতি এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া দুর্গার পূজা করে। ব্রাহ্মণদিগের সকল কাজেই এরূ একটী নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে। সকল সূক্ষ্ম রন্ধ্রে আমাদের স্থূল বুদ্ধি প্রবিষ্ট হয় না, সে কারণ আমরা তৎসমুদায়ের স্বাদগ্রহে অসমর্থ; বরং নিন্দাবাদই করিয়া থাকি। বিশেষ অনুধাবন পূর্ব্বক দুর্গার প্রতিমা নিরীক্ষণ করিলে বোধ করি, ব্রাহ্মণদিগের পৌত্তলিকতা দোষের অনেকটা পরিহার হয়। ভক্তিসমন্বিত পবিত্র চক্ষে দেবীকে দর্শন করিতে করিতে আমরা যেন আর একটী নূতন জগতে অবতীর্ণ হই। সম্মুখে আর তৃণরাশি এবং মৃৎপিণ্ড অনুমিত হয় না। বলিতে পারি না দুর্গামূর্ত্তির মূলকল্পনাকারীর অভিপ্রেত কি; পরন্তু ভাবুকের চক্ষে দুর্গা বাঞ্ছাকল্পতরু,—তিনি সাত্ত্বিক জগতকেই শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। দেবী ত্রিনয়না,—চন্দ্র-সূর্য্য-হুতাশন-সদৃশ মহাতেজঃশালী ত্রিনয়ন উন্মীলন করিয়া ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান এই তিন কাল নিয়ত দৃষ্টি করিতেছেন। লোচনত্রয় তদীয় কালজ্ঞতারই বিভূতি। কাহারো তিনটী চক্ষু হয় না। এ দারুণ অস্বাভাবিকতা, এমন ভাবিয়া আমরা ঘৃণাবিকৃত বদনে প্রতিমার সম্মুখ হইতে অপসৃত হই না। দেবমূর্ত্তিতে দেবোচিত রূপ এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন দেখিলে শরীর হর্ষে পুলকিত হয় ও হৃদয় স্বর্গীয় ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। দেবতারাও যদি মনুষ্যধর্ম্মাক্রান্ত হন, তবে তাঁহাদের দেবত্ব কোথায় ? ত্রিনয়নার কেবল

নয়নরূপ দেখিয়া আমরা দুর্গা প্রতিমার গুণ কীর্ত্তন করিতেছি না। ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মাণ্ডের দশ দিকে দশভুজ বিস্তার করিয়া পাপিপক্ষে মহৎ ভয়ঙ্কর প্রহরণ সমস্ত উদ্যত করিয়া আছেন (৩)। পদতলে পাপরূপী কৃষ্ণকায় মহিষাসুর শূলাঘাতে রুধিরোক্ষিত বক্ষে লুণ্ঠিত হইয়াও স্বীয় অবিজেয় বিক্রম প্রকাশ করিতেছে। দেবী অস্ত্রজালে তাহাকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া বিনষ্ট করিতেছেন। দুর্গার দেহ অতসীকুসুম সদৃশ উজ্জল পীতবর্ণ। এটী উদ্দীপ্ত জ্যোতির অনুরূপ। জ্যোতির্ম্ময়ীর তেজোরাশি সর্ব্ব প্রতিবন্ধ অতিক্রম করিয়া ভুবনময় বিকীর্ণ হইতেছে। দুর্গার অর্চ্চনা করিলে ধন ও বিদ্যা লাভ হয়, এবং কল্যাণ ও বলবীর্য্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তজ্জন্য দেবীর প্রতিমা লক্ষ্মী সরস্বতী এবং কার্ত্তিক গণেশের প্রতিমূর্ত্তিতে পরিশোভিত। হিন্দুশাস্ত্রে এই প্রকার রূপক বর্ণনা বিরল নহে,—সর্ব্বত্রই প্রায় ইহার ভূরি ভূরি প্রয়োগ দেখা যায়। উল্লিখিত আছে, নারদ ব্রহ্মাকে কহিলেন,—আমি চিন্ময়ী অদ্বিতীয় শক্তির ধ্যান ধারণা করিতে অক্ষম, অতএব তাঁহার কিরূপ মূর্ত্তির উপাসনা করিব অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলুন। দেবর্ষি নারদের বাক্যে লোকপিতামহ উত্তর করিলেন,—যদি আকার ভিন্ন তুমি পরমাত্মার জ্যোতি প্রতীতি করিতে অসমর্থ হও, তবে তাঁহাকে কমলাক্ষী মহামেঘবর্ণা দিগ্বসনা এবং চতুর্ভুজা কল্পনা করিবে।

নারদ ব্রহ্মার বাক্যে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—দেব! কি নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে এরূপ কল্পনা করিব, প্রকাশ করিয়া বলুন, আমার সকল ধাঁধাঁ দূর হউক। ব্রহ্মা, নারদের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য সহাস্য বদনে কহিলেন,—বৎস! কমলপুষ্প সর্ব্বদাই প্রস্ফুটিত থাকে। অতলস্পর্শ বারিধিও তাহাকে জলে নিমগ্ন করিয়া রাখিতে পারে না। তদ্রূপ পরমাত্মার সর্ব্বদর্শী চক্ষু নিয়তই উন্মীলিত থাকিয়া সকলি দেখিতেছে। কোন প্রতিবন্ধে তাঁহার দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না। তিনি মহামেঘবর্ণা, কারণ তিনি নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া আপনাকে লোক চক্ষু হইতে গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি দিগম্বরী অর্থাৎ সূর্য্যোদয় কালে পূর্ব্বদিকে যেমন আলোক প্রকাশ পায়, সেইরূপ প্রভাময় মহিমা রাশিতে পরি-

(৩) তান্ত্রিক সন্ধ্যাতেও পাপকে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। ষড়ঙ্গ ন্যাসে লিখিত আছে,—তেজোরূপং ধ্যাত্বা বামনাসাকৃষ্য বামকুক্ষিস্থং পাপপুরুষং কৃষ্ণবর্ণং দেহাদ্বহিঃপ্রক্ষাল্য পিঙ্গলয়া নির্গত্য কৃষ্ণবর্ণং তজ্জলং ধ্যাত্বা পুরঃকল্পিত বজ্রশিলায়াং ক্ষিপ্ত্বা অস্ত্রেণ তাড়য়েৎ।

বেষ্টিত হইয়া আছেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে তদীয় মহীয়সী শক্তির বিভূতি বিদ্যমান রহিয়াছে,—তিনি দুষ্টকে বিনাশ এবং শিষ্টকে অভয়—বর দান করিতেছেন।

নিরাকারবাদীরা এ প্রকার রূপক বর্ণনাকে দূষণীয় জ্ঞান করিতে পারেন; ইহাতেও পৌত্তলিকতার গন্ধ ভর ভর করিতেছে বলিয়া তাঁহারা এই গম্ভীর চিন্তাশীল ভাবকে হেয় জ্ঞান করিতে পারেন; কিন্তু, বিচার করিয়া দেখিলে পৃথিবীতে পৌত্তলিক নয় কে? আমরা ত কোন সম্প্রদায়ের সাধকের মধ্যে প্রকৃত নিরাকারবাদী দেখিতে পাই না। আকার না হয় রূপ, রূপ না হয় ধর্ম্ম সকলেই কল্পনা করেন। কেহ কেহ পরমাত্মাকে পিতা মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি প্রেমপূর্ণ আত্মীয়তা-ব্যঞ্জক শব্দ দ্বারা সম্বোধন করিয়া থাকেন। এ গুলি কল্পিত সম্বন্ধ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা পিতা মাতাকে পরম গুরু বলিয়া জানি; তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি এবং পূজা করি। ঈশ্বর আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি এবং পূজার বস্তু, সুতরাং তাঁহাকেও পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতে আমাদের সতত্তই প্রবৃত্তি জন্মে। কিন্তু, এ সম্বন্ধটী হৃদয়ের অনুরাগকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত,—এটী আদৌ সম্পূর্ণ কল্পনামাত্র। ঈশ্বর কখন আজ্ঞা করেন নাই যে,—তোমরা আমাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিবে। অতএব দেখুন, যিনি যে মতাবলম্বী হউন না কেন, কল্পনাকে পরিত্যাগ করিয়া কেহই আস্তিক হইতে পারেন না। সেই জন্য শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন,—উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা। আমি মনন করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মের আকার কল্পনা করিলাম, কেহ সম্বন্ধ কল্পনা করিলেন; আবার একাত্মবিৎ নিরাকারবাদিদের উপাসনাই বা কি? তাহাও ত কতকগুলি প্রীতিপূর্ণ কল্পিত বাক্যে পরিপূর্ণ। প্রভু! আমার পাপ সমুদায় মোচন কর, আমাকে রক্ষা কর! ঈশ্বরের নিকট এমন প্রার্থনা করিবার কি মানুষের কোন অধিকার আছে? তিনি কি আমাদের আজ্ঞাধীন?—অনুনয় বিনয়ের বশবর্ত্তী?—আরাধনার অপর নাম তোষামোদ, তিনি কি তাহার অনুগত? এই সমস্ত চিন্তা করিলে বুদ্ধির বিভ্রম জন্মে; আমাদিগকে নিশ্চেষ্ট হইতে হয়! ক্রমে নাস্তিকতাও আসিয়া পড়ে। অতএব বোধ হয়, পৌত্তলিকতা একেবারে ত্যাগ করিয়া কেহই আস্তিক হইতে পারেন না। যদি কেহ হইতে সাহস করেন, তাঁহার ধ্যান নাই মনের পবিত্রতা নাই সাধনে প্রীতি ও উৎসাহ নাই।

পৌত্তলিকতা, আস্তিকতার সহচরী। তবে পৌত্তলিকতা হিতাহিত বিবেকশূন্য হইলেই ঘোর অনিষ্টাপাতের কারণ হইয়া উঠে। নরবলি অনশনব্রত প্রভৃতি তাহার বিষময় ফল। ভক্তির আতিশয্যে যে সমস্ত ক্ষতি হইতে পারে, তৎসমুদায় পরিহার করিতে পারিলে, বোধ হয়, পৌত্তলিকতায় অধিক দোষ স্পর্শে না।

আমরা দুর্গা দেবীর মূর্ত্তি সম্বন্ধে যে সাত্ত্বিক ভাবের উদ্ধার করিলাম, আদৌ শাস্ত্রকারের তাহা অনুমোদিত কি না বলিতে পারি না। আবার বিবেচনা করিয়া দেখুন, হরপার্ব্বতী কি আর্য্যবংশোদ্ভব ব্রাহ্মণদিগের দেবতা? না, তিনি ম্লেচ্ছদিগের বরদাত্রী? এইরূপ লোকপ্রসিদ্ধি সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে, ষষ্ঠীকৃত্য দিবসে ভগবতী হাড়ীর গৃহে আসিয়া অবস্থিতি করেন। ঐ নীচ ম্লেচ্ছেরা সেই পর্ব্বাহে নিজ নিজ গৃহ মার্জ্জিত ও পরিষ্কৃত করিয়া মঙ্গলাচরণ করে। দেবী রাত্রিতে তাহাদের গৃহে অধিষ্ঠান করিবেন, সেই উৎসাহে সকলেই উৎসাহশীল। এই প্রবাদটীর তাৎপর্য্য কি? প্রথমতঃ পার্ব্বতীপতির প্রকৃতি বিচার করুন। তিনি আদৌ কোন্ জাতির আরাধ্য, তাহা নিশ্চিত করিতে পারিলে, ভগবতী পূজার প্রথা অগ্রে কোন্ সমাজে ব্যবস্থিত হইয়াছিল, তাহাও অক্লেশে নিশ্চিত হইবে।

বহুকাল হইতে ভারতবর্ষের আর্য্য ও অনার্য্য জাতিগণ গ্রহ হইতে উপগ্রহে এক ভূত হইতে ভূতান্তরে শ্রদ্ধা ভক্তি উৎসর্গ করিয়া প্রীতিপ্রবাহ চালিয়া দিয়া বিচলিত চিত্তে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে কয়েকটী দেবতার পীঠাঙ্গনে আসিয়া অবিশ্রান্ত মনোবেগকে কিয়ৎকালের নিমিত্ত বিশ্রাম সুখ ভোগ করিতে দেন। তাঁহারা জগৎপাতা বিষ্ণুর এবং বিশ্বসংহারকর্ত্তা শিবের উপাসক হইলেন। বিষ্ণু ব্রাহ্মণদিগের দেবতা। অদ্যাবধি শালগ্রামশিলা স্পর্শ করিতে কোন শূদ্রের অধিকার নাই। কিন্তু ভূতনাথ মহাদেব আর্য্য দেবতা বলিয়া বোধ হয় না। তিনি নিবিড় বনাবৃত দুর্গম শৈলশিখরে অবস্থিতি করেন, বিকট বাতোৎক্ষিপ্ত ভয়ঙ্কর শ্মশান তদীয় বিচরণ স্থান; পরিধেয়,—ব্যাঘ্রকৃত্তি; বিভূতি,—অঙ্গরাগ; অস্থিমালা ও ভুজঙ্গম,—আভরণ; শূল প্রহরণ; শিঙা ডম্বরু,—বাদ্যযন্ত্র, সর্ব্বদাই ভূত প্রেত পিশাচাদিতে পরিবেষ্টিত। ইনি কি তবে পবিত্র আর্য্য জাতির উপাস্য দেবতা? প্রণিহিত চিত্তে বিচার করিয়া দেখিলে তাহা কেহই বিশ্বাস করিবেন না। প্রাচীন ঋত্বিক্‌গণ ইন্দ্র অশ্বিনীকুমার অগ্নি

কারণ এই, বর্ব্বর জাতিরা কখন নগরমধ্যে বাস করে নাই। তাহারা পর্ব্বতে ও অরণ্যেই বরাবার বাস করিয়া আসিতেছে; সুতরাং পর্ব্বত ও অরণ্যই তাহাদের দেবমন্দির। সকল হিন্দু জাতিই মহাদেব স্পর্শ করিতে পারে, তাহাতে দেবতা অপবিত্র হন না। অদ্যাবধি ভারতবর্ষের নানা স্থানে নীচ ম্লেচ্ছ জাতিরা বৎসরান্তে চৈত্র মাসে মহাসমারোহে মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া থাকে। আমাদের দেশীয় চৈত্রোৎসব গাজনের প্রথা দেখিলেও শিব যে অবর জাতির দেবতা, তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে বিশ্বাস করিতে হয়। বাণ রাজা দ্বিজাতিকে গাজনের উৎসবে উন্মত্ত করিতে পারেন নাই কেন? মহাদেব ব্রাহ্মণের দেবতা নহেন, তজ্জন্যই তিনি ব্রাহ্মণদিগকে শিবমন্ত্রে দীক্ষিত করিতে প্রয়াস পান নাই।

বর্ব্বরেরা মহাদেবকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। তাঁহার প্রসাদে অবর জাতি ক্রমে পৃথিবীতে দুর্জ্জয় হইয়া উঠিল; এমন কি?—তাহারা দেবতাগণকেও জ্রক্ষেপ করিত না। কাল সহকারে শিবভক্ত মহাসুরগণ এক এক স্থানে আধিপত্য স্থাপন করিয়া প্রবল পরাক্রান্ত ভূপতি হইয়া উঠিলেন। যখন তাঁহারা ভুজবলে পৃথিবীর অধীশ্বর হইতে পারিলেন, তখন আর ধর্ম্মবিপ্লব ঘটাইয়া অবনীকে একচ্ছত্রিত করিতে বিলম্ব কি? অত্যল্পকাল মধ্যেই চতুর্দ্দিকে শৈবমত বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল। এদিকে ব্রাহ্মণেরা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। বৈদিক ক্রিয়াকলাপ সমস্তই লোপ পায়, অতএব তাঁহারা মহাদেবের অর্চ্চনা আপনাদের ধর্ম্মের সঙ্গে সমন্বয় করিয়া লইলেন।

এক্ষণে স্পষ্ট উপপন্ন হইতেছে, ভগবতীও অনার্য্য দেবতা। শিব কখন শক্তি ছাড়া নহেন। শক্তিরূপা ভবানীও প্রথমে অসভ্য পার্ব্বতীয় জাতির গৃহে পূজিত হইয়াছিলেন। নীচ জাতিরা অসমসাহসী কাজে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে মদ্যে ও মাংসে দেবীর পূজা করে। কোন কোন স্থানে অরণ্য মধ্যে দস্যুরা কালীর নিকট নরবলি দিত। কালীর সাধক সেই দস্যুদিগেরই প্রীতি সম্পাদনার্থ তন্ত্র শাস্ত্রের আসুরিক উপাসনা বিধির সৃষ্টি হইয়াছে। শৈব উপাসকের ন্যায় দেবী ভক্ত দৈত্যেরা বিলক্ষণ প্রতাপাম্বিত নরপতি হইয়া উঠিলেন। ভগবতীর বাহন সিংহ হইতে বিবিধ সম্প্রদায়ের ভূপতিগণ "সিংহ" "কেশরী" প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করিলেন। এক্ষণকার অনেক রাজবংশ ঐ নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে ঐ নৃপতিগণ ভক্তির

চিহ্ন স্বরূপ নিজ নিজ আসনে সিংহের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিতেন, তজ্জন্য উহাকে সিংহাসন বলে। দ্বারের উপরি ভাগে যুগপৎ মঙ্গল ও জয় চিহ্নের স্বরূপ সিংহমূর্ত্তি গঠিত হয়, সে কারণ উহাকে সিংহদ্বার বলা যায়। সিংহবাহিনীর পূজা সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইলে আসনে ও প্রাসাদাদিতে সিংহমূর্ত্তি-গঠনের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। রাজবংশ ক্ষত্রজাতি ভিন্ন অন্য কাহার কেশরী কিম্বা সিংহ উপাধি নাই। কারণ অবরেরাই প্রথম শক্তির উপাসক, এবং পৃথিবীতে সিংহবাহিনীর পূজা প্রচার করিয়া তাঁহারাই "সিংহ" কেশরী প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করেন। সুতরাং রাজবংশ ভিন্ন অন্য কোন পরিবারে ঐ উপাধি বিদ্যমান থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রোটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বীরা রোমান কাথলিকদিগকে কত উৎপীড়ন করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তদ্বৃত্তান্ত পাঠ করিলে শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। মহম্মদের ত তীক্ষ্ণ তরবারিই ধর্ম্মপ্রচারের প্রধান সহায়। কত বিধর্ম্মী যে সেই নরযজ্ঞে জীবন সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। হিন্দুদিগেরও ধর্ম্মবিপ্লবে কোন সাধক সহজে স্বীয় মত পরিত্যাগ করিয়া অভিনব মত অবলম্বন করেন নাই। তাঁহাদিগকেও বিস্তর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু, পরম বৈষ্ণব প্রহ্লাদকে শিবমন্ত্রে দীক্ষিত করিতে যৎপরোনাস্তি নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছিলেন। সুকুমারমতি শিশু কখন পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে নিক্ষিপ্ত হইতেছেন, কখন প্রজ্বলিত হুতাশনে পাতিত হইতেছেন; ফলতঃ দানবপতি স্বীয় পুত্রকে আপনার ইষ্ট মন্ত্রে উপদিষ্ট করিতে কোন প্রকার যন্ত্রণা দিতে ত্রুটী করেন নাই। কাশীখণ্ডের লিখিত বৈষ্ণব এবং শৈব মতের সমীকরণ সামান্য কৌতুককর নহে। দেবনিষ্ঠ ব্যাস পরম বিষ্ণুভক্ত; বিষ্ণুর ধ্যান, বিষ্ণুনাম জপ, বিষ্ণুতেই আত্মসমর্পণ করিয়া সুখে কাল যাপন করিতেছিলেন। ভূত প্রেত তাঁহার প্রতি দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল, উদরান্নের নিমিত্ত দ্বারে দ্বারে ফিরিলেন; কুত্রাপি ভিক্ষা মিলিল না। অগত্যা ব্যাস শৈব হইলেন। পূর্ব্বে এক একটী মতের এক একটী পৃথক উপাসক সম্প্রদায় ছিল। ব্রাহ্মণেরা হিন্দুসমাজের বিশৃঙ্খলা দূরীভূত করিবার নিমিত্ত সকল মতের সমন্বয় করিয়াছেন। ভগবতীর পূজাও প্রথমে নীচ ম্লেচ্ছ জাতির মধ্যে প্রবর্ত্তিত হয়! পরিশেষে ম্লেচ্ছগণ ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিলে অনেকেই শক্তির-উপাসক হইলেন। অতঃপর, ব্রাহ্মণেরা শক্তিপূজা পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করিয়া পাত্রভেদে তাহাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করি-

লেন্। সুসভ্য সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা সাত্ত্বিক ভাবে দুর্গার অর্চনা করেন। আমোদ প্রিয় ব্যক্তিরা মদ্য মাংসে দেবীর আরাধনা করিতে লাগিলেন। অজ্ঞ বর্ব্বরদের তন্ত্র মন্ত্র কিছুই নাই; মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া মৎস্য মাংস ভোজন করিয়া নৃত্য গীতে দেবীর আরাধনা করে। বিভিন্ন মতের সমীকরণ কালে পাত্র ভেদে এই ত্রিবিধ পূজার পদ্ধতি বিধিবদ্ধ হইয়াছিল এমন অনুমান হয়। আগে অসুরেরা মদ্য মাংসে দেবীর পূজা করিত, তজ্জন্যই আসুরিক উপাসনার অনাচার দৃষ্ট হইয়া থাকে। নচেৎ, ব্রাহ্মণেরা কৌশল ক্রমে অসুরদের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি জন্মাইবার নিমিত্ত তন্ত্রাদিতে সুরাপান ও মাংস ভোজনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত বোধ হয় না।

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।

রামায়ণ ও মহাভারতের (পৌর্ব্বাপর্য্য)

পুনঃ প্রতিবাদ।

গত মাঘ মাসের কল্পদ্রুমে রামায়ণ ও মহাভারত শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল। লেখক কুলক্রমাগত সংস্কার পরিহার পূর্ব্বক মহাভারত গ্রন্থ রামায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত বিবিধ যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শন করেন। তাঁহার প্রদর্শিত প্রমাণ ও যুক্তিপরম্পরা কতদূর সুসঙ্গত এবং তদ্বিরুদ্ধে কোন প্রকার বিশুদ্ধ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় কি না, তদনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আমি কল্পদ্রুম কার্য্যালয়ে ক্রমে দুই খানি প্রতিবাদ পত্র প্রেরণ করি। আমার সেই প্রতিবাদ পত্র সহকারে দশম সংখ্যক কল্পদ্রুমে প্রতিবাদের প্রতিবাদ শীর্ষক আর একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

রামায়ণ ও মহাভারত ভারতীয় ভারতীর বৃহত্তর কাব্য-কোষের মহামূল্য রত্ন স্বরূপ। যদিও আমাদিগের গৌরবের বিস্তর সামগ্রী আছে, তথাপি এই দুই খানি গ্রন্থ যে ভারতবর্ষের যাবতীয় কাব্য ও ইতিহাসের মূল, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। উভয়ের শাখা প্রশাখা নিখিল ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়া আর্য্য ঋষিগণের অবিনশ্বর কীর্ত্তি ও মহিমার স্বচ্ছ প্রভা সর্ব্বত্র সুবিস্তার করিতেছে! কিন্তু কোন একটী বিষয়ের সর্ব্বাগ্রে যিনি আবিষ্কার করেন, তাঁহার পরবর্ত্তী ব্যক্তিরা তাঁহার সহিত কখন তুল্যরূপে যশোভাগী হইতে পারেন না। আমাদিগের দেশে বাল্মীকি ও বেদব্যাসের পূর্ব্বে কাব্য

শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, এ প্রকার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না; সুতরাং
তাঁহারাই যে ভারতবর্ষের আদিম কবি, একথা সর্ব্ববাদিসম্মত। তবে এক্ষণে
নির্ণয় করা আবশ্যক যে, এতদুভয়ের মধ্যে কোন্ মহাত্মা পূর্ব্ববর্ত্তী, যাঁহাকে
আমরা কবিকুলের পরমগুরু বলিয়া অগণ্য ধন্যবাদ দিতে পারি।

যদ্যপি মহর্ষি বাল্মীকি ভারতবর্ষের আদিম কবি না হন, এবং তৎসম্বন্ধে
প্রকৃতই আমাদিগের ভ্রমাত্মক সংস্কার জন্মিয়া থাকে, তবে অবশ্যই তাহার সং-
শোধন করা কর্ত্তব্য, ভ্রমাত্মক মতের পক্ষপাতী হইয়া চিরজীবন অন্ধকার গৃহে
অবস্থান করা বিড়ম্বনা মাত্র,—বরং সত্যের স্বচ্ছ-জ্যোতিঃ শোভিত আবাসে
দিনেকের জন্য বাস করাও শ্রেয়স্কর। কিন্তু এমন একটী গুরুতর বিষয়ের
মীমাংসা করিতে হইলে, উৎকৃষ্ট প্রমাণসকল সঙ্কলন পূর্ব্বক, ন্যায় ও যুক্তি
সহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। "সকালে রাম
বিকালে রহিম" এ প্রকার ক্ষণভঙ্গুর মত লইয়া কার্য্য করা আমরা যুক্তিযুক্ত
বলিয়া বোধ করি না, বরং তদ্দ্বারা জনসমাজে উপহাসাস্পদ হওয়ারই অধিক
সম্ভাবনা। আর এ বিষয়ে ভ্রম ঘটনা হইলে এক জন মহাকবির যশোহানি
করিলাম বলিয়া আমাদিগকে পাপভাগী হইতে হইবে।

এই সকল কারণে আমি অনভিজ্ঞ হইয়াও রঙ্গলাল বাবুর এই গুরুতর
প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতে সরল-চিত্তে অগ্রসর হইয়াছি; কারণ বাদ প্রতি-
বাদ ব্যতিরেকে কোন প্রকার জটিল বিষয়ের সিদ্ধান্ত করা অনায়াসে মানসে
উদিত হইবে, এরূপ সর্ব্বজ্ঞ হইয়া আমরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করি নাই।
পরন্তু যে মতটী সাধারণ্যে প্রবল করিতে হইবে, তাহা একজনের অভি-
প্রায়ের উপর নির্ভর করে না। যদিও এতৎসম্বন্ধে বিদেশীয় পণ্ডিতগণের
মধ্যে ইতিপূর্ব্বে অনেক আন্দোলন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহারাও আবার
মতভেদে দুই দলে বিভক্ত হইয়াছেন; যে দল প্রাচীন মতের অনুমোদন
করেন, তন্মধ্যে সর উইলিয়ম জোন্স, বেণ্টলি, এবং টড, এই তিন ব্যক্তি
প্রধান। তাঁহারা সূক্ষ্মরূপে গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, কলির পূর্ব্ববর্ত্তী
দ্বাপর যুগের পূর্ব্বে কবিগুরু বাল্মীকি জীবিত ছিলেন।* কিন্তু অন্য দল
তদ্বিপরীত মতের সমর্থন করেন। প্রস্তাব-লেখক আমাকে অনভিজ্ঞ বলিয়া তুচ্ছ
তাচ্ছীল্যই করুন আর বিদ্রূপই করুন, আমার উদ্দেশ্য নিকৃষ্ট নহে। তিনি
নিজেই এক স্থলে স্বীকার করিয়াছেন যে "আমার প্রস্তাবের যে যে স্থল অপরি-
স্ফুট ছিল, যাদব বাবুর প্রতিবাদে তত্তৎস্থল পরিষ্কার ও বিশদ হইয়া পড়িবে।"

ক্ষতি কি ? যে বিষয় অপরিস্ফুট রহিয়াছে,তাহা পরিষ্কার ও বিশদ করাই সকলের উদ্দেশ্য। সুতরাং আমার প্রতিবাদে যে কতকটা উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা একরূপ স্বীকৃত হইয়াছে বলিতে হইবে। যাহা হউক, আমি অজ্ঞ বা অল্পজ্ঞ ব্যক্তি, মাদৃশ জনের সৌম্যমূর্ত্তি স্থির রাখা অসম্ভব বটে. কিন্তু রঙ্গলাল বাবু বিজ্ঞ ও বহুদর্শী ব্যক্তি ; তিনি মাতৃ ভাষার উন্নতি সাধনে যেরূপ সুনিপুণ, সত্যানুসন্ধানেও তাঁহার তদনুরূপ আগ্রহ ও অনুরাগ আছে ; যদি বিনয় ও সৌজন্য বিজ্ঞতার যথার্থ লক্ষণ হয়, তবে তদীয় চরিত্রে উহা অবিচলিত থাকা প্রয়োজনীয়। তিনি আমার প্রতিবাদ পত্রের প্রতিবাদে ব্যাপৃত হইয়া বাল-স্বভাব-সুলভ হাস্য কৌতুক সহকারে আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন ; অথবা রঙ্গলাল বাবু শিক্ষিত সমাজের এক জন কৌতুক-প্রিয় ও সুরসিক লোক। অতএব তাঁহার সহিত শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, সুহৃদ্ভাবে ক্ষণকাল শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপ করিয়া তাঁহার তুষ্টি সম্পাদন করা উচিত।

লেখক দেশ কাল সুলভ স্বকীয় এবং পরকীয় ভাষার তারতম্য প্রদর্শন জন্য পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর পাঠ্য পুরাতন কৃষ্ণনামের পাঠটী পরিপাটীরূপে প্রকটিত করিয়াছেন, যথা—

> "পিঞ্জরের পাখী সুস্পষ্ট কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলে
> মুক্তি নাই, স্বজাতির কাছে গৌরব নাই—তাহাতে কেবল
> প্রতিপালকের কাছে আদর বাড়ে। তুমি পিঞ্জরে বসিয়া
> কৃষ্ণনাম করিতেছ, যদি স্বজাতির কাছে গৌরব
> না বাড়িল, যদি নিজের মুক্তির পথ না দেখিতে পাইলে,
> তবে বনের ফল ত ছিল ভাল, এ পঞ্চামৃতে কাজ কি ?"

পাঠটী পুরাতন হইলেও অবিকল প্রকটন করা বহু আবৃত্তির ফল ! আমরা কেবল মাত্র কালের পরিবর্ত্তন স্বীকার করি না ; দেশ কাল পাত্র এই তিনেরই পরিবর্ত্তন অতীব কৌতুকাবহ ! ভাল, একটা কথা আলোচনা করিয়া দেখি,—পূর্ব্ব শতাব্দীর পাখী গুলি আজ কোথায় ? কৈ তেমন পাখী একটীও ত দেখিতে পাই না ? আমরা কোন্ দেশে আসিয়াছি ? এখানে যে সকলি নূতন নূতন দেখিতেছি ! !

আহা ! এই বৃন্দারণ্যে শুক সারিকাদি মনোহর বিহগাবলী সুখে কেলি

করিত! তাহাদের সুললিত সংগীত স্বরে মনুষ্যেরা একবারে বিমুগ্ধ হইয়াছিল! আবার কেবল সংগীত বলিয়া নহে, উহারা সামান্য তির্য্যগ্‌ জাতি হইয়াও শাস্ত্রালাপে বড় বড় ঋষিদিগের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল! কিন্তু আজ কোথায় বা সে বৃন্দাবন, কোথা বা সে পক্ষিগণ;—শুক সারিকার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হয় না। আজ কাল কোকিলের বড় পসার,—কল্প বৃক্ষের শাখায় বসিয়া আনন্দে কুহুধ্বনি করিতেছে;—রবটী মধুর বটে, কাণে যেন সুধা ঢালিয়া দিতেছে! শুনিতে শুনিতে সহসা স্বরবিকৃতি কেন? এখন যে সুধার পরিবর্ত্তে বিষধারা বর্ষণ করিতে লাগিল! এরূপ বিকৃতির কারণ কি? হাঁ, বুঝিয়াছি, ঋতুরাজ বসন্তের অবসান হইয়াছে, ও যে বসন্তের পাখী, বসন্ত অন্তে উহার অমনি কণ্ঠবিকৃতি উপস্থিত হয়। অতএব পিকবর! একটু থাম,—আর তোমার ভাঙ্গা ঢোলে ঘা দিও না"! এ যে কল্পবৃক্ষ এখানে সংগীতপ্রিয় নানাজাতীয় পক্ষীর অবস্থান আবশ্যক, একা তোমার কাজ নহে।

আলাপ না করিলে লোকের বিদ্যাবুদ্ধি কি দোষ গুণ কিছুই বুঝা যায় না। কথায় কথায় রঙ্গলাল বাবুর সহিত এতক্ষণে আলাপ হইল। বোধ হয় তিনি আমার প্রতি একটু প্রসন্ন হইয়াছেন; কারণ তাঁহার তুষ্টি সম্পাদন জন্য আমি অনেক যত্ন করিয়াছি;—আবার (যেমন জানি) আমোদ প্রমোদ করিতেও ত্রুটি করিতেছি না। কিন্তু সারাদিন আমোদ আহ্লাদ করিয়া কাটাইলে চলিবে না, আমাদের অনেক কথার মীমাংসা করিতে হইবে। অতএব রঙ্গলাল বাবু আসুন,—আর অসার প্রসঙ্গে কাজ নাই,—এক্ষণে আমরা একাসনে উপবেশন পূর্ব্বক প্রসন্ন চিত্তে বিচারে প্রবৃত্ত হই।

রঙ্গলাল বাবু সংক্ষিপ্তরূপে আমার সাতটী আপত্তির উল্লেখ করিয়া ক্রমান্বয়ে তাহার দোষ গুণ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন;—তন্মধ্যে চতুর্থটি মিথ্যা, আমার প্রতিবাদ পত্রের কোন স্থলেই লিখিত হয় নাই যে, বাল্মীকি দেবর্ষি নারদের মুখে রামের বৃত্তান্ত শুনিয়া তাহা কাব্যাকারে প্রকাশ করেন নাই। অতএব এ সম্বন্ধে বাগ্বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই, আমার প্রতিবাদ পত্র দুই খানিই উহার মুখ্য প্রমাণ।

লেখক আমার প্রস্তাব বিশেষের অর্থভেদে ইহা একটী আপত্তি স্বরূপ গণ্য করিয়া লিখিয়াছেন "যাদব বাবু বিদ্যানুরাগী ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি হইয়া সম্পাদকের প্রতি কেন দোষারোপ করিয়াছেন, বলিতে পারি না।"

রঙ্গলাল বাবু বুঝিয়াছেন আমি সম্পাদক মহাশয়ের প্রতি দোষারোপ করিয়াছি, কিন্তু আমি সকল প্রকার মালিন্য হইতে নির্মুক্ত সাক্ষাৎ বৃহস্পতিতুল্য সম্পাদক মহাশয়ের জ্যোতির্ম্ময় পবিত্র মূর্ত্তি বহু সমাদরে আমার পত্রের শীর্ষস্থানে রাখিয়া তদীয় মতজিজ্ঞাসু হইয়াছি। সম্পাদক মহাশয় এতদ্দেশীয় একজন প্রাচীন অধ্যাপক, রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে কোন গ্রন্থ পূর্ব্ববর্ত্তী কোন গ্রন্থ বা পরবর্ত্তী, ইহার যথার্থ তত্ত্ব দেশীয় পণ্ডিতগণ বিলক্ষণ অবগত আছেন। এ স্থলে রঙ্গলাল বাবু বিদেশীয় পণ্ডিতগণের নিকট দীক্ষিত হইয়া কল্পদ্রুমে একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিলেন, কুলক্রমাগত প্রাচীন মতের ভ্রম প্রতিপাদন পূর্ব্বক একটী অধুনিক ও অসিদ্ধ মত প্রকাশ করিলেন, কিন্তু সম্পাদক বহুজ্ঞ হইয়াও নিজে কোন অভিমত ব্যক্ত করিলেন না। তজ্জন্য আমরা প্রস্তাবটীর সহিত বিশেষরূপে তদীয় স্বাতন্ত্র্য নির্দ্দেশ পূর্ব্বক প্রতিবাদ-বর্ম্মে অগ্রসর হইয়াছি। সম্পাদকের অনুমোদিত হইলে এতৎসম্বন্ধে আমাদিগের প্রতিবাদের তত আবশ্যকতা ছিল না; কারণ তদীয় বিজ্ঞতা আমরা সবিশেষ অবগত আছি। সম্পাদক যে অন্যের মতের জন্য দায়ী নহেন, এ বিধান আজ নূতন হয় নাই; তবে সে কথা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত রঙ্গলাল বাবু কেন যে কষ্ট পাইয়াছেন, বলিতে পারি না। যাহা হউক, সম্পাদক যখন পূর্ব্বে কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই, তখন এতৎসম্বন্ধে আর তাঁহার স্বাভিমত প্রকাশের আবশ্যকতা নাই। তিনি আমাদিগের উভয়ের মধ্যস্থলে বসিয়া শিক্ষকের ন্যায় দোষ গুণের বিচার করুন।

পাঠক! গত মাঘমাসের কল্পদ্রুম খানি পূর্ব্বে পাঠ করিয়াছিলেন, যদি স্মরণ না থাকে পুনর্ব্বার পাঠ করুন। রঙ্গলাল বাবু লিখিয়াছিলেন,—"মহাভারতে বাল্মীকির নাম নাই"। পরে যখন আমি ভারতের (পূর্ব্বভাগের উল্লেখ ব্যতিরেকে) পরিশিষ্ট ভাগ খুলিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বুঝাইয়া দিলাম যে, এই দেখ ভারতে বাল্মীকির নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। তখন খান দুই তিন জীর্ণ ও ছিন্নপত্র হস্তলিখিত পুস্তকের শ্লোক লইয়া সাত পাঁচ ভাগ করিয়া অবশেষে রাজিনামা দাখিল করিলেন। সে রাজিনামার পাঠটী একটু ব্যাপক, পাঠকগণের পঠনার্থ এস্থলে উদ্ধৃত হইল,—

"অনেকগুলি হস্তলিখিত মহাভারত একত্র মিলন করিলে দৃষ্ট হয়, কোন খানিতে বাল্মীকির নাম একেকালে নাই, আবার কোন কোন খানিতে

এক এক স্থলে আছে। তদ্ভিন্ন আর একটী কৌতুক দেখা যায়, কোন পুস্তকের আদিপর্ব্বে বাল্মীকির নাম আছে, সভাপর্ব্বে নাই, কোন খানির সভাপর্ব্বে আছে বনপর্ব্বে নাই, আবার কোন খানির বনপর্ব্বে আছে, ভীষ্মপর্ব্বে নাই, বাল্মীকি নামের এই প্রকার গোলযোগ দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, ঐ নামটী যত্নপূর্ব্বক কেহ মহাভারতে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছে।" আমরা যদি এই বাক্যগুলি লইয়া অধিক আন্দোলন করি, তাহা হইলে সুবিজ্ঞ লেখক পাঠক সমাজে নিতান্ত লজ্জা পাইবেন। কিন্তু আমাদের প্রকৃতি সেরূপ নহে, আমরা ভদ্র লোককে লজ্জা দিতে লজ্জিত হই। তবে আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে, মহাভারতের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত প্রতি-পর্ব্বে—প্রতিসর্গে প্রতিপৃষ্ঠায় প্রতিপংক্তিতে বাল্মীকির নাম লিখিত থাকা চাই, দুই এক পর্ব্বের দুই এক স্থলে থাকিলে তাহা প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না, এরূপ কোন প্রমাণ সংহিতায় এ পর্য্যন্ত আমরা পাঠ করি নাই। তবে নামটী প্রকৃতই মহাভারতে আছে, কিম্বা কেহ কৃত্রিম করিয়া গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছে, রঙ্গলাল বাবুর এই আপত্তিটী বলবৎ বটে। এ কথার প্রমাণ করিতে পঞ্চানন ঠাকুরের পুত্র গজানন শর্ম্মাকে সাক্ষী মান্য করিতে হইবে? না যুক্তি করিয়া লইলেও চলিতে পারে? ভাল, বাল্মীকির নামটী কৃত্রিম করিয়া কেন মহাভারতে সন্নিবেশিত করা হইল? আর কেইবা এরূপ কৃত্রিম প্রমাণ প্রস্তুত করিয়া দিল? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যাইয়া রঙ্গলাল বাবু লিখিয়াছেন,—

"বাল্মীকি রামায়ণকে প্রাচীন গ্রন্থ—ত্রেতাযুগের সংকলন বলিয়া পরিচয় দিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়াছিলেন। সে কারণ তিনি স্বপ্রণীত পুস্তকের কোন স্থানে মহাভারতের নমোল্লেখ করেন নাই। ক্রমে বহুকাল অতীত হইয়া গেল, রামায়ণ পুরাতন হইয়া আসিল, তখন লোকে প্রকৃত বৃত্তান্ত ভুলিলেন, রামায়ণকে ত্রেতাযুগের ইতিবৃত্ত বলিয়া মানিতে লাগিলেন। অতঃপর সকল বিষয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার মানসে কেহ কেহ মহাভারতে মহর্ষি বাল্মীকি ও তৎপ্রণীত রামায়ণের নাম সন্নিবেশ করিয়া দিলেন।"

পাঠক! এই সকল বাক্যের কোন প্রকার প্রমাণ আছে?—না রঙ্গলাল বাবু শুদ্ধ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন? যদি বাস্তবিক কোন প্রমাণ না থাকে, তাহা হইলে বিচার স্থলে আমরা উহা কোন মতে

গ্রাহ্য করিতে পারি না। তবে বৃত্তান্তটী বিলক্ষণ কৌতুকাবহ! এই কারণে আমরা উহার সারবত্তা সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা না করিয়া এককালে নীরব থাকিতে পারিলাম না।

পাঠক! মনে করুন,—কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রণীত মূল মহাভারত এক খানি আদি পুস্তক, উহাতে রামায়ণ কি তৎপ্রণেতা বাল্মীকির নাম গন্ধও নাই। আবার বাল্মীকি কৃত রামায়ণ অপর একখানি পরবর্ত্তী গ্রন্থ, যাহাতে বেদব্যাস কি তৎপ্রণীত মহাভারতের উল্লেখ মাত্র নাই। এই দুই খানি গ্রন্থ রচিত হওয়ার শত কি সহস্র বৎসর অন্তে যদ্যপি উভয় গ্রন্থ আপনার সমীপে উপস্থিত করা যায়, তবে আপনি কোন্ খানি প্রাচীন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন? বোধ হয় এমত স্থলে আপনি কিছুই স্থির করিতে পারিবেন না। কিন্তু যদি রামায়ণে ত্রেতাযুগের এবং ভারতে দ্বাপর যুগের স্পষ্ট উল্লেখ থাকে, তাহা হইলে যুগক্রমানুসারে আপনি রামায়ণকে পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া সহজেই সিদ্ধান্ত করিতে পারেন, তজ্জন্য কৃত্রিম প্রমাণ প্রস্তুত করিয়া লইবার আবশ্যকতা কি? অথবা এমন কি অসামঞ্জস্য রহিয়াছে, যাহার সামঞ্জস্য ব্যতিরেকে পরস্পর প্রবল বিরোধ উপস্থিত হয়।

রঙ্গলাল বাবু এরূপ আপত্তি করেন না যে বাল্মীকি ঋষি-সমাজে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া আপনার নাম ও স্বপ্রণীত গ্রন্থের বিবরণ ভারতে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন,—"সকল বিষয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার মানসে কেহ কেহ মহাভারতে বাল্মীকি ও তৎপ্রণীত রামায়ণের নাম সন্নিবেশ করিয়া দিলেন।"

লেখকের এই আপত্তি কতদূর বলবৎ বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। মহাভারতখনি যত প্রাচীন হউক না কেন, এই কলিযুগে উহা লোক সমাজে প্রচারিত হইয়াছে; কেবল মহাভারত বলিয়া নহে, নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনক যে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, সেই যজ্ঞে ব্যাসকৃত সমস্ত গ্রন্থ সূত গোস্বামী এবং তৎপুত্র উগ্রশ্রবা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া তথা হইতে ঐ সকল পুস্তক সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে। যদিও তৎপূর্ব্বে (বর্ত্তমান যুগে) রাজা জনমেজয় কৃত সর্পবিনাশক সত্রানুষ্ঠানে উহা বৈশম্পায়নকর্ত্তৃক সর্ব্বাগ্রে কথিত হওয়ার উল্লেখ রহিয়াছে, কিন্তু তৎকালে মহাভারত সর্ব্বত্র প্রচারিত হয় নাই। তাহা হইলে কোন না কোন পুস্তকে সর্পযজ্ঞ হইতে গ্রন্থারম্ভ দৃষ্ট হইত, কিন্তু তাহা না হইয়া ঋষিযজ্ঞ হইতে সমগ্র পুস্তকের আরম্ভ

হইয়াছে। পূর্ব্ব হইতে এতদ্দেশে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচারের একটী বিশুদ্ধ নিয়ম লক্ষিত হয়,—কোন একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত হইলে প্রসিদ্ধ যজ্ঞাদিতে উহার আদ্যোপান্ত উপদিষ্ট না হইলে তাহা প্রমাণসিদ্ধ কিম্বা লোকসাধারণ্যে প্রচারিত হইত না। তজ্জন্য তদীয় শিষ্যগণ শৌনকযজ্ঞে মহাভারত প্রভৃতি দ্বৈপায়নরচিত গ্রন্থগুলির আনুপূর্ব্বিক উপদেশ দেন; আর তাঁহাদের অনুমতিক্রমে অন্যান্য ঋষিগণ যথাশ্রুত প্রশ্নোত্তরে সংগ্রহপূর্ব্বক জন সমাজে প্রচার করেন।* কলিতে প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া অন্যান্য পুরাণ অপেক্ষা ভারতের ভূমিকা বহু বিস্তৃত, এটীও উক্ত গ্রন্থের নবীনত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। রামায়ণ আধুনিক গ্রন্থ হইলে ইদানীন্তন যজ্ঞাদিতে উহা অবশ্যই উপদিষ্ট হইয়া তদ্বিবরণে সুদীর্ঘ ভূমিকা লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইত; কিন্তু প্রাচীন পুস্তক বলিয়া উহার ভূমিকা এত অল্প যে ভূমিকা নাই বলিলেই হয়।

ভারতের বিস্তৃত ভূমিকা দেখিয়া রঙ্গলাল বাবু অনুমান করেন যে পরবর্ত্তী ব্যক্তিরা উহা লইয়া যদৃচ্ছা ব্যবহার করিয়াছেন,—বাস্তবিক তাহা নহে। গ্রন্থকার গ্রন্থ রচনা পূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে পুত্র শুকদেবকে তৎপরে বৈশম্পায়ন ও সূত গোস্বামী প্রভৃতি শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করান। নিজে গ্রন্থ রচনা ভিন্ন প্রচার করিতে পারেন নাই। বোধ হয় তাঁহার গ্রন্থ রচনা হইতে হইতে কলিযুগ উপস্থিত হইয়াছিল, তজ্জন্য তিনি গ্রন্থ প্রচারের ভার পুত্র ও শিষ্যগণের প্রতি অর্পণ করিয়া কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

> " ইদং দ্বৈপায়নঃ পূর্ব্বং পুত্রমধ্যাপয়ৎ শুকম্।
> ততোঽন্যেভ্যোঽনুরূপেভ্যঃ শিষ্যেভ্যঃ প্রদদৌ বিভুঃ "। ১০৪
> " যদধীতং পুরা সম্যক্ দ্বিজশ্রেষ্ঠৈর্ম্মহাত্মভিঃ।
> বৈশম্পায়নবিপ্রাদ্যৈস্তৈশ্চাপি কথিতং যথা। " ৪
> যদধীতঞ্চ পিত্রা মে সম্যক্ চৈব ততোময়া। " ৫ অধ্যায় ৪।

পাঠক! শৌনক যজ্ঞের পূর্ব্বে মহাভারত যে সর্ব্বত্র প্রচারিত না হইয়া গ্রন্থকর্ত্তার পুত্র ও শিষ্যগণের হস্তে ছিল, তাহা পরিষ্কৃতরূপে প্রমাণিত হইল। এস্থলে গ্রন্থকারের মত-বিরুদ্ধ একটী অসত্য বৃত্তান্ত উহাতে সন্নিবেশিত হইবে, এ কথা একবারেই অযৌক্তিক। তবে যদি কেহ বলেন যে গ্রন্থ প্রচারের পরে ঐরূপ ঘটনা হইয়াছে তাহা আমরা আদৌ গ্রাহ্য করি না; সর্ব্বত্র প্রচারিত গ্রন্থে সাহস পূর্ব্বক কখনই কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। বিশেষতঃ হিন্দুসমাজে মহাভারত একখানি ধর্ম্মশাস্ত্র, হিন্দুরা মহাভারত বেদ-

তুল্য মান্য করেন; অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রে অভিনব বিষয় সন্নিবেশিত করিতে কখনই কেহ সাহস করিতে পারে নাই। তবে প্রচারকগণ কর্ত্তৃক উহাতে যে ভূমিকা সন্নিবেশিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা মূলগ্রন্থের তিলমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নাই।

পাঠক! সর উইলিয়ম জোন্সের অনুবাদিত অভিজ্ঞান শকুন্তলা যে দিন ইউরোপে প্রচারিত হইয়াছে, সেই দিন হইতে ভারতবর্ষীয় প্রাচীন সমাজের ক্রনলজি অর্থাৎ সময়তালিকা—তদভাবে পৌর্ব্বাপর্য্য—তদভাবে মতোন্নতি-পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয়ার্থ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের তুমুল আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে। এই ৮০। ৯০ বৎসর মধ্যে কত জন যে কত প্রকার তর্কের সিদ্ধান্ত করিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। যুগযুগান্তরের বৃত্তান্ত আজি অভ্রান্তরূপে নির্ণয় করিবেন, এমন ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ অদ্যাপি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন নাই, এবং কখন যে করিবেন তাহাও বিশ্বাস হয় না। গ্রীক-সময়-তালিকা ২০০০ বৎসরের পর অসিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

যদিও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ বহুায়াস স্বীকার করিয়াও এ পর্য্যন্ত সময়তালিকা বা পৌর্ব্বাপর্য্য-নিরূপণে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহাদের এই আলোচনা যে একবারে ফল-বিহীন তাহা আমরা বলি না,—বরং এ বিষয়ের পর্য্যালোচনা দ্বারা এরূপ গূঢ় সংবাদ সকল বাহির হইয়াছে, যদ্দ্বারা আর্য্য সমাজের গতি, রীতি নীতি ও মানসিক উন্নতির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে।

রঙ্গলাল বাবু "চর্ব্বিত চর্ব্বণ" করিতেছেন বটে, তথাপি তাঁহার গবেষণায় একটু নূতনত্ব আছে; যদি তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা সমাজের কতকটা উপকার সাধিত হইতে পারে। কিন্তু তিনি বাল্মীকি ও বেদব্যাসের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয়ার্থ যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বিশুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। পুরাণাদিতে যে সকল বংশাবলী প্রাপ্ত হওয়া যায়, উহা অসম্পূর্ণ। এক একটী বংশের পুত্র পৌত্রাদির সংখ্যা ক্রমে বহুধারাবিশিষ্ট। কিন্তু পুরাণাদিতে প্রয়োজনানুসারে এক একটী ধারার উল্লেখ মাত্র রহিয়াছে; তাহা লইয়া বিচার করিলে কোন প্রকার ফল দর্শিবার সম্ভাবনা নাই।

লেখক বেদব্যাসকে প্রাচীন বলিয়া পরিচয় দিতে যতই চেষ্টা করুন না

কেন, আমরা তাঁহাকে চিনি,—তিনি অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের পিতা—যুধিষ্ঠিরের ঠাকুরদাদা। কিন্তু বাল্মীকি যে কে,—কাহার পুত্র—তাহা রঙ্গলাল বাবু অনেক চেষ্টা করিয়াও স্থির করিতে পারেন নাই,—এটীও তাঁহার প্রাচীনত্বের প্রথম লক্ষণ। রঙ্গলাল বাবু ভৃগুর যে বংশাবলী উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা ভ্রমসঙ্কুল; তিনি বলেন,—

"আদি (১) ভৃগু, (২) তৎপুত্র শুক্র, (৩) তৎপুত্র শৌকল, (৪) তৎপুত্র ঔর্ব্ব (৫) তৎপুত্র ঋচীক, (৬) তৎপুত্র জমদগ্নি (৭) তৎপুত্র পরশুরাম।"

এই বংশাবলী ভ্রমাত্মক,—পরশুরাম ভৃগুপুত্র শুক্রের ধারা হইতে উৎপন্ন হন নাই,—তিনি ভৃগুর অন্য পুত্র চ্যবনবংশ সম্ভূত; আবার চ্যবনপুত্র ঔর্ব্বকে শৌকলের পুত্র বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। যথা মহাভারতে,—

"অন্যাবুৎপাদয়ামাস পুত্রং ভৃগুরনিন্দিতং।
চ্যবনং দীপ্ততপসং ধর্ম্মাত্মানং যশস্বিনং। ৩৪।
* * * * * * *
আরুষীতু মনোঃ কন্যা তস্য পত্নী মনীষিণঃ।
ঔর্ব্বস্য তু সমভবদূরুং ভিত্বা মহাযশাঃ। ৪৬।
"ঋচীকস্তস্য পুত্রস্তু জমদগ্নিস্ততোভবৎ।" ৪৭
ঔর্ব্বস্যাসীৎ পুত্রশতং জমদগ্নিপুরোগমং। ৪৮" ৬৬ অধ্যায়।

ভৃগুর অন্য পুত্র চ্যবন, তৎপুত্র ঔর্ব্ব, তৎপুত্র ঋচীক, তৎপুত্র জমদগ্নি তৎপুত্র রাম। কিন্তু বাল্মীকি যে চ্যবন পুত্র তাহা ঠিক নয়—চ্যবনের একটী মাত্র ধারা নহে, মহাভারতেই তাঁহার আর একটী ধারার উল্লেখ রহিয়াছে, * যথা,—

"চ্যবনস্য তু দায়াদঃ প্রমতির্নাম ধার্ম্মিকঃ।
প্রমতেরপ্যভূৎ পুত্রোঘৃতাচ্যাং রুরুশ্চ্যতে।" ৯। ৫ অধ্যায়।

এই শ্লোকোক্ত চ্যবন পুত্র প্রমতি উত্তর কালে বাল্মীকি নামে অভিহিত হইয়াছিলেন কি না, তাহা আমরা এ পর্য্যন্ত স্থির করিতে পারি নাই, রামায়ণে তাঁহার পূর্ব্বনাম রত্নাকর বলিয়া উক্ত হইয়াছে,—কিন্তু এই নামটী তাঁহার দস্যু বৃত্তির জন্য প্রসিদ্ধ। আর কোন কোন মতে তাঁহার নাম

* এক মহাভারতেই যাঁহার দুটী ধারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাঁহার অন্য কোন ধারা থাকা অসম্ভব নহে, ঋষিদিগের পত্নী এবং পুত্রের সংখ্যা অনেক।

গুরু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল কারণে বোধ হয় তাঁহার অনেক-গুলি নাম ছিল।

বাল্মীকি গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে নিজের পূর্ব্বাবস্থা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ দস্যু ছিলেন; পরে ব্রহ্মা ও নারদের কৃপায় জ্ঞান লাভ করেন। জ্ঞান লাভ করার পর একদা কানন মধ্যবর্ত্তী একটী সরোবরতীরে বসিয়া রাম নাম জপ করিতেছিলেন, এমত সময়ে কোন এক ব্যাধ কামা-ভিভূত ক্রৌঞ্চমিথুনের প্রতি শর নিক্ষেপ করায় সেই শুভক্ষণে শোক-প্রযুক্ত মহর্ষির মুখমণ্ডল হইতে নিম্নোক্ত কবিতাটী নির্গত হইল;—আর শোক হইতে উৎপন্ন এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়া উহা শ্লোক নামে বাচ্য হইয়াছিল।

"মা নিষাদ! প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতং।"

পাঠক! দেখুন একবার কোথা হইতে কাব্যনিধির উৎপত্তি হইয়াছে; একটী কারণ ব্যতিরেকে কখন কি কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে? আমরা কাব্যোৎপত্তির এমন স্বাভাবিক কারণ আর কুত্রাপি দেখিতে পাই না। স্বভাবের এই মনোহর চিত্রটী সহস্র যুক্তি সহস্র তর্ক অতিক্রম পূর্ব্বক আমা-দিগের হৃদয়াভ্যন্তরে যাইয়া সুধাময়-কিরণ বিস্তার করিতেছে! এই খানের চিত্রটীর প্রতি লক্ষ্য করিলে আর কোন যুক্তিই ভাল বোধ হয় না। যেখানে অন্ধকারের ঘটা, সেইখানেই আলোকের ছটা, যেখানে অন্ধকার নাই, গগ-নোদিত রবির উজ্জ্বল দীধিতি ঢল ঢল করিতেছে—তথায় সামান্য দীপবর্ত্তি কখন কি আপনার প্রতিভা দেখাইতে পারে?

রঙ্গলাল বাবু বলেন, রামরাবণের যুদ্ধের বহুকাল পরে বাল্মীকি রামায়ণ গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু তাঁহারই প্রদর্শিত শ্লোকের দ্বারা পরিষ্কার প্রতীয়-মান হয় যে, রামচন্দ্র বর্ত্তমানেই মহর্ষি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন;—

"কোন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্য্যবান?" ১।১।২।

এই শ্লোকের যে অর্থ রঙ্গলাল বাবু করিয়াছেন, আমরাও অবিকল তাহাই করিতেছি;—

সম্প্রতি ভূতলে কে বিলক্ষণ গুণবান ও বীর্য্যবান?

পাঠক! এতদ্দ্বারা মহর্ষি কোন্ কালের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন?—যুগান্তরের কথা? না বর্ত্তমান সময়ের কথা? সম্প্রতি শব্দে যে যুগান্তর বুঝায় তাহা আমরা জানি না। এই প্রশ্নের উত্তরে নারদ কহিলেন,—

ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবোরামোনাম জনৈঃশ্রুতঃ।

অনেক স্থলে উত্তর বাক্যে প্রশ্নের অনুবৃত্তি স্বীকার করিতে হয়, শেষোক্ত শ্লোকে একটী সম্প্রতি আছে—যথা,—সম্প্রতি ভূতলে কে গুণবান্ ও বীর্য্যবান? তবে রঙ্গলাল বাবুর আপত্তি কোথায় রহিল? তিনি এতৎসম্বন্ধে বালকাণ্ডের চতুর্থ সর্গ হইতে আর একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা;—

"চিরনির্ব্বৃত্তমপ্যেতৎ প্রত্যক্ষমিব দর্শিতম্। ১। ২৮।

"বাল্মীকির আশ্রমে কুশীলব বিশুদ্ধ তান-লয়-স্বরে এমন সুমিষ্ট গান করিতেছেন যে, তাহা শ্রবণ করিয়া ঋষিগণ বলিলেন,—অনেক দিনের ঘটনা এখন যেন প্রত্যক্ষবৎ বোধ হইতেছে।"

ক্ষতি কি? অনেক দিনের ঘটনা বলিলেই যে যুগান্তরের ঘটনা হইবে, ইহা ত কখনই শুনি নাই। অনেক দিনের ঘটনা বলিলে দশ বৎসরেরও হইতে পারে, দ্বাদশ বৎসরের হইলেও হইতে পারে। কুশীলবের গান শুনিয়া ত মুনিরা ঐরূপ বলিলেন। কুশীলব কে?

রঙ্গলাল বাবুর বয়স কি জানি না—কিন্তু তিনি গুরুমহাশয়ের পাঠশালে ভট্টাচার্য্যের টোলে—এবং ইংরাজি স্কুলে—ইহার সর্ব্বত্রই যে এক এক বার প্রবেশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিলক্ষণ জানা হইয়াছে। তবে তর্কগুলিতে এমন ছেলেম কেন? কুশীলব ত রামচন্দ্রের পুত্র। তাঁহারাই রামগুণ কীর্ত্তন করিতেছেন। এতদ্দ্বারা যে রামচন্দ্র সত্যযুগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন—আর কুশীলব কলিতে তাঁহার গুণ গান করিতেছিল, ইহা কিরূপে প্রতিপাদিত হইতে পারে? তিনি রাক্ষসকুল বিনাশ পূর্ব্বক সীতাদেবীর উদ্ধার করিবার পর কিয়দ্দিন অযোধ্যায় রাজ্য করেন; তৎপরে গর্ভবতী স্ত্রী সীতাদেবীকে নির্ব্বাসিত করিলে মুনির আশ্রমে গিয়া তাঁহার সন্তান জন্মে; সেই সন্তান মুনির নিকটে শিক্ষা করিয়া রামায়ণ গান করিতেছে;—সুতরাং কীর্ত্তিকলাপ তখন কিছু পুরাতন হইয়াছে বই কি?—কিন্তু তখন রাম যে জীবিত ছিলেন, তৎপ্রতি সন্দেহ হইতে পারে না।

পাঠক! রঙ্গলাল বাবু এক্ষণে সত্য নির্ণয়ের কথা বিস্মৃত হইয়া কেবলমাত্র আপন তর্কের সমর্থন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন; তিনি সত্যকে মিথ্যা বলিয়া এবং মিথ্যাকে সত্য বলিয়া পরিচয় দিতেও লজ্জা বোধ করেন নাই। তাঁহার প্রস্তাবের একাংশে বাল্মীকির অপেক্ষা ব্যাসের সময়ে আচারগত দোষ দেখাইবার জন্য নিম্নোক্ত শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে।—

"হতে বালিনি সুগ্রীবঃ কিষ্কিন্ধ্যাং প্রত্যপদ্যত।
তাঞ্চ তারাপতিমুখীং তারাং নিপতিতেশ্বরাং।"

বনপর্ব্ব ২৮০ অ ৩১।

শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া লিখিলেন,—"বাল্মীকির পুস্তকে এ প্রথা অবলম্বিত হয় নাই, তৎকালে মনুষ্যরুচি অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, সুতরাং তিনি দেবর হস্তে বিধবা ভ্রাতৃবধূ অর্পণ করিতে পারেন নাই।"

লেখকের এই প্রস্তাবের শেষভাগে কল্পদ্রুমের সম্পাদক পাঠকগণের জ্ঞাপনার্থ লিখিয়াছেন,—

"প্রস্তাবলেখক পূর্ব্ব ক্রমাগত বালিতারা বৃত্তান্তটী প্রথমে আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, পরে উহা পরিত্যাগ করিতে লেখেন। কিন্তু আমরা যে সময়ে তাঁহার পত্র প্রাপ্ত হই, তখন উহা মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং ঐ অংশ টুকু উঠাইয়া দেওয়া হয় নাই। অতএব পাঠকগণ ঐ অংশটী পরিত্যাজ্য বিবেচনা করিবেন।" ক—স।

পাঠক! সম্পাদক মহাশয়ের উপদেশানুসারে বালিতারা বৃত্তান্তটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাঠ করুন, তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু লেখক না জানিয়া শুনিয়া কিরূপে একটা অযথা বৃত্তান্ত লিখিয়া তদ্দ্বারা স্বাভিমত সমর্থনের চেষ্টা করিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।—ইহা কি শিক্ষিত লোকের পক্ষে লজ্জা ও উপহাসের কারণ নহে? মহর্ষি বাল্মীকি কেবল বিধবা ভ্রাতৃবধূ তারাকে বালীর হস্তে সমর্পণ করিয়া সন্তুষ্ট হন নাই,—তিনি রাবণ বধের পর তদীয় মহিষী মন্দোদরীকেও বিভীষণহস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। সে কথা এতদ্দেশের মুটে মজুর পর্য্যন্ত অবগত আছে। কিন্তু রঙ্গলাল বাবু বিজ্ঞ লোক হইয়া এই সংবাদটা রাখেন না ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়!!

পাঠক মহাশয়! বলুন দেখি নিম্নোক্ত কবিতাটী কাহার?

"অস্থিবৎ দধিবচ্চৈব শঙ্খবদ্বকবত্তথা।
রাজন্ তব যশোভাতি পুনঃ সন্ন্যাসিদণ্ডবৎ।"

আপনি কি বলিতে পারেন যে, শ্লোকটী মহাকবি কালিদাসের? বোধ হয় মহাকবির অবমাননাভয়ে আপনি কখনই বলিতে পারিবেন না যে এমন নিকৃষ্ট কবিতা কালিদাসের; কিন্তু শ্লোকটী বাস্তবিক সেই মহাকবির রচিত। তিনি কার্য্যানুরোধে আপনাকে নির্বোধ বলিয়া পরিচয় দিতেন এবং তদনুরূপ নিকৃষ্ট কবিতাও রচনা করিতে পারিতেন। তিনি ভোজরাজ-

সভায় প্রবেশার্থ কবিতাটী রচনা পূর্ব্বক পণ্ডিতবর শঙ্করের নিকট উপস্থিত করেন। শঙ্কর কবিতাটী পাঠ করিয়া ভাবিলেন এ ব্যক্তি নিতান্ত "হাবা"। অতএব ইহাকে লইয়া অদ্য রাজসভায় বিলক্ষণ আমোদ ও কৌতুক করা যাইবে। এই ভাবিয়া শঙ্কর বহু যত্নে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া রাজসভায় উপস্থিত করিয়াছিলেন। পরন্তু কবিবর সভাস্থলে উপনীত হইয়া তদীয় অলৌকিক কবিত্বপ্রভাবে ভূপতি ও সভাসদগণকে যেরূপে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠকগণ বিলক্ষণ অবগত আছেন। এস্থলে তাহার উল্লেখ করা অনাবশ্যক। যদি কবিবর প্রথমেই শঙ্করের নিকট স্বীয় কবিত্বের পরিচয় দিতেন, তাহা হইলে ভোজসভায় প্রবেশ করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিত না।

আমরাও কবিকুলকেশরী কালিদাসের নিকট এই কৌশলটী অভ্যাস করিয়াছি। অনেক স্থলে লোকের আন্তরিকভাব ও বিদ্যাবুদ্ধির পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত একটু "হাবা হাবা" ভাব দেখাই। আমি দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর উপলক্ষে রঙ্গলাল বাবুর বিজ্ঞতা পরীক্ষার্থ ইত্যগ্রে কয়েক পংক্তি লিখিয়াছিলাম, আমার উহা লিখিবার যে উদ্দেশ্য ছিল, তাহা সাধিত হইয়াছে। রঙ্গলাল বাবু হাস্যরসে কতদূর সুরসিক, তাহা বিলক্ষণ বুঝা গিয়াছে। তিনি অনেক আমোদ কৌতুকের পর লিখিয়াছেন,—

"অতএব কুন্তীর অসতীপনা ঢাকিবার নিমিত্ত পাঁচ জনে মিলিয়া দ্রৌপদীকেও যে অসতী করিয়াছিলেন, সে যুক্তিযুক্তই হইয়াছিল, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের পক্ষে নয়। ব্যাস তাঁহার চরিত্র চিত্র করিতে গিয়া কই!—তেমন তুলি টানেন নাই।"

লেখকের সকল বাক্য তুলিতে গেলে "পুঁথি বেড়ে যায়"। অতএব কাজ নাই, এ দিকে আমিও আমোদ প্রমোদ করিতে করিতে বিচারস্থলে উপনীত হইয়াছি। কই—রঙ্গলাল বাবু কোথায়? আপনার "পাঁজি পুঁথি" খুলে নিয়ে এখন একবার আসুন দেখি স্বয়ম্বর পর্ব্বের বিচার করি।

পাঠক! দুটী ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সমপ্রাকৃতিক দুটী চিত্র যদি ভিন্ন ভিন্ন চিত্রকর কর্ত্তৃক চিত্রিত হয়, তবে কোন্‌টীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল অধিকতর কৌশলে চিত্রিত ও নানা রঙে রঞ্জিত হইবে? বোধ হয়, রঙ্গলাল বাবু অস্বীকার করিবেন না যে, শেষ-চিত্রকর অধিকতর চিত্রচাতুর্য্য দেখাইতে চেষ্টা করিবেন। এক দিকে জনক-তনয়ার স্বয়ম্বরস্থলে একখানি পুরাতন হরধনুঃ

মাত্র পতিত রহিয়াছে, অন্য দিকে কৃষ্ণার স্বয়ম্বরস্থলে শূন্যমার্গে অত্যাশ্চর্য্য কৌশলে একটী চক্র ‡ সংস্থাপিত হইয়াছে,—সর্ব্বাগ্রে সুদর্শন চক্র, তদুপরি রাধাচক্র, উভয়ই ঘূর্ণমান; সেই উভয় চক্রের উপরিভাগে অলক্ষিতরূপে একটী মৎস্য স্থাপিত। একস্থলে শরাসন খানি বাহুবলে ভাঙ্গিয়া দ্বিখণ্ড করিতে হইবে, অন্য স্থলে শরাসনে পঞ্চশর সংযোজিত করিয়া সুদর্শন ও রাধাচক্রের সূক্ষ্মরন্ধ্র-মধ্য দিয়া মৎস্যের চক্ষু বিদ্ধ করিতে হইবে; আবার শর নিক্ষেপ কালে অধোমুখে জলে ছায়া দেখিয়া বিদ্ধ করিতে হইবে।

পাঠক! যে দুটী চিত্র উপরে প্রদর্শিত হইল, তন্মধ্যে কাহার চিত্রচাতুর্য্য অধিক? বোধ হয় শেষোক্ত ব্যক্তিই অধিকতর চিত্রকৌশল দেখাইয়াছেন। যদি তাহাই হইল, তবে বাল্মীকি কি এতই নিকৃষ্ট কবি যে বেদব্যাসের স্বয়ম্বর পর্ব্বের এত সূক্ষ্ম কৌশল দেখিয়া শুনিয়াও তিনি তদপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রাকৃতিক জানকীর ধনুর্ভঙ্গ পণের চিত্রটী চিত্রিত করিলেন? কেবল একটী স্থল নহে, আমরা অনেক স্থলে উভয় গ্রন্থের মধ্যে এইরূপ প্রভেদ দেখিতে পাই। যে চক্রব্যূহমধ্যে বালক অভিমন্যু প্রবেশ করিয়াছিল, উহার রচনাকৌশল দেখিলে অতিকায় ও ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি মহাবীরগণও কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পলায়ন করিতেন। ফলতঃ আমরা যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে রামায়ণে বাহুবল এবং মহাভারতে যুদ্ধকৌশল অধিক!

লেখক পঞ্চভ্রাতায় মিলিয়া দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ প্রসঙ্গে তদানীন্তন আচার ব্যবহার ও গ্রন্থকর্ত্তার প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। এই বিষয়ের মীমাংসা করিতে অন্যত্র যাইতে হইবে না,—সমগ্র বৈবাহিক পর্ব্ব ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পার্থ যখন মৎস্যচক্ষু বিদ্ধ করেন—যখন কৃষ্ণাকে লাভ করিয়া পাঞ্চাল নগর হইতে কুটীরাভিমুখে যাত্রা করেন, তৎকালে পঞ্চ জনে পাণিগ্রহণ করার কোন প্রসঙ্গই ছিল না। পরে যখন কৃষ্ণাকে সমভি-

(‡) "যন্ত্রং বৈহায়সঞ্চাপি কারয়ামাস কৃত্রিমম্।
তেন যন্ত্রেণ সমিতং রাজা লক্ষ্যং চকার সঃ। ১০।
ইদং সজ্যং ধনুঃ কৃত্বা সজ্জৈরেভিশ্চ সায়কৈঃ।
অতীত্য লক্ষ্যং যোবেদ্ধা সালব্ধা মৎসুতামিতি।" ১১।
"ইদং ধনুর্লক্ষ্য মিমে চ বাণাঃ শৃণ্বন্তু মে ভূপতয়ঃ সমেতাঃ।
ছিদ্রেণ যন্ত্রস্য সমর্পয়ধ্বং লক্ষ্যং শিতৈর্ব্যোমচরৈর্দশার্দ্ধৈঃ।" ৩৪।
১৮৪ অধ্যায়।

ব্যাহারে করিয়া কুটীরে উপনীত হইলেন, তখনি প্রাঙ্গন-দ্বার উদ্ঘাটিত হইল! পুত্রেরা কোন প্রকার ভক্ষ্য সামগ্রী লাভ করিয়া প্রত্যাগত হইয়াছেন ভাবিয়া কুন্তীদেবী পাঁচ জনকে সমভাগে বিভক্ত করিয়া লইতে আদেশ করেন; পরক্ষণে কৃষ্ণাকে পশ্চাদ্বর্ত্তী দেখিয়া নিজের অনবধানতায় অনুতাপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

"কুটীগতা সা ত্বনবেক্ষ্য পুত্রৌ প্রোবাচ ভুঙক্তেতি সমেত্য সর্ব্বে।" ২

"পশ্চাচ্চ কুন্তী প্রসমীক্ষ্য কৃষ্ণাং কষ্টং ময়া ভাষিতমিত্যুবাচ।" ২

১৯১ অধ্যায়।

পুত্রেরা পরম ধার্ম্মিক—তাঁহারা মাতাকে পরম গুরু বলিয়া জানেন; সাবধানতাবশতঃ হউক, আর অনবধানতা বশতই হউক, মাতা যাহা আদেশ করিবেন, কখন কি তাহার অন্যথা হইতে পারে? মাতার আজ্ঞা বেদবাক্য অপেক্ষাও গুরুতর। অতএব মাতার আজ্ঞাক্রমে যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে কি আর প্রত্যবায় আছে?

যখন পঞ্চ জনের পাণিগ্রহণ করার প্রস্তাব উত্থাপিত হইল, তখন সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধ বলিয়া চতুর্দ্দিক হইতে আপত্তি উপস্থিত হইতে লাগিল। যদ্যপি তৎকালে সমাজবন্ধন সুদৃঢ় না হইত, তাহা হইলে ঐরূপ আপত্তি উত্থাপনের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির মাতৃ-আজ্ঞা পালনানুরোধে প্রাচীন দৃষ্টান্তসকল সংগ্রহ পূর্ব্বক সমুদায় আপত্তির খণ্ডন করিলেন।

আপত্তি।

"অধর্ম্মোঽয়ং মম মতো বিরুদ্ধোলোকবেদয়োঃ।
নহ্যেকা বিদ্যতে পত্নী বহুনাং দ্বিজসত্তম। ৭
কর্ত্তুমস্মদ্বিধৈর্ব্রহ্মংস্ততোঽয়ং ন ব্যবস্যতে।
পঞ্চানাং মহিষী কৃষ্ণা ভবত্বিতি কথঞ্চন?" ১২

খণ্ডন।

"শ্রূয়তে হি পুরাণেঽপি জটিলা নাম গৌতমী।
ঋষীনধ্যাসিতবতী সপ্ত ধর্ম্মভৃতাম্বরা। ১৪
তথৈব মুনিজা বার্ক্ষীতপোভির্ভাবিতাত্মনঃ।
সঙ্গতাভূদ্দশ ভ্রাতৄনেকনাম্নঃ প্রচেতসঃ। ১৫।
গুরোর্হিবচনং প্রাহুর্ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মজ্ঞসত্তম।

গুরূণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং মাতা পরমকো গুরুঃ। ১৬
সাচাপ্যুক্তবতী বাচং ভৈক্ষ্যবদ্ভুজ্যতামিতি।
তস্মাদেতদহং মন্যে পরং ধর্ম্মং দ্বিজোত্তম। ১৭।"

পাঠক! যুধিষ্ঠির কি বলিলেন? তিনি বলিলেন মাতা পরম গুরু—মাতৃ-আদেশ পালন করাই আমাদের পরম ধর্ম্ম, কিন্তু রঙ্গলাল বাবু বলেন দ্রৌপদী অসতী। যদি পতিসঙ্গ করিলে স্ত্রীলোক অসতী হয়, তবে সতী কে? না—না—পতিপরায়ণা স্ত্রী কি কখন অসতী হইতে পারে? ভাল, যদি তাহা না হয় তবে দ্রৌপদী অসতী কেন? পাঁচটী পতি বলিয়া? ভাল ভাল—যদি একাধিক পাত্রে উদ্বাহিত হইলে স্ত্রীলোক অসতী হয়, তবে একাধিক স্ত্রীর পাণিপীড়ন করিলে পুরুষেরা লম্পট হইবে না কেন? পুরুষের বেলায় বুঝি দোষ নাই—" পুরুষ পরশ মণি "!!!

এস্থলে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক। পাঞ্চালীর পঞ্চ স্বামী দেখাইয়া রঙ্গলাল বাবু বলেন,—বেদব্যাসের সময়ে সামাজিক আচার ব্যবহার অসভ্য জনোচিত বা অমার্জ্জিত থাকা প্রযুক্ত মহাভারত গ্রন্থ যে সমাজের আদিম অবস্থার আদর্শ তাহাই প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে,—মহাভারত অতীব সুসভ্য মানব সমাজের আদর্শ স্বরূপ। যখন পাণ্ডবগণ একচক্রা নগরে এক ব্রাহ্মণের আবাসে বাস করিতেছিলেন, সেই ব্রাহ্মণপত্নী রাক্ষস ভয়ে ভীতা হইয়া পতি ও পুত্র কন্যার প্রাণরক্ষার্থ আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করিয়া স্বামিকে যে সকল প্রবোধসূচক নীতি কহিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত উপদেশগুলি প্রাপ্ত হওয়া যায়,—

" সমীক্ষ্যৈতদহং সর্ব্বং ব্যবসায়ং করোম্যতঃ। ৩৪
উৎসৃজ্যাপি হি মামার্য্য! প্রাপ্স্যস্যন্যামপি স্ত্রিয়ম।
ততঃ প্রতিষ্ঠিতো ধর্ম্মো ভবিষ্যতি পুনস্তব। ৩৫
ন চাপ্যধর্ম্মঃ কল্যাণ! বহুপত্নীকতা নৃণাং।
স্ত্রীণামধর্ম্মঃ সুমহান্ ভর্ত্তুঃ পূর্ব্বস্য লঙ্ঘনে "। ৩৬

১৫৮ অধ্যায়।

এই সকল ভাবিয়াই আমি আত্মবিসর্জ্জন স্থির করিয়াছি। আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আপনি আবার বিবাহ করিতে পারেন, তাহাতে পুনর্ব্বার আপনার ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে। হে মঙ্গলনিধান! পুরুষে বহুবিবাহ করিলে

ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হয় না। কিন্তু স্ত্রীজাতি পূর্ব্বস্বামীকে অগ্রাহ্য করিয়া পুরুষান্তর আশ্রয় করিলে অধর্ম্মভাগিনী হয়।

পাঠক! দেখুন বেদব্যাসের সময়ে সমাজের কত উন্নত অবস্থা। এক জন স্ত্রীলোক স্বামীকে কিরূপ নীতি কহিতেছে। ইহার সমগ্রভাগ পাঠ করিয়া দেখিবেন, তদ্দ্বারা পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন যে সমাজের ইহার অপেক্ষা উন্নতি কস্মিন্ কালেও হয় নাই।

পাঠক! প্রভাকর পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত মহোদয় বড় সুকবি ছিলেন। তাঁহার কবিতাগুলি যেমন প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত, তেমনি মনের ভাব ব্যক্ত করিবার যথার্থ উপযোগী। তিনি এক স্থলে লিখিয়াছেন,—

"কথাগুলি পাকা পাকা কহিতেছ বাছা,
অথচ তোমার দেখি বুদ্ধিটুকু কাঁচা।"

প্রবোধ প্রভাকর।

রঙ্গলাল বাবু বাল্মীকি ও বেদব্যাসের ভাষা পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পাকা পাকা তর্কগুলি ধরিয়াছেন, অথচ ভাষা-বিভেদের প্রকৃত তথ্যের অনুসন্ধান করিয়া লন নাই, ইহাই বড় দুঃখের বিষয়!

আমরা ইত্যগ্রে স্বীকার করিয়াছি যে, বেদব্যাসের ভাষা জটিল, বাল্মীকির ভাষা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার বা প্রাঞ্জল। এক্ষণে পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তির ভাষা প্রাঞ্জল ও পরবর্ত্তী ব্যক্তির ভাষা জটিল হইবার তাৎপর্য্য কি? এস্থলে তাহাই আলোচনীয়।

অধুনা দেশের ভিন্ন ভিন্ন ভাগে যেরূপ ভাষার তারতম্য দেখা যায়, সংস্কৃতভাষী আর্য্যগণেরও পূর্ব্বকালে ঐরূপ ছিল কি না, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু ঐরূপ থাকারই অধিক সম্ভাবনা। কৃষ্ণনগরের সহিত বরিশালের ভাষার তুলনা করিলে সুধা ও কাঞ্জিক রসে যে প্রভেদ; ঠিক তদনুরূপ বোধ হয়। তবে প্রাচীন আর্য্যসমাজের সংবাদ আমরা অবগত না থাকায় তদ্বিষয়ে তর্ক করা বিফল। বরং যে বিষয় আমাদের সমক্ষে দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তাহাই লইয়া বিচার করা কর্ত্তব্য।

দ্বৈপায়ন মহাশয় গ্রন্থপ্রণয়নে কৃতসংকল্প হইয়া পদ্মযোনির নিকটে এক জন যোগ্য লেখকের জন্য প্রস্তাব করেন। বিধাতা লেখকাগ্রগণ্য গণপতিকে স্মরণ করিতে উপদেশ দেওয়ায় মহর্ষি তাহাই করিলেন। গুণনায়ক

ঋষির আহ্বানক্রমে উপনীত হইলে পরস্পর গর্ব্বোক্তি সহকারে নিম্নোক্ত প্রতিজ্ঞা নির্দ্ধারিত হইল।——

"পূজিতশ্চোপবিষ্টায় ব্যাসেনোক্তস্তদানঘ।
লেখকোভারতস্যাস্য ভব ত্বং গণনায়ক। ৭৬
ময়ৈব প্রোচ্যমানস্য মনসা কল্পিতস্য চ।
শ্রুত্বৈতৎ প্রাহ বিঘ্নেশোযদি মে লেখনী ক্ষণম্। ৭৭
লিখতো নাবতিষ্ঠেত তদাস্য লেখকোহ্যহম্।
ব্যাসোঽপ্যুবাচ তং দেবমবুদ্ধা মালিখ ক্বচিৎ। ৭৮

১ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন গণনায়ক! আমি মনোমধ্যে কল্পনা করিয়া ভারত কহিব, আপনি উহার লেখক হইবেন। তাহা শুনিয়া গণপতি কহিলেন হাঁ আমি লেখক হইতে পারি,যদ্যপি আপনি অবিশ্রান্ত কহিতে পারেন, যাহাতে ক্ষণকাল মাত্র আমার লেখনীর বিরাম না হয়। ব্যাস গণেশের মানসিক ভাব বুঝিতে পারিয়া অঙ্গীকার করিলেন, হাঁ তাহাই হইবে, কিন্তু আপনি অর্থ না বুঝিয়া লিখিবেন না।

একেত গ্রন্থকার বেদব্যাস,—আপনাকে বেদপ্রণেতা বলিয়া পরিচয় দিবার নিমিত্ত নিয়ত উৎসুক, তাহাতে আবার গণেশ আসিয়া গর্ব্ব করিয়া বলিলেন, আমি ভারত লিখিতে পারি, কিন্তু ক্ষণমাত্র আমার লেখনীর বিরতি না হয়। ব্যাস ভাবিলেন কি!—আমি বেদব্যাস আমাকে সামান্য জ্ঞান! অমনি সদর্পে কহিলেন হাঁ তাহাই হইবে; কিন্তু আপনি অর্থ বোধ না করিয়া লিখিবেন না। প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া একটী কার্য্য করিতে গেলে পরস্পর মনের ভাব যেরূপ হয়, পাঠকগণ বিলক্ষণ অবগত আছেন। গণপতির চেষ্টা ব্যাসের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেন, ব্যাসের চেষ্টা গণেশের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবেন। গণপতি যথাশক্তি লেখনী পরিচালন করিতে লাগিলেন; বেদব্যাস বেদ স্মরণ পূর্ব্বক এতই কূটার্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, যে উহার অর্থবোধ করিতে গণেশের স্বেদ নির্গত হইতে লাগিল। ইহাতে ব্যাসের ভাষা যে জটিল হইয়া পড়িবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

যেরূপ মহাভারতের ভাষা কঠিন হওয়ার কারণ প্রদর্শিত হইল, তদ্রূপ রামায়ণের ভাষাটী প্রাঞ্জল ও বিশদ হওয়ার বিশিষ্ট কারণ এস্থলে বিবৃত করা আবশ্যক। যেরূপ মহাভারতের প্রচারক বৈশম্পায়ন ও সূতগোস্বামী, তদ্রূপ

রামায়ণের প্রচারক কুশীলব নামে দুই বালক। মহর্ষি রঘুবংশের উপাখ্যান তদ্বংশীয় শিশুর দ্বারা প্রচার করিতে অধিকতর কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য গ্রন্থ রচনা পূর্ব্বক কুশীলবকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কূটার্থ বা কঠিন ভাষা কি কখন বালকের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে? শিশুদ্বয়ের শিক্ষোপযোগী করিবার নিমিত্ত সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় পদবিন্যাস করিতে মহর্ষি যথোচিত চেষ্টা করিয়াছেন। রামায়ণ গ্রন্থ যে কুশীলব কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা তপোবনে ও অযোধ্যার রাজভবনেই সর্ব্বাগ্রে রামায়ণগীত শুনিতে পাই। অতএব রামায়ণ আদিম গ্রন্থ হইলেও শিশুদিগের শিক্ষার নিমিত্ত প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত হইয়াছিল। এস্থলে আরো একটী কথা বলা আবশ্যক যে বৈদিক ভাষা স্বতন্ত্র; বেদ ব্যতীত পুরাণ, দর্শন সাহিত্য প্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্র লইয়া আলোচনা করিলে পরিষ্কার দেখা যায় যে, পৌরাণিক ভাষা অপেক্ষাকৃত সরল; অধ্যাপক মহাশয় বুঝাইয়া না দিলেও উহার অধিকাংশ অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হয়। কিন্তু দর্শন ও আধুনিক সাহিত্যে দন্তস্ফুট করে কাহার সাধ্য? রঙ্গলাল বাবু যে আর্ষ প্রয়োগের ধুয়া ধরিয়াছেন, সেই আর্ষপ্রয়োগ সর্ব্বত্র আছে। উহা রামায়ণ ও মহাভরত উভয়ত্রই দৃষ্ট হয়;—তবে ন্যূনাতিরেক এই মাত্র প্রভেদ, শ্লোকাকারে যত কিছু পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, সকল গ্রন্থেই আর্ষপ্রয়োগ আছে, তদ্দ্বারা পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণীত হইতে পারে না।

পাঠক! আজি রঙ্গলাল বাবুর আপত্তিগুলি মনোমধ্যে আন্দোলন করিতে করিতে মহাভারতখানি সম্মুখে রাখিয়া যেই মাত্র উহার পত্র উল্টাইয়াছি, অমনি তদীয় আপত্তি খণ্ডনের অকাট্য প্রমাণগুলি যেন আপনা হইতেই আমার নেত্রপথে আসিয়া উদিত হইল। আমরা সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ ঋষিদিগের কথা, না,—রঙ্গলাল বাবু যাহা বলেন তাহাই বেদমন্ত্র স্বরূপ বিশ্বাস করিব? বোধ হয় আধুনিক লোক অপেক্ষা প্রাচীন ঋষিরাকাই আমাদিগের নিকট অগ্রগণ্য। রঙ্গলাল বাবু বলেন, কুরুপাণ্ডবদিগের বৃত্তান্ত ব্যাসের রচিত নহে। আর, ভারতবংশের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া গ্রন্থের নাম মহাভারত হয় নাই। কিন্তু নিম্নোক্ত শ্লোকে সে আপত্তির খণ্ডন হইতেছে,—

" ভরতানাং মহজ্জন্ম মহাভারতমুচ্যতে।" ৬৯।৬২ অধ্যায়।

বিজ্ঞ লেখক আরো বলেন পূর্ব্বকালে মনুষ্যেরা দীর্ঘজীবী ছিল না,—উহা

"যুগবিশেষের প্রশংসাবাদমাত্র" কিন্তু শাস্ত্রকারগণ বলেন, কালক্রমে মনুষ্যের পরমায়ু ও শক্তি উভয়ের হ্রাস হইতেছে। দ্বৈপায়নমহাশয় যে বেদের ব্যাস অর্থাৎ বিভাগ করেন, তাহার কারণ আর কিছুই নহে,—কেবল যুগে যুগে একপাদ করিয়া ধর্ম্মের ক্ষয় ও তৎসঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের আয়ু ও শক্তি হ্রাস পাইতেছে বলিয়া তিনি কেবল বেদের বিভাগ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই,—অল্পায়ু প্রযুক্ত যাহারা বহু বিস্তৃত বেদের অধ্যয়নে সমর্থ হইবে না, তাহাদের হিতকামনায় ভরতবংশের উপাখ্যান সহকারে বেদের সারতত্ত্ব সঙ্কলন পূর্ব্বক পঞ্চম বেদ নামে মহাভারত গ্রন্থ রচনা করেন,—

"পাদাবসারিণং ধর্ম্মং সতু বিদ্বান্ যুগে যুগে।
আয়ুঃ শক্তিঞ্চ মর্ত্ত্যানাং যুগাবস্থামবেক্ষ্য চ। ৮৭।
ব্রহ্মণোব্রাহ্মণানাঞ্চ তথানুগ্রহকাঙ্ক্ষয়া।
বিব্যাস বেদান্ যস্মাৎ স তস্মাদ্ব্যাস ইতি স্মৃতঃ। ৮৮।
বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্।
সুমন্তুং জৈমিনিং পৈলং শুকং চৈব স্বমাত্মজং। ৮৯
প্রভুর্ব্বরিষ্ঠোবরদোবৈশম্পায়নমেব চ।
সংহিতাস্তৈঃ পৃথক্ত্বেন ভারতস্য প্রকাশিতাঃ"। ৯০

৬৩ অধ্যায়।

পরাশরতনয় দেখিলেন ধর্ম্ম যুগে যুগে এক পাদ করিয়া ক্ষয় পাইতেছে, মনুষ্যের আয়ু ও শক্তিও অবস্থাক্রমে যুগের অধীন হইয়াছে। অতএব ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণের হিতকামনায় বেদের ব্যাস অর্থাৎ বিভাগ করিলেন; সেই হেতুই মহর্ষি বেদব্যাস বলিয়া খ্যাত হইলেন। ঋষি পঞ্চম বেদতুল্য এই ভারত সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, আপনার পুত্র শুক এবং বৈশম্পায়নকে অধ্যয়ন করান। তাঁহারা ভারতসংহিতা পৃথক পৃথক করিয়া প্রকাশ করেন।

পাঠক! মহাভারত আদি গ্রন্থ হইলে যুগে যুগে এক পাদ করিয়া ধর্ম্মের ক্ষয় হইতেছে ও মনুষ্যের আয়ু ও শক্তি হ্রাস পাইতেছে, এ সকল কথা বলিবার তাৎপর্য্য কি? এ স্থলে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য পরিস্ফুটরূপে জানিতে পারা যাইতেছে। তিনি দেখিলেন, যুগভেদে যেরূপ ধর্ম্মের প্রতি লোকের আস্থা কমিয়া আসিতেছে, তদ্রূপ লোকের আয়ুঃকালও দিন দিন সঙ্কীর্ণ হইতেছে। অতএব বহু বিস্তৃত বেদ অধ্যয়ন পূর্ব্বক তাহারা যে জ্ঞান লাভ করিবে, ইহা কখনই সম্ভাবিত নহে; তজ্জন্য তিনি সমগ্র বেদ সঙ্কলন পূর্ব্বক চারি ভাগে

বিভক্ত করিলেন; তাহার তাৎপর্য্য এই যে লোকের শিখিবার পক্ষে সুবিধা হইবে। কিন্তু যখন দেখিলেন, তদ্বারাও সম্পূর্ণরূপে উদ্দেশ্যসাধনের সম্ভাবনা নাই, তখন ভারতবংশের উপাখ্যান সহকারে বেদের সারতত্ত্ব সঙ্কলন পূর্ব্বক মহাভারত গ্রন্থ রচনা করিলেন। অতএব এই মহাভারত গ্রন্থ যে কলির প্রারম্ভে লোকের আয়ু ও অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া রচিত হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মহাভারতের সমগ্র ভাগ বেদব্যাসের রচিত নহে বলিয়া রঙ্গলাল বাবু একটী ধুয়া ধরিয়াছেন। সে কথার মীমাংসা উপরি উক্ত শ্লোকে পরিস্ফুতরূপ রহিয়াছে; গ্রন্থকার গ্রন্থ রচনা পূর্ব্বক স্বীয়-পুত্র শুকদেব ও বৈশম্পায়ন প্রভৃতি শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। তাঁহারা উহা পৃথক পৃথক পর্ব্ব ও অধ্যায় ক্রমে বিভাগ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; আবার যজ্ঞাদিতে শ্রোতৃগণের অভিপ্রায়মত যেরূপ প্রশ্নোত্তরে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, ঠিক তদনুরূপ সংগ্রহ পূর্ব্বক জনসমাজে প্রকাশ করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ব্যাসের অনুপদিষ্ট কি অনভিপ্রেত প্রসঙ্গ উহাতে কখনই সন্নিবেশিত হয় নাই। গ্রন্থকারের পুত্র ও শিষ্যগণকর্ত্তৃক তাঁহার গৌরবের লাঘব করা হইবে, এ কথা একবারে অশ্রোতব্য ও অযৌক্তিক। ভারতের সর্ব্বত্রই রামায়ণের প্রসঙ্গ। যথা পর্ব্বসংগ্রহে,—

রামায়ণমুপাখ্যানমত্রৈব বহুবিস্তরং।
যত্র রামেণ বিক্রম্য নিহতোরাবণোযুধি। ২৭০।

পাঠক! এইবারে বোধ হয় রঙ্গলাল বাবুর সমুদায় আপত্তি খণ্ডিত হইয়াছে এবং বাল্মীকি যে বেদব্যাসের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক, তৎপক্ষে আর সন্দেহের কারণ নাই। রঙ্গলাল বাবু যতই তর্ক করুন না কেন, সত্যের জয় সর্ব্বত্র। আমরা তাঁহারি প্রদর্শিত প্রমাণের দ্বারা তাঁহার মত খণ্ডন করিয়াছি, ইহার অপেক্ষা শ্লাঘার বিষয় আর কি আছে?

সন ১২৮৮ সাল।
২৫ এ আশ্বিন।

শ্রীযাদবচন্দ্র সরকার
যশোহর।

দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ট্রেণ সাক্টীগড় ষ্টেষণ অতিক্রম করিয়া মেমারিতে উপস্থিত হইলে বরুণ

কহিলেন, এই স্থানের নাম মেমারি। মেমারির কয়েক মাইল দূরে দামোদর নদ প্রবাহিত। বর্ষাকালে ঐ নদ বর্দ্ধিত হইয়া বড় অত্যাচার করিয়া থাকে। স্রোতে নৌকা ডুবিয়া অনেক মনুষ্যের প্রাণ নষ্ট হয়। কখন কখন দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া সমস্ত দেশ প্লাবিত হইয়া যায়। নদটীর রামঘর নামক পাহাড় হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। মেমারিতে ইংরাজ পথিকদিগের থাকিবার জন্য একটী ডাকবাঙ্গালা আছে।

ট্রেণ আবার ছাড়িল এবং অনতিবিলম্বে বৈঁচি ষ্টেষণে আসিয়া দেখা দিল। বরুণ কহিলেন, এই স্থানের নাম বৈঁচি। এই স্থানে ও ইহার সন্নিকটস্থ ২।১টী পল্লিগ্রামে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমীদার আছেন। এই স্থান হইতেই বৰ্দ্ধমান জেলা আরম্ভ হইয়াছে।

ব্রহ্মা। পল্লীগ্রামের জমীদারেরা কেমন?

ঐ কলকাতার ধরণের। তবে ইহাঁদের মনটা বড় ক্ষুদ্র। একবার এক জমীদার একগাছি আক হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার একটী শিশুপুত্র ছুটিয়া আসিয়া কহিল "বাবা! আক দে।" এই সময় তাঁহার একটী ভ্রাতুষ্পুত্রও ছুটিয়া আসিয়া কহিল "জেঠা মহাশয়! একটু আক দেও?" বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রকে ফাকী দিয়া সমস্ত আক গাছটী পুত্রকে দিবারই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় অগত্যা আকগাছটী দুই খণ্ডে ভাঙ্গিয়া ডগার দিকটে দিতে গেলেন। ভ্রাতুষ্পুত্র কহিল, এখান নয়, "ও হাতের খানা।" ইহাতে তিনি প্রতারণা করিবার অভিপ্রায়ে যতবার হাত ফের ফার করেন, সেও তত বার কহে জেঠা মহাশয়! ঐ খানা। বালকের পিতা বারেণ্ডা হইতে এই ঘটনা দেখিয়া হাস্‌তে হাসতে নামিয়া আসিয়া কহিলেন, দাদা! চলুন বিষয় ভাগ করি গে। বাবু কহিলেন "কেন ভাই?" ভ্রাতা কহিলেন "দাদা! একগাছি আক নিয়া আমার পুত্রকে প্রতারণা করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, যদি আজ কাল আমার মৃত্যু হয়, আমার বালককে বালক পাইয়া বিষয় লইয়া যে কি করিবেন বলিতে পারি না।" বলিয়া সেই দিন হইতেই পৃথক হইলেন।

ব্রহ্মা। কলিতে ঐরূপই হইবে। ভাল বরুণ! ঐ যে একটা রাস্তা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে, ও রাস্তাটা কোথায় যাইবে?

বরুণ। আজ্ঞে, এ রাস্তাটার নাম গ্রাণ্ড ট্রঙ্ক রোড। এ রাস্তা পলতা

নামক স্থান হইতে আরম্ভ হইয়া হুগলি, মগরা, পাণ্ডুয়া মেমারি, বৈঁচি ও বর্দ্ধমানের নিকট দিয়া রাণীগঞ্জের অভিমুখে বরাবর চলিয়া গিয়াছে।

ইন্দ্র। রাস্তাটীর নাম কি?—গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড? ইংরাজরাজ্যে কি রাস্তা ঘাটেরও নাম আছে?

বরুণ। আছে বৈ কি। যথা—গবর্ণমেণ্ট-রোড, ফেরিফণ্ড হইতে উদ্ধৃত টাকায় নির্ম্মিত ফেরিফণ্ড রোড, মিউনিসিপাল-রোড, এবং সাহায্যকৃত রোড ইত্যাদি।

ইন্দ্র। আমরাও স্বর্গে গিয়া রাস্তার নাম করণ করিব।

নারা। আমার বাড়ীর কাছের রাস্তাটার নাম থাকলো—বৈকুণ্ঠ সড়ক।

আবার ট্রেণ ছাড়িল এবং অনতি বিলম্বে উপ পাণ্ডুয়ার মন্দির দেখিয়া " চীৎকার শব্দে কহিল " বরুণ কাকা! ওটা কি?

বরুণ। এই পাণ্ডুয়ায় ট্রেণ এল।

বলিতে না বলিতে ট্রেণ "ঝাঁ ঝমাৎ" শব্দে ষ্টেষণে থামিল। দেবগণ তাড়াতাড়ি ট্রেণ হইতে নামিয়া দেখেন—চাচারা কলিকাতায় কুঁকড়ো চালান দিবার জন্য এক গণ্ডা, দুইগণ্ডা করিয়া গণে গণে চাঙ্গারি বোঝাই করিতেছে।

নারা। বরুণ! এই কুঁকড়োগুলো কি হবে?

বরুণ। কলিকাতার বাজারে উচ্চে, আলু তরকারী প্রভৃতির ন্যায় বিক্রয় হইবে। আহা! সাহেব বাড়ীর বাবুরচিরা পেঁয়াজ ও রশুনের পোঁটলার সহিত যখন এই দুর্ভাগা পাখীগুলোর পা ধরিয়া ঝুলাইয়া লইয়া যায়, দেখিলে চক্ষে জল আইসে। মনে মনে ভাবি পিতামহ! ইহাদিগকে পাখী না করিয়া গাছের ফল করেন নাই কেন?

ব্রহ্মা। খায় কারা?

বরুণ। আজ্ঞে কলিকাতার প্রায় বারোআনা লোকে।

ব্রহ্মা। উঃ! মনুষ্য কি পাষণ্ড! যে পশু পক্ষী তাহারা নিজ হস্তে প্রতি-পালন করে; যে পশু পক্ষী তাহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া নেচে খেলে বেড়ায়; যে পশু পক্ষী অপর পশু পক্ষী হইতে ভয় পাইলে আত্ম রক্ষার জন্য প্রভুর নিকট ছুটিয়া আইসে, ইহারা এমনি নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর যে, সেই

পশু পক্ষীর অৰ্দ্ধ ছটাক মাংস আহার করিবার জন্য হত্যা করিতে কাতর হয় না।

নারা। পিতামহ! ইহাদের পাপের কি সাজা হইবে?

ব্রহ্মা। পর জন্মে এই মনুষ্যেরা কুঁকড়ো হইবে এবং কুঁকড়োরা মনুষ্য হইয়া উহাদিগকে জবাই করিয়া খাইবে।

পাণ্ডুয়া।

দেবগণ গেটে টিকিট দিয়া বাহিরে আসিয়া দেখেন, কতকগুলি ময়রার দোকান। দোকানের এক পার্শ্বে কাঁদি কাঁদি কলা টাঙ্গান এবং স্তূপাকার ডাব নারিকেল রহিয়াছে। অপর পার্শ্বে বাসি খাজা, বাসি জিলাপীর উপর মাচি ভ্যান ভ্যান করিতেছে। মদক ভায়া উনানে আগুন দিয়া উবু হইয়া বসিয়া ফুঁ পাড়িতেছে এবং এক এক বার দুই হস্তে দুই চক্ষের জল মুচিতেছে।

এই সময় কতকগুলো গোরুর গাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। গাড়িগুলির উপরে ছাপ্পর বাঁধা ও চারি দিক মোটা শতরঞ্চ দ্বারা আচ্ছাদিত; কোন খানির ভিতরে কচি ছেলে কাঁদিতেছে। কোন খানির ভিতর হইতে কর্তার স্বপাদুকা ঠ্যাং দেখা দিতেছে; গৃহিণী স্বামীর নিকটে শ্বশুর ও ননন্দার নিন্দা করিয়া কিরূপ কষ্টে দিন কাটাইয়াছেন মনের সাধে ব্যক্ত করিতেছেন। কোন খানি হইতে অল্পবয়স্কা বৌগুলি শতরঞ্চ অত্যন্ত উঁচু করিয়া স্থানটী দর্শন করিতেছেন।

দেবতারা এখান হইতে বাঁশ বনের ভিতর দিয়া পাণ্ডুয়ার মন্দিরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। এবং সকলে সবিস্ময়ে চাহিতে লাগিলেন। পিতামহ কহিলেন, বরুণ এত মুসলমান মন্দির দেখিলাম; কিন্তু এ মন্দিরটী হিন্দু মন্দিরের ন্যায় বোধ হইতেছে কেন?

বরুণ। আজ্ঞে, এই মন্দিরটী প্রায় পাঁচ শত বৎসরের অধিক দিনের হইবে। পাণ্ডুয়া পূর্ব্বে হিন্দু রাজার অধিকৃত ছিল। তাঁহার নাম পাণ্ডু। ঐ পাণ্ডু হইতে বর্ত্তমান পাণ্ডুয়া নাম হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ঐ রাজবংশের কোন কন্যা প্রত্যহ গঙ্গাদর্শন করিবার মানসে পিতাকে বলিয়া ইহা নির্ম্মাণ করিয়া লন। ইহা প্রায় ১২০ ফিট উচ্চ। ইহার উপর হইতে হুগলি পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দির সম্বন্ধে আবার কতকগুলি লোক বলে—মুসলমানেরা গোরু কাটা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তাহার স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ এই

মন্দিরটী নির্ম্মাণ করাইয়াছে। ফলতঃ এই মন্দিরটীর বিষয়ে অনেক ঐতিহাসিক বিবরণ আছে। যদ্যপি এখানে হিন্দুরাজাদিগের সময় কোন সুকবি বাস করিতেন, তাহা হইলে তিনি রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় পাণ্ডুয়ার গোযুদ্ধ লিখিয়া অমরত্ব লাভ করিতেন। এবং আমরাও ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিতাম।

ব্রহ্মা। গোযুদ্ধ কি ?

বরুণ। ১৩৪০ সালে এখানকার রাজসরকারে এক মুন্সী বাস করিতেন। রাজকার্য্য পারস্যভাষায় তরজমা করিয়া সম্রাটের নিকট পাঠাইবার জন্য ইনি মোগল সরকার হইতে নিযুক্ত হইয়া আইসেন। মুন্সী এক সময় নিজ পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে অতি গোপনে একটী গোরু কাটেন এবং পাছে কেহ দেখিতে পায়,এই আশঙ্কায় উহার হাড় ও পাঁজরাগুলো একস্থানে পুতিয়া রাখেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ সমস্ত হাড় মাংসলোভী শৃগালকর্ত্তৃক মৃত্তিকা হইতে বহিষ্কৃত হয়। তাহা দেখিয়া হিন্দুরা অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া উঠে এবং কে এই পাপ কার্য্য করিয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিতে থাকে। পরিশেষে তাহারা জানিতে পারে মুন্সী পুত্রের অন্নাশন উপলক্ষে এই গর্হিত কার্য্য করিয়াছে। তখন নগরস্থ যাবতীয় হিন্দু সশস্ত্রে দলে দলে রাজসন্নিধানে যাইয়া কহিল, মুন্সীর প্রাণদণ্ড করিতে আজ্ঞা হউক, অন্যথা তাহাকে আমাদিগের হস্তে অর্পণ করা হউক।" রাজা ইহাতে সম্মত না হওয়াতে বিদ্রোহী দল রাজপুত্রকে হত্যা করে। রাজা উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য মোগল সরকারে জানাইলেন; কিন্তু কোন ফল প্রাপ্ত হইলেন না; অগত্যা তাঁহাকে প্রজাদিগের সহিত যোগ দিতে হইল। মুন্সী গোলযোগ দেখিয়া ইতিপূর্ব্বে নগর হইতে পলায়ন করে এবং গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে পর্য্যটন করিয়া অসংখ্য মুসলমান সংগ্রহ করিয়া পাণ্ডুয়া নগর আক্রমণ করিল। ক্রমে গোরুকাটা যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে ক্রমান্বয়ে ৬০ জন রাজা ও অসংখ্য হিন্দুসেনা হতাহত হইলে মুসলমানেরাই জয়লাভ করিল এবং হিন্দুদিগকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া নিজেই বাস করিতে লাগিল। তদবধি পাণ্ডুয়া হিন্দুরাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া মুসলমানপ্রধান স্থান হইয়াছে।

নারা। মন্দিরমধ্যে এক্ষণে আছে কি ?

বরুণ। লোকে বলে—মন্দিরের চূড়ায় মুসলমান সাধু সা সফির ভ্রমণের

লৌহ নির্ম্মিত ছড়ি আছে। মুসলমান যাত্রীরা পৌষমাসে ঐ ছড়ি পূজা করিতে দলে দলে আসিয়া থাকে। সেই সময় এই উপলক্ষে বর্ষে বর্ষে এখানে একটী করিয়া মেলা হয়।

ইন্দ্র। মন্দিরের ওদিকে ওটা কি?

বরুণ। গোরুকাটা যুদ্ধে মুসলমানদিগের যিনি নেতা ছিলেন, তাঁহারই কবর। তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া কিছু দিন বিশ্রাম সুখভোগের পর এই স্থানেই মৃত্যু হওয়ায় ঐ কবরে বিশ্রাম করিতেছেন।

ব্রহ্মা। সম্মুখে এটা কি?

বরুণ। আজ্ঞে, ইহা একটী মসজিদ। ইহা প্রায় দুইশত ফিট লম্বা। এবং ইহাতে ৬০টী গম্বুজ আছে। এই মসজিদের প্লাট ফরমে খাসফি সর্ব্বদা উপবেশন করিতেন।

এখান হইতে দেবগণ পীরপুকুর দেখিতে চলিলেন। যেদিকে যান কেবল বাঁশ বন। এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন, একটী প্রাচীনা মুসলমান রমণী ছাগলকে বাঁশপাতা খাওয়াইতেছে। নিকটে দাঁড়াইয়া একটী বাবু কহিতেছে—"হাঁ গা চাচী, এখানে রাঁধা কুঁকড়োর মাংস বিক্রয় হয়?"

বৃদ্ধা কহিতেছে "আমিই মধ্যে মধ্যে বেচি, বেনেদের ছেলে পিলের ব্যামো হলে ঝোল কিনে নিয়ে যায়।"

বাবু। আমি ঝোল খাব না, রাঁধা মাংস খাব। লুচি দিয়ে খেতে সাধ হয়েছে।

বৃদ্ধা। ও মা! তুমি বল কি? তা হলে হিঁদুরা তোমায় ঘরে নেবে কেন?

বাবু। চাচী. ডুব দিয়ে জল খেলে শিবের বাবাও টের পান না।

ব্রহ্মা। শ্রীবিষ্ণু! একি! এদিকে এমন সভ্য সভ্য, কুঁকড়ো খায়? বরুণ, পেঁড়ো থেকে পালাই চল?

বরুণ দেবগণকে লইয়া পীরপুকুরের পাড়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং কহিলেন ইহারই নাম পীরপুকুর। পুষ্করিণীটী প্রায় পাঁচ শত বৎসরের হইবে। ইহা ৪০ ফিট গভীর। পুষ্করিণীর তীরে দেখুন একটী এমাম বাড়ী এবং গোযুদ্ধের মৃত সেনাপতিদিগের কবর রহিয়াছে। এখানে অনেক মুসলমান সাধুরও কবর আছে। এমাম বাড়ীটী ফতে খাঁ নামক এক ব্যক্তির নির্ম্মিত।

নারো। বরুণ! ঐ ফকির বসে কি করিতেছে?

বরুণ। উনি এই পীরপুকুরের রাজা। পুকুরের যাবতীয় জলজন্তু উঁহার আজ্ঞাকারী। এই জলে একটী কুম্ভীর আছে, উনি ডাকিলে তখনি আইসে।

উমা এই কথা শুনিয়া ছুটিয়া গিয়া কহিল "ওগো, একবার কুমীর ডাক না।"

ফকির কহিল "কিছু খাইতে না দিলে আসিবে কেন?" উমা তৎক্ষণাৎ একটা পয়সা দিল, ফকির "কতে খাঁ" "কতে খাঁ" শব্দে ডাকিতে লাগিল অমনি কুম্ভীরটা ডাঙ্গায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

বরুণ। পিতামহ! আমাদের যেমন গঙ্গাস্নানে মহাপুণ্য, মুসলমানদিগের তেমনি পীরপুকুরে স্নান করিলে মহাপুণ্য সঞ্চার হয়; এজন্য তিথি নক্ষত্র বিশেষে অনেক মুসলমান যাত্রী এখানে স্নান করিতে আইসে।

উমা। বরুণ কাকা! এস না আমরা পীরপুকুরে স্নান করি।

বরুণ। না না, ও বাসপাড়া পচা জলে স্নান করিলে মেলেরিয়া জ্বর হবে।

এই সময় দেবগণ দেখেন শান্তীর মা, ক্ষ্যামার মা, মোক্ষার মা, বাঁয়া মেয়েদের সঙ্গে করিয়া দেবদেশ হইতে সিন্নি ভাসাইতে আসিতেছেন। শান্তীর মা কহিতেছেন—"আহা! শ্যামার আমার ছেলে হবার জন্য কত কি করিলাম, কত কবচ ধারণ, হোম, পূজা করা হল, কিছুতেই কিছু হল না। মড় মাসী বল্লেন "মা, এত করচো কেন, পেঁড়োয় গিয়া সিন্নি ভাসিয়ে এস, যদি ভাগ্যে নিশ্চয় শ্যামার ছেলে হবে।" তাই শুনে ত এলাম এখন কপালে কি আছে পীরই জানেন।" ক্ষেমীর মা কহিলেন "আমরাও ঐ জন্যে এসেছি; এখন বাবা মাণিকপীর যদি আমার ক্ষেমার কোলে একটী রাঙ্গা খোকা দেন আবার এসে ভাল করে সিন্নি দেব। সকলে বল্লে—তারকেশ্বরের মহন্তের কি একটা ভাল ঔষধ আছে, সেই খানে নিয়ে যাও, নিশ্চয় ছেলে হবে। শুনে যাবার উদ্যোগ করচি এমন সময় জামাই এসে যেতে দিলেন না। বল্লেন—মহান্ত ঘানী টানতে গিয়ে সে চমৎকার ওষুধটা ভুলে এসেছে।"

উমা। কর্ত্তাজেঠা! আবার সেই ফোঁড়াটা টন টন করচে।

পিতামহ "ভয় নাই" "ভয় নাই" তারকনাথ তোকে ভাল করবেন" বলিয়া, চারিটি পয়সা উমার কপালে স্পর্শ করাইয়া গেঁটে রাখিলেন, এবং

সকলে স্ত্রীলোকদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া কিস্তি জামান পুকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন।

পুষ্করিণীর তীরে উপস্থিত হইয়া শ্যামার মা, কাসেমের মা, মেন্তার মা, উবু হইয়া "টপ" "টপ" শব্দে পীরকে প্রণাম করিলেন, এবং পোঁটলা হইতে কলার পাতে বাঁধা সিন্নি বাহির করিলেন। প্রথমে শ্যামার মা জলে সিন্নি দিলেন। দেবামাত্র একটা মৎস্য আসিয়া পাতাসুদ্ধ সিন্নি লইয়া জলে ডুব দিল। স্ত্রীলোকেরা সবিস্ময়ে কহিতে লাগিলেন, পীর ডুবিয়েছেন এখন ভরসা পাচি। তাহা হইলে বাছা আমার ছেলে কোলে পাবে। কিয়ৎক্ষণ পরে শুষ্ক পাতা ভাসিল এবং নিকটে আসিল না। তখন শ্যামার মা হতাশ হইয়া কান্নাকাটি আরম্ভ করিলেন। মেন্তার মা এবার সিন্নি ভাসাইলেন। তাহার সিন্নি ডুবিল। কিন্তু যে মৎস্যটা মুখে করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহার মুখ হইতে অপর একটা মৎস্য কাড়িয়া লইবার উদ্যোগ করাতে কতক পাতালী জলে পড়িল। আহার সিন্নিসহ মৎস্যটী পাতা মুখে করিয়া তীরের দিকে আসিল। মেন্তার মা অমনি "ঐ ভেসেছে!" "ঐ ভেসেছে!" বলিয়া, লাফাইয়া জলে পড়ায় মৎস্যটী সিন্নির পাতা ফেলিয়া পলাইল। মেন্তার মা সিন্নি হাতে পাইয়া সহর্ষে উলু দিতে দিতে তীরে উঠিলেন। কাসেমের মারও ঠিক ঐ দশা ঘটিল। তখন উভয়ে ঝাঁকাইয়া উলু দিতে লাগিলেন। শ্যামার মা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন "পোড়া কপালে পীরের আমি যে কি করেছি বলতে পারিনে। ঘাটে পড়া সকলের সিন্নি ফেরত দিলে কেবল আমার দিল না। গোসাঁই বাবা, গোসাঁই বাবা।"

দেবগণ এই সমস্ত দেখিয়া হাস্য করিতে করিতে নগরের উত্তর দিকে একটী বৃহদাকার পুষ্করিণীর তীরে উপস্থিত হইয়া সবিস্ময়ে চাহিতে লাগিলেন এবং পিতামহ কহিলেন "বরুণ! এ পুষ্করিণীটা কি?"

বরুণ। এই পুষ্করিণী প্রায় ১৩২ হাত বিস্তৃত। গঙ্গকাটা যুদ্ধের পূর্ব্বে পাণ্ডুয়ার হিন্দুদিগের মনে বিশ্বাস ছিল—যুদ্ধে কাহারও প্রাণত্যাগ হইলে ইহার পবিত্র জলে প্রাণ দান করিতে পারে। অতএব এই পবিত্র সরোবরটী পাণ্ডুয়ায় থাকিলে কেহ নগর আক্রমণ করিয়া জয় লাভ করিতে পারিবে না। কিন্তু গো যুদ্ধে যে সমস্ত সৈন্য হত হইয়াছিল প্রাণ পাইল না দেখিয়া জানা হইল— নিঃসন্দেহ মুসলমানেরা ইহার পবিত্র জলে গোমাংস নিক্ষেপ করিয়া অপবিত্র করিয়া দিয়াছে।

ব্রহ্মা। গোযুদ্ধ হয় কোথায়?

বরুণ। আজ্ঞে, ঠিক ষ্টেষণের সন্নিকটস্থ ময়দানে। রেলওয়ে রাস্তা ও ষ্টেষণ নির্ম্মাণ সময়ে বিস্তর কবর ভগ্ন হওয়াতে অনেক মড়ার মাথার খুলি ও হাড় পাঁজর বাহির হইয়াছিল।

দেবগণ আবার এক দৃষ্টিতে পবিত্র পুষ্করিণীটী চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখেন উহার পাড় প্রকাণ্ড উচ্চ। কোন পাড়ে একটী ভাঙ্গা ঘাট পতিত থাকিয়া ইহার পূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সাক্ষ্য দিতেছে। কোন পাড়ে বহুকালের একটী সামান্য গৃহ বর্ত্তমান রহিয়াছে। জলে অসংখ্য পদ্মফুল, লাল ফুল ও মধ্যে মধ্যে পানীফলের বৃক্ষসকল বিরাজ করিতেছে। জলের ধারে কর্দ্দমের উপর দিয়া বকেরা নিঃশব্দে পদ নিক্ষেপ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য ও কীট পতঙ্গ যাহা সম্মুখে পাইতেছে ধরিয়া ধরিয়া খাইতেছে। তীরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষের উপর মাছরাঙ্গা, শিকড়েও অন্যান্য মৎস্য-গ্রাসোপজীবী পক্ষিসকল বসিয়া এক দৃষ্টিতে জলের প্রতি চাহিতেছে এবং সময়ে সময়ে নক্ষত্রবেগে উড়িয়া আসিয়া জলে ডুব দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য গ্রাস করিয়া লইয়া গিয়া আহার করিতেছে। তীরে অসংখ্য গরু চরিতেছে। মুসলমান রাখালেরা বৃক্ষতলে বসিয়া বংশী ভাজে এবং [illegible] স্বরে গান ধরিতেছে।

কাটা পীর কি ক্যারে ফেলালে আজ মোরে।
ও মুই পোকুর পাড়ে হারয়ে এলাম মামুরে॥
কেস্তে টোকা দিয়ে মোর হাতে, কোথাকি আর পাচুনি দিয়ে,
মামু ঢুকলো কোন পথে; ও মুই ঠেউরে কিছু টাঁব পেলুম না,
মামু ডুবলো বুঝি পোকুরে॥

দেবগণ গান শুনিতে শুনিতে এক স্থানে উপস্থিত হইলে ইন্দ্র কহিলেন "এ জায়গায় কি পূর্ব্বে নদী ছিল? সম্মুখে শুষ্ক নদীর মত কি দেখা যাইতেছে?"

বরুণ। ১২৬০ সালে পাণ্ডুয়া যখন রাজকীয় স্থান ছিল, তখন নগরের চতুর্দ্দিকে প্রায় পাঁচ মাইল বিস্তৃত অত্যুচ্চ প্রাচীর এবং প্রাচীরের সংলগ্ন সুগভীর পরিখা ছিল। সেই পরিখার বর্ত্তমান চিহ্ন দেখিয়াই তুমি নদী ভাবিতেছ।

উপ। বরুণ কাকা! দেখা যাচ্ছে ওটা কি?

বরুণ। দেবরাজ সম্মুখে একটী বৃহদাকার কবর দেখ। ঐ কবরেতে অনেকগুলি মুসলমান চির নিদ্রা সুখ অনুভব করিতেছেন।

পারকে দিবার জন্য কয়েকখানি রেশার খরিদ করিয়া লইয়া যাইতে নারদ দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছে, সেই জন্যই যাওয়া।

ব্রহ্মা। যম! তুমি গ্রাম ও নগরগুলি ধ্বংস করে কি ভাল কাজ করিতেছ? অকালে সব জীব হত্যা করাই কি তোমার উচিত হইতেছে?

যম। আজ্ঞে, আমি স্ব ইচ্ছায় জীবহত্যা করিতেছি না। তাহাদের দুঃখ দেখিয়া দুঃখ দূর করিতেই অগ্রসর হইয়াছি। আমি দেখিতে পাই উহারা আর পেটপুরে দুগ্ধ পান করিতে পায় না, দুই সন্ধ্যা তৃপ্তির সহিত অন্ন আহার করিতে পায় না, ওরা আর ভাল বস্ত্রাদি পরিধান করিতে পায় না, উহাদের হাতে পয়সা নাই অথচ দেশলাই কাঠিটী পর্য্যন্ত কিনে সংসার খরচ করিতে হয়। সেই সমস্ত কষ্ট দূর করিবার জন্য চালান দিতেছি। যাহারা আমার আলয়ে যাইবার জন্য হস্ত তুলিয়া ডাকিতেছে, যাহারা আমার নিকট যাইবার ইচ্ছায় জ্বর হইবামাত্র বিলাতী ঔষধ খাইয়া পেটে প্লীহা ও যকৃৎ করিতেছে, যাহারা সমস্ত দিন কোন পরিশ্রম না করিয়া আমি কখন ডাকিব কেবল এই ভাবে, তাহাদিগকেই আমি গ্রহণ করি। ঠাকুর দা! যে দুঃখ ভোগ করিতেছে, তাহার দুঃখ যদি না দূর করি, যে শোকে তাপে কাঁদে তাহার কান্না যদি না থামাই, যে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর, তাহার খাওয়া পরা যদি না মিটাই, আমার যে ধর্ম্ম নামে অধর্ম্ম হবে?

নারদ। নেড়ারাও কি তোমার ওখানে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে?

যম। না ভাই! আমার অনেক দিন পর্য্যন্ত ইচ্ছা আছে মুসলমান পীরকে এক রাত্রি অন্ধকারে রাখ্‌বো।

ভোঁ শব্দে ট্রেণ ছাড়িল এবং কিছু দূর যাইলে বিপরীত দিক হইতে আর এক খানি ট্রেণ আসিয়া এই ট্রেণের পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া উভয় ট্রেণ চক্রবেগে সাঁং সাঁং শব্দে বিদ্যুতের ন্যায় অদৃশ্য হইয়া হুশ্‌ হাশ্‌ শব্দে আবার ছুটিতে লাগিল।

ব্রহ্মা। ঐ গাড়িখানা এ খানার কাছে এলে আমার বড় ভয় হইয়াছিল।

এই সময় আকাশে সোঁ সোঁ শব্দে মেঘ আসিয়া দেখা দিল। "হুড় মুড়" শব্দে মেঘ গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং চতুর্দ্দিক অন্ধকার করিয়া "ঝুপ ঝাপ" শব্দে মূষল ধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ট্রেণও জলে ভিজিতে ভি[illegible]তে থাকুন ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইল। ষ্টেশনটী দেখিতে কোন [illegible] যেন

একটী শিবমন্দির। কিন্তু রেলওয়ের প্রশাসনে তাহার মধ্যে যাহা চাওয়া যায় তাহাই প্রাপ্ত হইবে। বৃক্ষের এক পার্শ্বে টেলিগ্রাফ চলিতেছে। এক প্রান্তে টিকিট বিক্রয় হইতেছে এবং একজন চাপরাশীও "অম্রন" বলেন, বলিয়া চীৎকার করিতে ছাড়িতেছে না। ট্রেন থামিবামাত্র ষ্টেশনমাষ্টার ভিতরে মোরগের মত গৃহ হইতে বাহির হইয়া ভিজিতে ভিজিতে গার্ডের নিকট ছুটিয়া গেলেন।

ব্রহ্মা। বরুণ! বড় চমৎকার বন্দোবস্ত করেছে, ঝড় বৃষ্টি কিছুতেই থেমে থাকে না। যাহা হউক, যত পথ এলাম প্রত্যেক ষ্টেশনেই কি রাত্রি, কি দিন, কি সন্ধ্যা, কি প্রাতঃকাল, কি ঝড়, কি বৃষ্টি, সকল সময়েই দেখিলাম টুপিতে ইংরাজি লেখা এক এক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া ঘণ্টা মার না দিলে গাড়ি চলিতেছে না। ভাল বরুণ! উঁহারা কে? আমি দেখিতেছি উঁহাদের মত দুর্ভাগা জীব জগতে আর নাই। অতএব কি পাপে উঁহারা এরূপ কষ্ট ভোগ করিতেছে আমাকে বিশেষ করিয়া বল।

বরুণ। পিতামহের স্মরণ থাকিতে পারে—এক সময় ভগবান অনন্তদেব বামনরূপে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিরাজাকে সত্যে বদ্ধ করিয়া একটী পণ্ডিত এবং একশত আটটী মূর্খের সৃষ্টি করিলেন এবং রাজাকে কহিলেন "রাজন্! যদ্যপি স্বর্গ প্রার্থনা কর এই এক শত আট মূর্খকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পার; আর যদ্যপি পাতাল প্রার্থনা কর এই পণ্ডিতটীকে সঙ্গে লইতে পার। বলি তৎশ্রবণে কহিলেন "ভগবন্" এক আধটা মূর্খ হইলেও আমি সঙ্গে লইয়া স্বর্গে যাইতাম না, অতএব একশত আট মূর্খের সহিত আমি কি প্রকারে স্বর্গ বাস করিব? আপনি আমাকে ঐ পণ্ডিতটী প্রদান করুন, পাতালেই প্রবেশ করি।" বামন তৎশ্রবণে পণ্ডিতটী প্রদান করিলে রাজা পাতালে প্রবেশ করিলেন। বলি পাতাল প্রবেশ করিলে ঐ একশত আট মূর্খ কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "প্রভো!" আমাদিগকে সৃষ্টি করিলেন, এক্ষণে আমরা কি কাজ করিব আজ্ঞা করুন? তৎশ্রবণে নারায়ণ কহিলেন "কলির মধ্য সময়ে যখন ইংরেজরাজ ভাগীরথীর চতুঃসীমা বন্ধন করিয়া রেলওয়ে ট্রেণ চালাইবেন, সেই সময় তোমরা নানা অংশে বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক ষ্টেশনে ষ্টেশন মাষ্টাররূপে বিরাজ করিবে।

আবার ট্রেণ হুপাহুপ শব্দে ছুটিতে লাগিল এবং অনতিবিলম্বে মগরা ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখনও বৃষ্টি না থামাতে দেবতারা একটী

তোমাকে কত ডাকাডি, কত কাঁদাকাটি কেন দেখা দিচ্ছ না। মা! একটীবার মা, একটীবার দেখা দেও, চক্ষে দেখে চক্ষু সার্থক করি। জননি! যে ব্যক্তি তোমাকে কি প্রাতে কি সন্ধ্যায় "গঙ্গা" এর কয়টী অক্ষর একত্র করে ডাকে, তাহার সমস্ত পাপ মুক্ত হয়। তোমাকে কি আর কেহ ভক্তিভাবে ডাকে না? তাই অভিমানে ঘাট পরিত্যাগ করিয়া দূরে এসেছ? দেবি! তুমি সর্ব্বলোকের জননীস্বরূপ। যে তোমাকে নিকটে পাইয়া আনাগোনা না করে, তাহার মুখ দেখিলে পাপ হয়। মা! পাপীর মুখ দেখে আমার কি পাপ হওয়াতে তুমি আমাকে দেখা দিতেছ না? যদি পাপ হইয়া থাকে, তোমার জলে অবগাহন করিলে সকল পাপ মুক্ত হবে। আমি আজ তোমার জলে অবগাহন করিয়া সকল পাপ বিসর্জ্জন দিতেছি, একটী বার দেখা দেও! আহা! আমার মাতৃকেরা কি নির্ব্বোধ! নচেৎ মর্ত্ত্যে এমন স্বর্গের দ্বার থাকিতে নরকে যাইবে কেন? তারা জানে না যে, ভক্তিভাবে গঙ্গাজল স্পর্শ করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপে মুক্ত হওয়া যায়। তারা জানে না যে গঙ্গাস্নানে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। তারা জানে না যে মৃত্যুকালে সর্ষপ পরিমাণে গঙ্গাজল স্পর্শ করাইলে পরম পদ লাভ হইয়া থাকে। মা! আমায় দেখা দেও মা! আমি যে তোমার জন্য তোমায় দেখিবার জন্য সংসার ধর্ম্ম ফেলে ভিক্ষুকের ন্যায় মর্ত্ত্যে এসেছি।

বরুণ। আপনি কি সত্য সত্যই উন্মত্ত হলেন?

ব্রহ্মা। কি করতে বল?

বরুণ। আর ২।১ দিন স্থির হয়ে থাকুন, কলিকাতায় যাইয়া দেখা করায়ে দেব।

দেবগণ স্নান করিয়া পুনরায় বাঁধা ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলে ইন্দ্র কহিলেন "এ সব ঘাট কাহার কৃত?"

বরুণ। এই চাঁদনী সংযুক্ত ঘাটটী ত্রিবেণীর হরিমোহন মজুমদার নামক এক ব্যক্তির। ওদিকের ঐ চাঁদনীবিহীন ঘাটটী মুকুন্দ দেবের কৃত।

ইন্দ্র। মুকুন্দ দেব কে?

বরুণ। ইনি উড়িষ্যার শেষ হিন্দু রাজা। ১৫৫০ সালে ইনি উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার হিন্দু দেব দেবীর উপর বিশেষ ভক্তি থাকাতে ত্রিবেণীতে একটী বাঁধা ঘাট ও একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। উড়েরা এই মুকুন্দ দেবের নাম উল্লেখ করিয়া অদ্যাপি মড়ো মড়ো

বলিয়া থাকে—আমাদের রাজ্য এক সময় বাঙ্গালা দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

নারা। মুকুন্দ দেব কৃত বহুকালের ঘাটটী অদ্যাপি এমন আছে?

বরুণ। না ভাই! মধ্যে ভাতাড়ার ছকুলাল সিংহ নামক এক জমিদার উহার মেরামত করিয়া দিয়াছেন। বেহুলা সতী চম্পাই নগর হইতে কদলী-ভেলায় মৃত পতিসহ ভাসিতে ভাসিতে এই ত্রিবেণীতে আসেন এবং নেতো ধোপানীর গৃহে আশ্রয় লন।

নারা। ত্রিবেণীতে অনেক ভদ্র লোক থাকিতে বেহুলা ধোপার বাড়িতে আশ্রয় লন কেন?

বরুণ। বেহুলা ভেলার উপর বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দেখিলেন—ধোপানী যখন কাপড় কাচে, তাহার পঞ্চমবর্ষীয় পুত্র অত্যন্ত বিরক্ত করিতেছিল। তাহা অসহ্য হওয়ায় তাহাকে এক চপেটাঘাতে হত্যা করিয়া এক স্থানে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া শয়ন করাইয়া রাখে এবং কাপড় কাচা শেষ হইলে আবার জীবন দান দিয়া ক্রোড়ে লইয়া বাটী যায়। বেহুলা এই অমানুষিক ক্ষমতা দেখিয়া উহার গৃহে আশ্রয় লইলে উপকার হইবার সম্ভাবনা ভাবিয়াই আশ্রয় লন। ঐ মুকুন্দ দেবের ঘাটের কিঞ্চিৎ উত্তরে অর্থাৎ ত্রিবেণী ও বান্দাপড়া নামক স্থানের মধ্যে এক খানি প্রস্তরকে লোকে নেতো ধোপানীর পাট কহে।

এই সময় দেবগণ শুনিলেন—অতি ক্ষীণ কণ্ঠে একটী স্ত্রীলোক বলিতেছে—"ওরে, দই খাব না, আর দিস্ নে, বড় দাঁত টকে গেছে।" চেয়ে দেখেন একটী গৃহে একটী বৃদ্ধাকে গঙ্গাযাত্রার জন্য আনিয়াছে। লোচীরাম কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট। কথা কহিবার ক্ষমতা নাই। অতি কষ্টে ২।১টী কথা বাহির হইতেছে। শীতকাল কিন্তু তাহাকে অতি প্রত্যুষে তৈল গরিয়া মাখাইয়া স্নান করান হইয়াছে। ডাবের জল, দধি, মর্ত্তমান রম্ভা এবং চিনির জল ঘন ঘন খাওয়ান হইতেছে। রোগীর টক দৈ খেয়ে খেয়ে দাঁত টাকরা শাওয়াতে কহিতেছে—ওরে আর দই দিস নে, বড় দাঁত টকে গিয়েছে। "খাবে বই কি" বলিয়া তথাপি তাহার মুখে দধি প্রদান করা হইতেছে।

বরুণ। বরুণ! ওরা রোগীটিকে নিয়ে কি করচে?

বরুণ। আজ্ঞে, পাট করচে।

ব্রহ্মা। পাট করা কি?

বরুণ। এই ত্রিবেণীতে অনেক দূর দেশ হইতে মড়া আসিয়া থাকে। তন্মধ্যে অনেকগুলি বাসি মড়া এবং অনেকগুলি তাজা মড়া। তাজা গুলির মধ্যে সময়ে সময়ে এমন হয় যে ২।১ টা আরোগ্য হইয়া উঠে। কিন্তু ভাল হইলে কষ্ট করিয়া আনা বিফল হইল। তদ্ভিন্ন বঙ্গবাসিদিগের মনে বিশ্বাস আছে—গঙ্গা যাত্রার মড়া বাড়ীতে ফিরিলে বিশেষ অমঙ্গল হইয়া থাকে। অতএব এই যাত্রায় যমালয়ে পাঠান উচিত। এজন্য দধি, কলা, ডাবের জল ইত্যাদি খাওয়াইয়া শীঘ্র শীঘ্র চালান দিবার চেষ্টা করে, তাহাকেই পাট করা কহে।

ব্রহ্মা। উঃ! কি নিষ্ঠুর! কি পাষণ্ড! যখন মৃত্যুকালে রোগীর মস্তকে বিন্দুমাত্র জল স্পর্শ করাইলে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হয়, তখন তাড়াতাড়ি গঙ্গাযাত্রা করাইবার আবশ্যকতা কি? দেবগণ এখান হইতে বাজারে প্রবেশ করিয়া দেখেন লোকে লোকারণ্য। দূরে—"ঝাঁ কুড়্ কুড়্, কুড়্ কুড়্ ঝাঁ" শব্দে নহবৎ বাজিতেছে। পিতামহ কহিলেন "বরুণ! এখানে কি হইতেছে?"

বরুণ। আজ্ঞে ব্রহ্মাপূজা হইতেছে।

পিতামহ হাস্য করিয়া কহিলেন "আমার উপর লোকের কে এত ভক্তি?"

বরুণ। আজ্ঞে, আপনি অগ্নির দেবতা। আপনি অসন্তুষ্ট হইলে পাছে দোকান ঘরে আগুন লাগিয়া সর্ব্বস্ব পুড়ে যায়, এজন্য আপনাকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত অনেক গঞ্জ এবং বাজারে বর্ষে বর্ষে আপনার মূর্ত্তি পূজা হইয়া থাকে।

দেবগণ পূজাস্থানে যাইয়া দেখেন, একখানি চালাঘরে দেবমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। চালার সম্মুখে এক প্রকাণ্ড আটচালা। আটচালাখানি ঝাড়, লণ্ঠন, দেয়ালগিরি ও আয়নায় সুশোভিত। মৃত্তিকার সিংহাসনের উপর হংসোপরি ব্রহ্মা চারিমুখে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার এক পার্শ্বে নারায়ণ অপর পার্শ্বে মহাদেব বসিয়া আছেন। চালে ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি অনেক প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। প্রতিমূর্ত্তি তিনটিকে এবং চালখানিকে অনেক টাকার রাং দিয়া সুসজ্জিত করা হইয়াছে। দেবগণ তাকাইয়া ঠাকুর দেখিতে লাগিলেন। নারায়ণ কহিলেন "ঠাকুর দুই

যম। ভায়া চিঠি লিখেছে—এখানে থাকিতে পারবে না। আগে লোক পাঠায়ে বলে দিইচি যে বল পায় যেন নিচে আসে।

দেবগণ এখান হইতে যাইয়া একটী দোকানঘরে বাসা করিলেন। বরুণ রন্ধন চাপাইলে পিতামহ কহিলেন "বরুণ! আজ কাল মর্ত্ত্যের সর্ব্বত্রই কি এইরূপ পূজার বরাদ্দ?

বরুণ। আজ্ঞে, প্রায় এইরূপ। তবে স্থল বিশেষে ২।৩ খানি নৈবেদ্য এবং এক খানি কুচা নৈবেদ্য ও ২।১ জোড় দিয়াও পূজা করিয়া থাকে।

ইন্দ্র। কুচা নৈবেদ্য কি?

বরুণ। একখানি পাত্রে অর্দ্ধ পোয়া আন্দাজ চাউল ৫২ ভাগে বিভক্ত করিয়া, তাহাতে আধখানি কলা ও একখানি বাতাসা ৫২ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া দেয়। উহাকেই কুচা নৈবেদ্য কহে। ঐ নৈবেদ্য চাদে কথিত ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ প্রভৃতিকে খাইবার জন্য দেওয়া হয়।

ইন্দ্র। আমরা কি পেট ধুয়ে বসে আছি? এই মর্ত্ত্যে এসে হাত পুড়য়ে রেঁধে খাচ্ছি তত্রাপি কি কোন দিন কাহারও বারস্থ হইছি?

নারা। বরুণ! পূজার ২।১টা জোড় দেয় বল্লে। জোড় কি?

বরুণ। যে মূর্ত্তির পূজা করা হয়, তাঁহার পরিধান জন্য এক জোড়া বস্ত্র দেয়। ঐ বস্ত্র জোড়টী লম্বায় এক হাত, বহরে আধ হাত। মধ্যে ছিন্ন দিয়া দুই খানার চিহ্ন দেখান হইয়াছে বলিয়া জোড় কহে। এ জোড় শিবের ভাগ্যেই বেশী পড়ে।

নারা। তাহে উনি বাবা ভোলা লোক, উলঙ্গ হইয়াই থাকেন, পরিবেন না। লোকে দেখছি আজকাল দেব দেবীর পূজা করে কেবল দগ্ধ করিবার জন্য!!

উপ। কর্ত্তা জেঠা! আশীর্ব্বাদ কর—যে অমন পূজা করবে, সে যেন নির্ব্বংশ হয়।

মনুসংহিতা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অপ্রযত্নঃ সুখার্থেষু ব্রহ্মচারী ধরাশয়ঃ।
শরণেষ্বমমশ্চৈব বৃক্ষমূলনিকেতনঃ॥ ২৬॥

সুখসাধন সামগ্রী সুস্বাদু ফল মূলাদি ভক্ষণে যত্নশূন্য, স্ত্রীত্যাগী, ধরাতল শায়ী, গৃহে মমতাশূন্য বৃক্ষমূলবাসী হইবে।

তাপসেষ্বেব বিপ্রেষু যাত্রিকং ভৈক্ষমাহরেৎ।
গৃহমেধিষু চান্যেষু দ্বিজেষু বনবাসিষু ॥ ২৭ ॥

বানপ্রস্থ ব্রাহ্মণের নিকট হইতে প্রাণ-ধারণ-মাত্রোচিত ভিক্ষা আহরণ করিবে। যদি তাহাদিগকে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে বনবাসী অন্য গৃহস্থ ব্রাহ্মণের নিকটেও ভিক্ষা করিবে।

গ্রামাদাহৃত্য বাশ্নীয়াদষ্টৌ গ্রাসান্ বনে বসন্।
প্রতিগৃহ্য পুটেনৈব পাণিনা শকলেন বা ॥ ২৮ ॥

যদি বানপ্রস্থাদির নিকট হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ না হয়, তাহা হইলে গ্রাম হইতে অন্ন আহরণ করিয়া পত্রপুট হস্ত বা শরাবাদিখণ্ড দ্বারা আট গ্রাস ভোজন করিবে।

এতাশ্চান্যাশ্চ সেবেত দীক্ষা বিপ্রো বনে বসন্।
বিবিধাশ্চৌপনিষদীরাত্মসংসিদ্ধয়ে শ্রুতীঃ ॥ ২৯ ॥

বানপ্রস্থ এই সকল নিয়ম ও বানপ্রস্থশাস্ত্রোক্ত নিয়ম অভ্যাস করিবে। আর নিজের ব্রহ্মত্ব লাভের নিমিত্ত ব্রহ্মপ্রতিপাদক যে সকল শ্রুতি আছে, তাহাও অভ্যাস করিবে।

ঋষিভির্ব্রাহ্মণৈশ্চৈব গৃহস্থৈরেব সেবিতাঃ।
বিদ্যাতপোবিবৃদ্ধ্যর্থং শরীরস্য চ শুদ্ধয়ে ॥ ৩০ ॥

যে হেতু ঋষিগণ, ব্রহ্মদর্শী পরিব্রাজক ও গৃহস্থগণ ব্রহ্মজ্ঞান ও ধর্ম বৃদ্ধি এবং শরীর শুদ্ধির নিমিত্ত ঐ সকল শ্রুতির সেবা করিয়াছেন। অতএব বানপ্রস্থ ঐ সকল শ্রুতি অভ্যাস করিবেন।

অপরাজিতাং বাস্থায় ব্রজেদ্দিশমজিহ্মগঃ।
আ নিপাতাচ্ছরীরস্য যুক্তোবার্য্যনিলাশনঃ ॥ ৩১ ॥

অচিকিৎসনীয় পীড়াদি জন্মিলে সরলগতি যোগনিষ্ঠ জল-বায়ু-ভোজী হইয়া যাবৎ শরীর পাত না হয়, তাবৎ উত্তর দিকে গমন করিবে, অর্থাৎ মহাপ্রস্থান গমন করিয়া দেহ ত্যাগ করিবে।

আসাং মহর্ষিচর্য্যাণাং ত্যক্ত্বান্যতময়া তনুং।
বীতশোকভয়োবিপ্রোব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৩২ ॥

উপরে যে সকল অনুষ্ঠানের কথা বলা হইল, তাহার অন্যতম অনুষ্ঠান দ্বারা

ব্রাহ্মণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া শোক ও ভয় শূন্য হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে।

এক্ষণে পরিব্রজ্যার বিষয় বলা হইতেছে।

বনেষু তু বিহৃত্যৈবং তৃতীয়ম্ভাগমায়ুষঃ।
চতুর্থমায়ুষোভাগন্ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ পরিব্রজেৎ ॥ ৩৩ ॥

তৃতীয় আয়ুর ভাগ এইরূপে বনে বিহার করিয়া সর্ব্বপ্রকার বিষয় সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্থ আয়ুর্ভাগ পরিব্রাজক-আশ্রম আশ্রয় করিবে।

পরিব্রজ্যাশ্রমে যে সমস্ত অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা ক্রমে বর্ণিত হইতেছে।

আশ্রমাদাশ্রমঙ্গত্বা হুতহোমোজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ভিক্ষাবলিপরিশ্রান্তঃ প্রব্রজন্ প্রেত্য বর্দ্ধতে ॥ ৩৪ ॥

আশ্রম হইতে আশ্রমান্তরে গমন করিয়া অর্থাৎ প্রথম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, তাহার পর গৃহস্থাশ্রম, তাহার পর বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক বানপ্রস্থাশ্রমের কর্ত্তব্য হোমাদি কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া জিতেন্দ্রিয় ও ভিক্ষাদানাদি দ্বারা শ্রান্ত হইয়া পরিব্রজ্যাশ্রম আশ্রয় পূর্ব্বক মুক্তি লাভ করিবে।

ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনোমোক্ষে নিবেশয়েৎ।
অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানোব্রজত্যধঃ ॥ ৩৫ ॥

তিন ঋণের সংশোধন করিয়া মোক্ষের অন্তরঙ্গভূত পরিব্রজ্যাশ্রমে মন নিবেশিত করিবে। ঐ তিনটী ঋণ সংশোধন না করিয়া যে ব্যক্তি পরিব্রজ্যাশ্রম করে, তাহার নরক গমন হয়। তিনটী ঋণ কি পর শ্লোকে তাহা বলা হইতেছে।

অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্ম্মতঃ।
ইষ্ট্বা চ শক্তিতোযজ্ঞৈর্ম্মনোমোক্ষে নিবেশয়েৎ ॥ ৩৬ ॥

ব্রাহ্মণ জন্ম গ্রহণ করিয়া দেব ঋণ, পিতৃ ঋণ ও ঋষি ঋণ এই তিন ঋণে ঋণবান্ হয়। যজ্ঞ করিলে দেবঋণ, পুত্রোৎপাদন করিলে পিতৃ ঋণ এবং বেদাধ্যয়ন করিলে ঋষি ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, মনু সেই কথা কহিতেছেন। যথাশাস্ত্র বেদ অধ্যয়ন করিয়া ধর্ম্মানুসারে পুত্র উৎপাদন করিয়া যথাশক্তি যাগ করিয়া তাহার পর মোক্ষের অন্তরঙ্গভূত প্রব্রজ্যাশ্রমে মন নিবেশিত করিবে।

অনধীত্য দ্বিজোবেদাননুৎপাদ্য তথা সুতান্।

অনিষ্ট্বা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ॥ ৩৭॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইহারা বেদ অধ্যয়ন না করিয়া পুত্র উৎপাদন না করিয়া, এবং যজ্ঞ না করিয়া প্রব্রজ্যাশ্রম করিলে নরকগামী হয়।

প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিং সর্ব্ববেদসদক্ষিণাং।
আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেৎ গৃহাৎ॥ ৩৮॥

যজুর্ব্বেদীয় উপাখ্যানগ্রন্থোক্ত সর্ব্বস্বদক্ষিণ প্রজাপতিদেবতার যজ্ঞ করিয়া তদ্যাদিরূপ আত্মাতে অগ্নির আরোপণপূর্ব্বক বানপ্রস্থ আশ্রম হইতে পরিব্রজ্যাশ্রম করিবে। এস্থলে একটী শ্রুতি আছে, তাহার অর্থ এই—ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া গৃহস্থাশ্রমী হইবে। গৃহস্থাশ্রমের পর বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে। বানপ্রস্থের পর প্রব্রজ্যাশ্রম করিবে অথবা এরূপ হইতে পারে ব্রহ্মচর্য্য হইতে একেবারে প্রব্রজ্যাশ্রম করিবে। অথবা গৃহস্থাশ্রম হইতে অথবা বানপ্রস্থাশ্রম হইতে প্রব্রজ্যাশ্রম করিবে। টীকাকার বলেন গৃহস্থ এই পদ প্রয়োগ করাতে মনুরও উহা অভিপ্রেত।

যো দত্ত্বা সর্ব্বভূতেভ্যঃ প্রব্রজত্যভয়ং গৃহাৎ।
তস্য তেজোময়ালোকা ভবন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ॥ ৩৯॥

যে ব্যক্তি স্থাবর ও জঙ্গম সকলের প্রতি অভয় দান করিয়া গৃহ হইতে প্রব্রজ্যাশ্রম করে, ব্রহ্মনিষ্ঠ সেই ব্যক্তি তেজোময় লোক প্রাপ্ত হয়।

যস্মাদণ্বপি ভূতানাং দ্বিজান্নোৎপদ্যতে ভয়ং।
তস্য দেহাদ্বিমুক্তস্য ভয়ন্নাস্তি কুতশ্চন॥ ৪০॥

যে ব্যক্তি হইতে কাহারও অণুমাত্র ভয় না জন্মে, বর্ত্তমান দেহ ত্যাগ হইলে তাহার কাহার হইতে ভয় হয় না।

আগারাদভিনিষ্ক্রান্তঃ পবিত্রোপচিতোমুনিঃ।
সমুপোঢ়েষু কামেষু নিরপেক্ষঃ পরিব্রজেৎ॥ ৪১॥

গৃহ হইতে নির্গত হইয়া দণ্ড কমণ্ডলু প্রভৃতি ধারণ ও মৌনব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক প্রব্রজ্যাশ্রম করিবে। কেহ সুস্বাদু অন্ন পানাদি সম্মুখে উপস্থিত করিলেও তাহাতে নিস্পৃহ হইবে।

একএব চরেন্নিত্যং সিদ্ধ্যর্থমসহায়বান্।
সিদ্ধিমেকস্য সম্পশ্যন্ন জহাতি ন হীয়তে॥ ৪২॥

সর্ব্ব দুঃখ পরিত্যাগপূর্ব্বকারীর মোক্ষ লাভ হয় জানিয়া বানপ্রস্থ-ধর্ম্মাবলম্বী সর্ব্বদা একাকী সঞ্চরণ করিবে। সঙ্গ-বিবর্জ্জিত হইলে কাহারও বিরহে দুঃখ অনুভব করিতে হয় না, কাহাকেও নিজের বিরহজনিত ক্লেশ ভোগ করাইতে হয় না। অতএব সর্ব্বদা নির্দ্বন্দ্ব ও নিঃসঙ্গ হইয়া সুখে মুক্তি লাভ করিবে।

অনগ্নিরনিকেতঃ স্যাৎ গ্রামমন্নার্থমাশ্রয়েৎ।
উপেক্ষকোঽসংকুসুকো মুনির্ভাবসমাহিতঃ ॥ ৪৩ ॥

বানপ্রস্থ অগ্নি ও গৃহশূন্য, পীড়াদিতে উপেক্ষাকারী, স্থিরবুদ্ধি ও ব্রহ্মে সমাহিতমতি হইয়া দিবা রাত্রি অরণ্যে বাস করিবে। কেবল ভিক্ষার্থ গ্রামে প্রবেশ করিবে।

কপালং বৃক্ষমূলানি কুচেলমসহায়তা।
সমতা চৈব সর্বস্মিন্নেতন্মুক্তস্য লক্ষণম্ ॥ ৪৪ ॥

মৃন্ময় কর্পরাদি (খোলা খাপরা) ভিক্ষাপাত্র, বৃক্ষমূল বাসস্থান, কৌপীন কন্থাদি পরিচ্ছদ, শত্রু মিত্রে সমজ্ঞান এই গুলি জীবন্মুক্তের লক্ষণ।

নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্।
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দেশং ভৃতকো যথা ॥ ৪৫ ॥

মরণ কামনা করিবে না, জীবনও কামনা করিবে না। ভৃত্য যেমন গৃহীত বেতন কাল পরিশোধের প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ অকর্ম্মাধীন মরণকাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে।

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতাং বদেদ্বাচং মনঃপূতং সমাচরেৎ ॥ ৪৬ ॥

কেশ ও অস্থি প্রভৃতির পরিহারার্থে অগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার পর পাদক্ষেপ করিবে। ক্ষুদ্র কীটাদির প্রাণবধ নিবারণার্থ বস্ত্র দ্বারা শোধিত করিয়া জলপান করিবে। সত্যবাক্য বলিবে এবং মনঃপূত আচরণ করিবে।

অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।
ন চেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্বীত কেনচিৎ ॥ ৪৭ ॥

কেহ যদি কোন কটু কথা বলে তাহা সহ্য করিবে, কাহারও অবমাননা করিবে না এবং এই ব্যাধিমন্দির ক্ষণভঙ্গুর দেহ আশ্রয় করিয়া কাহারও সহিত শত্রুতা করিবে না।

ক্রুধ্যন্তং ন প্রতিক্রুধ্যেদাক্রুষ্টঃ কুশলং বদেৎ।

সপ্তদ্বারাবকীর্ণাঞ্চ ন বাচমনৃতাং বদেৎ ॥ ৪৮ ॥

কেহ যদি ক্রুদ্ধ হইয়া কোন কথা বলে, তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর করিবে না, কেহ যদি নিন্দা করে, তাহার নিন্দা করিবে না। ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য ভিন্ন বৃথা বাক্য উচ্চারণ করিবে না।

অধ্যাত্মরতিরাসীনো নিরপেক্ষো নিরামিষঃ।

আত্মনৈব সহায়েন সুখার্থী বিচরেদিহ ॥ ৪৯ ॥

ব্রহ্মধ্যানে রত, স্বস্তিকাদি যোগাসনে আসীন, দণ্ড-কমণ্ডল্বাদি গ্রহণে উদাসীন, বিষয়াভিলাষশূন্য হইয়া বিচরণ করিবে।

ন চোৎপাতনিমিত্তাভ্যাং ন নক্ষত্রাঙ্গবিদ্যয়া।

নানুশাসনবাদাভ্যাং ভিক্ষাং লিপ্সেত কর্হিচিৎ ॥ ৫০ ॥

ভূমিকম্প, ঝঞ্ঝা-বায়ু-প্রবাহণ, ও চক্ষুস্পন্দনাদির ইষ্টানিষ্ট ফল কথন, অশ্বিনী ভরণী প্রভৃতি নক্ষত্রের দোষ গুণ বর্ণন এবং হস্তরেখাদি দর্শন করিয়া শুভাশুভ নির্দ্ধারণ করিয়া ভিক্ষা করিবে না এবং এইরূপে চলা উচিত ও এরূপে চলা উচিত নয় ইত্যাদি নীতির উপদেশ ও শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াও ভিক্ষা করিবে না।

ন তাপসৈর্ব্রাহ্মণৈর্ব্বা বয়োভিরপি বা শ্বভিঃ।

আকীর্ণং ভিক্ষুকৈর্ব্বান্যৈরাগারমুপসংব্রজেৎ ॥ ৫১ ॥

যে গৃহ বানপ্রস্থ, অন্য ব্রাহ্মণ, পক্ষী কুক্কুর ও ভিক্ষুক দ্বারা ব্যাপ্ত, সে গৃহে ভিক্ষার্থ গমন করিবে না।

কৢপ্তকেশনখশ্মশ্রুঃ পাত্রী দণ্ডী কুসুম্ভবান্।

বিচরেন্নিয়তো নিত্যং সর্ব্বভূতান্যপীড়য়ন্ ॥ ৫২ ॥

কেশ নখ শ্মশ্রু ছেদন করিবে এবং ভিক্ষা পাত্র দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ করিয়া কোন প্রাণীকে কষ্ট না দিয়া সর্ব্বদা ভ্রমণ করিবে।

পরিব্রাজকের যে প্রকার ভিক্ষা পাত্র হওয়া উচিত, তাহা বলা হইতেছে।

অতৈজসানি পাত্রাণি তস্য স্যুর্নির্ব্রণানি চ।

তেষামদ্ভিঃ স্মৃতং শৌচং চমসানামিবাধ্বরে ॥ ৫৩ ॥

[illegible] ভিক্ষাপাত্রে স্বর্ণরৌপ্যাদি সম্পর্ক ও ছিদ্রাদি দোষ থাকিবে না। যজ্ঞের পানপাত্রের ন্যায় ঐ সকল পাত্রের জলের দ্বারা শুদ্ধি হইয়া থাকে।

অলাবুং দারুপাত্রঞ্চ মৃণ্ময়ং বৈদলং তথা।
এতানি যতিপাত্রাণি মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ ॥ ৫৪ ॥

যতির পাত্র যেরূপ হইবে, তাহা স্বায়ম্ভুব মনু কহিয়াছেন, যথা—অলাবু, দারুময় অথবা মৃণ্ময় কিম্বা বৃক্ষত্বকে নির্ম্মিত পাত্র।

এককালং চরেদ্ভৈক্ষং ন প্রসজ্জেত বিস্তরে।
ভৈক্ষে প্রসক্তো হি যতির্বিষয়েষ্বপি সজ্জতি ॥ ৫৫ ॥

প্রাণধারণার্থ একবার মাত্র ভিক্ষা করিবে, একবার যে ভিক্ষা করিবে, তাহাও অধিক হইবে না। অধিক ভিক্ষা গ্রহণে অধিক ভোজনাদি দ্বারা ধাতু বৃদ্ধি হইয়া স্ত্রী প্রভৃতি ভোগ্য বিষয়ে প্রসক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা।

এক্ষণে ভিক্ষা করিবার সময় নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

বিধূমে সন্নমুষলে ব্যঙ্গারে ভুক্তবজ্জনে।
বৃত্তে শরাবসম্পাতে ভিক্ষাং নিত্যং যতিশ্চরেৎ ॥ ৫৬ ॥

যখন পাকগৃহে ধূম না থাকে, গোধূমাদি চূর্ণ করিবার মুষল শব্দ নিবৃত্ত হয়, অঙ্গার নির্ব্বাণ হইয়া যায় এবং গৃহস্থ পর্য্যন্ত ভোজন করে, ও ভোজন পাত্র শরাবাদি পরিত্যক্ত হয়, সেই সময়ে ভিক্ষা করিবে।

অলাভে ন বিষাদী স্যাল্লাভে চৈব ন হর্ষয়েৎ।
প্রাণযাত্রিকমাত্রঃ স্যান্মাত্রাসঙ্গাদ্বিনির্গতঃ ॥ ৫৭ ॥

ভিক্ষাদি লাভ না হইলে বিষণ্ণ হইবে না, লাভ হইলেও হৃষ্ট হইবে না। যাহাতে প্রাণ ধারণ হয়, তন্মাত্র ভোজন করিবে এবং দণ্ড কমণ্ডলু প্রভৃতির উৎকর্ষাপকর্ষ বিবেচনায় আসক্ত হইবে না।

অভিপূজিতলাভাংস্তু জুগুপ্সেতৈব সর্ব্বশঃ।
অভিপূজিতলাভৈশ্চ যতির্মুক্তোঽপি বধ্যতে ॥ ৫৮ ॥

কেহ যদি পূজা করিয়া ভিক্ষা দেয়, তাহা গ্রহণ করিবে না। পূজিত হইয়া ভিক্ষাদি গ্রহণ করিলে স্নেহ মমতাদি জন্মিয়া মুক্তপ্রায় যতিরও সংসার বন্ধন হইয়া থাকে।

অল্পান্নাভ্যবহারেণ রহঃস্থানাসনেন চ।
হ্রিয়মাণানি বিষয়ৈরিন্দ্রিয়াণি নিবর্ত্তয়েৎ ॥ ৫৯ ॥

ইন্দ্রিয় সকল বিষয় দ্বারা আকৃষ্ট না হয়, এ নিমিত্ত অল্প আহার ও নির্জ্জন স্থানে বাস করিবে।

ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন রাগদ্বেষক্ষয়েণ চ।

অহিংসয়া চ ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ৬০ ॥

ইন্দ্রিয় দমন, রাগদ্বেষ পরিত্যাগ, প্রাণিহিংসা হইতে নিবৃত্তি, এই সকল কার্য্য দ্বারা মোক্ষলাভের যোগ্য হওয়া যায়।

বিষয় বৈরাগ্য ইন্দ্রিয় দমনের উপায়, সেই উপায়ের অবলম্বনার্থ সংসারের অনিত্যতা চিন্তা করিবে। এই উপদেশ দেওয়া হইতেছে।

অবেক্ষেত গতীর্নৃণাং কর্ম্মদোষসমুদ্ভবাঃ।

নিরয়ে চৈব পতনং যাতনাশ্চ যমক্ষয়ে ॥ ৬১ ॥

বিহিত কর্ম্ম না করিলে এবং নিন্দিত আচরণ করিলে সেই কর্ম্মদোষে মানবের পশুপক্ষ্যাদি দেহ প্রাপ্তি হয়, নরক গমন হয়, এবং যমালয়ে বিবিধ যাতনা ভোগ করিতে হয়। শ্রুতি-পুরাণাদি শাস্ত্রোক্ত এই বিষয়গুলি চিন্তা করিবে।

বিপ্রয়োগং প্রিয়ৈশ্চৈব সংযোগঞ্চ তথাঽপ্রিয়ৈঃ।

জরয়া চাভিভবনং ব্যাধিভিশ্চোপপীড়নং ॥ ৬২ ॥

কর্ম্মদোষে পুত্রাদি প্রিয় ব্যক্তির সহিত বিয়োগ ও অপ্রিয়ের সহিত সংযোগ হয়। শরীর জরায় অভিভূত ও পীড়াদি দ্বারা পীড়িত হয়, এ সকল বিষয়ও চিন্তা করিবে।

দেহাদুৎক্রমণঞ্চাস্মাৎ পুনর্গর্ভে চ সম্ভবং।

যোনিকোটিসহস্রেষু সৃতীশ্চাস্যান্তরাত্মনঃ ॥ ৬৩ ॥

এই দেহ হইতে জীবাত্মার নির্গমন, পুনরায় গর্ভে জন্ম গ্রহণ এবং কুক্কুর শৃগালাদি নিকৃষ্ট যোনিতে কোটি কোটি বার ভ্রমণ ইত্যাদি বিষয়ও চিন্তা করিবে।

অধর্ম্মপ্রভবঞ্চৈব দুঃখযোগং শরীরিণাং।

ধর্ম্মার্থপ্রভবঞ্চৈব সুখসংযোগমক্ষয়ং ॥ ৬৪ ॥

অধর্ম্মহেতুক দুঃখ এবং ধর্ম্মহেতুক ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ অক্ষয় সুখ লাভ হয়, এ বিষয়েরও চিন্তা করিবে।

সূক্ষ্মতাঞ্চান্ববেক্ষেত যোগেন পরমাত্মনঃ।

দেহেষু চ সমুৎপত্তিমুত্তমেষধমেষু চ ॥ ৬৫ ॥

যোগ দ্বারা পরমাত্মার আকৃতিশূন্যতা এবং জীবের শুভাশুভ কর্ম্ম ভোগার্থ উত্তম অধম দেবপশ্বাদি শরীর পরিগ্রহেরও বিষয়ও চিন্তা করিবে।

দূষিতোঽপি চরেদ্ধর্ম্মং যত্র তত্রাশ্রমে রতঃ।

সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ন লিঙ্গং ধর্ম্মকারণং ॥ ৬৬ ॥

যে কোন আশ্রমে অবস্থান করুক, সেই আশ্রম চিহ্ন-রহিত হইলেও ব্রহ্ম বুদ্ধিতে সকল প্রাণির প্রতি সমদৃষ্টি হইয়া ধর্ম আচরণ করিবে। যে হেতুক দণ্ড কমণ্ডলাদি ধারণ ধর্ম্মের কারণ নয়। দণ্ডকমণ্ডলু প্রভৃতি ধারণ করুক, আর না করুক, বেদাভ্যাস ও ঈশ্বরধ্যানাদি প্রকৃত বিষয়ের অনুষ্ঠান করিবে।

কেবল দণ্ডকমণ্ডলু প্রভৃতি ধারণে যে ইষ্টসিদ্ধি হয় না, দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা সমর্থিত হইতেছে।

ফলং কতকবৃক্ষস্য যদ্যপ্যম্বুপ্রসাদকং।
ন নামগ্রহণাদেব তস্য বারি প্রসীদতি ॥ ৬৭ ॥

কতক বৃক্ষের ফলে জল নির্ম্মল হয় সত্য, কিন্তু সেই ফলের নামোচ্চারণে জল নির্ম্মল হয় না, জলে ফল প্রক্ষেপ আবশ্যক। ঐরূপ কেবল ধর্ম্মচিহ্ন ধারণে ধর্ম্ম হয় না, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান আবশ্যক।

সাংখ্যদর্শন।

চতুর্থ অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বিষয়াসক্ত ব্যক্তির সংসর্গে যে দোষ ঘটে, তাহা বলা হইতেছে।

গুণযোগাদ্বদ্ধঃ শুকবৎ ॥ ২৬ ॥ সূ ॥

তেষাং সঙ্গে তু গুণযোগাৎ তদীয়রাগাদিসংযোগাদ্বদ্ধঃ স্যাৎ শুকবদেব। যথা শুকপক্ষী ব্যাধস্য গুণৈ রজ্জুভির্বদ্ধো ভবতি তদ্বদিত্যর্থঃ। অথবা গুণিনস্তস্য গুণযোগাদ্বদ্ধো ভবতি শুকবদিত্যর্থঃ। অত্রেদমুক্তং সৌভরিণা

স মে সমাধির্জলবাসমিত্রমৎস্যস্য সঙ্গাৎ সহসৈব নষ্টঃ।

পরিগ্রহঃ সঙ্গকৃতো মমায়ং পরিগ্রহোত্থাশ্চ মহাবিধিৎসাঃ ॥ ইতি ॥ ২৬ ॥

যেমন গুণ-লোলুপ ব্যক্তি শুকপক্ষীর রূপে মুগ্ধ হইয়া শুকপক্ষীকে বদ্ধ করে; তেমনি বিষয়াসক্ত ব্যক্তি নিজ-বিষয়-রাগাদিযোগে যোগীকে বদ্ধ করিয়া থাকে।

দুটী সূত্র দ্বারা বৈরাগ্যের উপায় নির্ণয় করা হইতেছে।

ন ভোগাদ্রাগশান্তির্মুনিবৎ ॥ ২৭ ॥ সূ ॥

যথা মুনেঃ সৌভরের্ভোগৈঃ রাগশান্তির্নাভূৎ এবমন্যেষামপি ন ভবতীত্যর্থঃ। তদুক্তং সৌভরিণৈব।

অদ্যাপ্যন্তো নৈব মনোরথানামদ্যেহস্তি বিজ্ঞাতমিদং ময়াদ্য।

মনোরথাসক্তিপরস্য চিত্তং ন জায়তে বৈ পরমার্থসঙ্গি ॥ ইতি ভা ॥

যেমন সৌভরি মুনির বিষয় ভোগ করিয়া রাগ শান্তি হয় নাই, তেমনি অন্যেরও ভোগ হেতুক রাগ শান্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। বিষয়সঙ্গ পরিহারই বৈরাগ্যের উপায়। সৌভরি মুনি বলেন, আমি এক্ষণে জানিতে পারিলাম, মনোরথের শেষ নাই। যে ব্যক্তি কেবল মনোরথ-কল্পনায় আসক্ত, তাহার চিত্ত পরমার্থে আসক্ত হয় না।

দোষদর্শনাদুভয়োঃ ॥ ২৮ ॥ সূ ॥

উভয়োঃ প্রকৃতিতৎকার্য্যয়োঃ পরিণামিত্বদুঃখাত্মকত্বাদিদোষদর্শনাদেব রাগশান্তির্ভবতি মুনিবদেবেত্যর্থঃ। সৌভরির্হি সঙ্গদোষদর্শনাদেব পশ্চে বৈরাগ্যং শ্রূয়তে।

দুঃখং যদৈবৈকশরীরজন্ম শতার্দ্ধসংখ্যং তদিদং প্রসূতং।

পরিগ্রহেণ ক্ষিতিপাত্মজানাং সুতৈরনেকৈর্বহুলীকৃতং তৎ ইতি ॥ ভা ॥

মুনি সৌভরির যেমন বিষয় সঙ্গের দোষ দর্শন করিয়া বৈরাগ্য হয়, সেইরূপ অপরেরও প্রকৃতি ও তৎকার্য্যের পরিণামিত্ব ও দুঃখদায়কত্বাদি দোষ দর্শন হেতুক বৈরাগ্য জন্মিয়া থাকে। বিষয় যে অতি অসার ক্ষণবিনশ্বর ও অকিঞ্চিৎকর এই বিবেচনাই বৈরাগ্যের প্রধান কারণ।

যে ব্যক্তির চিত্ত বিষয়সংসর্গে মলিন হইয়া যায়, উপদেশগ্রহণেও তাহার অধিকার থাকে না। এই আভাসে বলা হইতেছে।

ন মলিনচেতস্যুপদেশবীজপ্ররোহোঽজবৎ ॥ ২৯ ॥ সূ ॥

উপদেশরূপং যজ্জ্ঞানবৃক্ষস্য বীজং তস্যাঙ্কুরোঽপি রাগাদিমলিনচিত্তে নোৎপদ্যতে। অজবৎ। যথা অজনাম্নি নৃপে ভার্য্যাশোকমলিনচিত্তে বশিষ্ঠেনোক্তস্যাপ্যুপদেশবীজস্য নাঙ্কুর উৎপন্ন ইত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

অজ রাজার চিত্ত প্রিয়াবিরহ জন্য শোকে মলিন হইলে বশিষ্ঠের উপদেশবাক্য যেমন তাহাতে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই, তেমনি যে ব্যক্তির চিত্ত বিষয়াসক্তে মলিন হয়, তাহার হৃদয়ে উপদেশ বীজ অঙ্কুরিত হয় না।

নাভাসমাত্রমপি মলিনদর্পণবৎ ॥ ৩০ ॥ সূ ॥

আভাসজ্ঞানমপি মলিনচেতস্যুপদেশান্ন জায়তে বিষয়ান্তরসঞ্চারাদিভিঃ প্রতিবন্ধাৎ। যথা মলৈঃ প্রতিবন্ধাম্মলিনদর্পণেঽর্থো ন প্রতিবিম্বতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ভা ।

অধিক কথা কি, যেমন মলিন দর্পণে মুখাদির প্রতিবিম্ব পড়ে না, তেমনি বিষয়-সঙ্গ-দূষিত চিত্তে উপদেশনিবন্ধন জ্ঞানের আভাসমাত্রও হয় না। অতএব স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, বিষয়সঙ্গ বৈরাগ্যের প্রধান প্রতিবন্ধক।

বিষয়-সঙ্গ দূষিত ব্যক্তির উপদেশের অনুরূপ জ্ঞান কোন কালে জন্মে না, এই আভাসে সূত্রকার কহিতেছেন।

ন তজ্জস্যাপি তদ্রূপতা পঙ্কজবৎ। ৩১। সূ॥

তস্মাদুপদেশাজ্জাতস্যাপি জ্ঞানস্য উপদেশানুরূপতা ন ভবতি মলসংযোগপানবদ্দোষাৎ। পঙ্কজবৎ। যথা বীজস্যোত্তমত্বেঽপি পঙ্কদোষাৎ বীজানুরূপা পঙ্কজস্য ন ভবতি তদ্বদিত্যর্থঃ। পঙ্কস্থানীয়ং শিষ্যচিত্তং। ইতি ভা।

যেমন বীজ উৎকৃষ্ট হইলেও পঙ্কের দোষ ঘটিলে বীজের অনুরূপ পদ্ম হয় না, সেইরূপ বিষয় সঙ্গ-দূষিত চিত্তে কিঞ্চিৎ জ্ঞানের উদয় হইলেও সে জ্ঞান উপদেশের অনুরূপ হয় না।

যদি ঐশ্বর্য্য দ্বারা পুরুষার্থসিদ্ধি হয়, তবে মোক্ষলাভার্থ কষ্টসাধ্য তত্ত্বজ্ঞানার্জনচেষ্টার প্রয়োজন কি? এই আভাসে বলা হইতেছে।

ন ভূতিযোগেঽপি কৃতকৃত্যতোপাস্যসিদ্ধিবদুপাস্যসিদ্ধিবৎ। ৩২। সূ॥

ঐশ্বর্য্যযোগেঽপি কৃতকৃত্যতা কৃতার্থতা নাস্তি ক্ষয়াতিশয়াদিদোষযুক্তত্বাৎ। উপাস্যসিদ্ধিবৎ। যথা উপাস্যানাং ব্রহ্মাদীনাং সিদ্ধিযোগেঽপি ন কৃতকৃত্যতা তেষামপি যোগনিদ্রাদৌ যোগাভ্যাসশ্রবণাৎ তদ্বদেব তদুপাসনয়া প্রাপ্তৈরৈশ্বর্য্যৈঃ স্যাদিত্যর্থঃ। উপাস্যসিদ্ধিবদিতি বীপ্সাধ্যায়সমাপ্তৌ। ইতি ভা॥

ঐশ্বর্য্য দ্বারা কৃতার্থতা লাভ হয় না। কারণ ঐশ্বর্য্যের অর্জন রক্ষণ ও রক্ষাদি চেষ্টা জনিত কষ্ট আছে। এ স্থলে মনুষ্যের উপাস্য ব্রহ্মাদি দৃষ্টান্ত। তাঁহাদেরই যখন কৃতার্থতা নাই, তাঁহাদিগের আবার উন্নত পদলাভার্থ যোগাভ্যাস সংবাদ শুনিতে পাওয়া যায়, তখন তাঁহাদের আরাধনা করিয়া যাহারা ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের যে কৃতার্থতালাভ হইবে, তাহার সম্ভাবনা কি?

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈজ্ঞানিক কৌতুক।

মসৃণ কাচের উপর অণ্ড খাড়া রাখিবার কৌশল।

সমতল ভূমিতে এক খানি কাচ কিম্বা দর্পণ সমভাবে বসাইবে। তৎপরে উহার উপর কিঞ্চিৎ জল ঢালিয়া দেখিবে, যেন কোন দিকে উচ্চ নীচ না থাকে। কাচ খানি ঠিক সমভাবে না বসিলে তদুপরি অণ্ড রাখিলে তৎক্ষণাৎ পড়িয়া যাইবে।

কাচ খানি যত্নপূর্ব্বক সমভাবে বসাইয়া একটা সদ্যোজাত অণ্ড লইয়া বারম্বার নাড়িতে থাকিবে। অণ্ডের পীতবর্ণ কুসুম এবং শ্বেত লালা ভগ্ন হইয়া একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে উহার অগ্রভাগ নিম্নাভিমুখে রাখিয়া সাবধানে কাচের উপর বসাইবে। হাত নড়াতে ডিম্বটী কোন দিকে হেলিয়া থাকিলে পড়িয়া যাইবে। ভিতরে কুসুমাদি ভাঙ্গিয়া সুচারুরূপে মিশ্রিত না হইলেও ডিম্ব দাঁড়াইয়া থাকে না। উহাকে খাড়া রাখিবার তিনটী প্রধান কৌশল। প্রথম লালা ও কুসুম মিশ্রিত করা। দ্বিতীয় কাচ খানিকে সমানভাবে বসান। তৃতীয় ডিম্বটী ঠিক সোজা করিয়া রাখা। কৌতুক দর্শাইবার সময় প্রথমে কুসুম না ভাঙ্গিয়া দর্শকদিগকে অণ্ডটী কাচে বসাইতে বলিবে। তাঁহারা নিগূঢ় তত্ত্বটী না জানিলে কিছুতেই বসাইতে পারিবেন না। পরে গোপনে উহার লালা ও কুসুম নাড়িয়া মিশ্রিত করিলে তখন ডিম্বটী অবলীলাক্রমে কাচের উপর খাড়া করা যাইবে।

কাচের উপর ডিম্বটী উত্তমরূপে বসিলে ধীরে ধীরে হাত সরাইয়া লইবে কোন প্রকার নাড়া না পাইলে উহা অনেকক্ষণ খাড়া থাকিবে।

পাদপূরণ।

কবিভূষণ ; পূরণ কর—'জল পড়্লো পুড়ে ম'লো গরু'।

উত্তর—অনিক্ত পথুক দগ্ধ চুণরাশি ভার,
বলদে বোঝাই করে চুণুরী কুমার,
বিক্রয় করিতে যায় ধনীর ভবন।
হেন কালে ঘন ঘটা ঢাকিল গগন।
বিদ্যুৎ চিক্কুর কথা বরষিল জল ;
সলিল পরশে চুণে উপজে অনল।
দারুণ সন্তাপে বৃষ পরাণ হারায় ;
লাভ করা দূরে গেল চুণুরীর দায়।
বিধি লয়ে করুক শীঘ্র প্রায়শ্চিত্ত গুরু,
মেঘ হতে জল পড়্লো পুড়ে মলো গরু।

কল্পদ্রুম।

তুমিই কি সেই দৈবকী-নন্দন?

পুরাতন ইতিহাসের তত্ত্বোদ্ঘাটন করা অনায়াসসাধ্য নহে। আবার অনায়াসই বা বলি কেন? একবার যাহা বিস্মৃতিসাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে, তাহার আকার ও অবয়ব ত কিছুই নাই। জলবুদ্বুদবৎ তাহা জল-রাশিতে মিশিয়াছে, আর কি তাহা বুদ্ধি-কৌশলে বিশিষ্ট হইয়া পৃথগ্ভূত হইতে পারে? প্রাচীন তত্ত্বানুসন্ধান, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত কিম্বা বিজ্ঞানাদি শাস্ত্র হইলে আশা থাকিত যে, গভীরগবেষণা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে কালসহকারে তাহা দোষ-সম্পর্ক-পরিশূন্য এবং প্রমাদ-বিরহিত হইবে। কিন্তু লোকচরিত্র-সংঘটিত ইতিতত্ত্ব বিভিন্ন শাস্ত্র। উপযুক্ত সময়ে তাহা লিপিবদ্ধ না হইলে দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে; তখন প্রত্ন-তত্ত্বানুসন্ধায়িগণ পথ পাইবেন কি, দিশাহারা পথিকের ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে রজ্জুকে সর্পজ্ঞান করিয়া চমকিত হইতে থাকেন।

লিখিত ইতিহাসের অসদ্ভাবে কিম্বদন্তীই সত্য সংগ্রহের একমাত্র উপায়। কিন্তু কিম্বদন্তী বড় বেশভূষার সোহাগিনী। মনুষ্যচরিত-সংঘটিত কোন বিবরণ একবার তাঁহার হস্তে গিয়া বসিলে সোহাগ করিতে করিতে তাহার কত সজ্জাই করিয়া দেন। আজ ক্রোড়ে তুলিয়া বাহু দোলাইতে দোলাইতে তাহার নয়নযুগল কজ্জলরাগে অনুরঞ্জিত করিয়া দিতেছেন; আলুলায়িত কেশপাশ বাঁধিয়া দিয়া বনফুলের মালা পরাইতেছেন; মুচকি মুচকি মধুর মধুর হাসিয়া উপকথা শুনাইতেছেন,—ইতিহাস আদরে গলিয়া পড়ে, মাতৃবুলি ভুলিয়া যায়।

ভারতমাতা অঙ্ক পাতিয়া দিয়াছিলেন, এইখানে তাঁহার ক্রীড়াশীল সন্তানেরা কত খেলা খেলিয়াছিলেন; কেহ পটে আঁকিতেন,—কেহ লিখিয়া রাখিতেন। যা কুত্রাপি হয় নাই, ভারতে তাহা হইয়াছিল; ভারতে যাহা হয় নাই, তাহা আর কোথাও দৃষ্ট হয় না; ভারতে সকলি ছিল,

ভারতে যাহা ছিল না, এখন তাহা কোথাও নাই। শৌর্য্য বীর্য্য অস্ত্র শস্ত্র ভারতে ছিল; কাব্য নাটক স্মৃতি শ্রুতি,—তাও এই ভারতে; ভারতে জ্যোতিষ সঙ্গীত গণিতের অপ্রতুল ছিল না; পুরাণ,—ভারতে তাও ছিল; তবে ছিল না কি?—ভারতজননী কল্পবৃক্ষের প্রসূতি হইয়া কি কেবল ইতিহাস প্রসব করেন নাই? এ কথা বিশ্বাস করিতে হয়, বৈদেশিক ইতিবেত্তারা করুন; আমরা তাঁহাদের সর্ব্বভুক্ দুরাশানলে আহুতি দিব, তেমন মন্ত্রে দীক্ষিত হই নাই।

ইতিহাস কাহাকে বলে? এ শব্দটী আধুনিক "অণুবীক্ষণ" ও "দূরবীক্ষণের" ন্যায় ছাঁচে নূতন ঢালাই হয় নাই। ইহাতে কাঁচা কাঁচা গন্ধ নাই—শব্দটী পুরাতন। ন্যূনাধিক সহস্র বৎসর অতীত হইল প্রসিদ্ধ শাব্দিক অমর সিংহ উহার ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন—"ইতিহাসঃ পুরাবৃত্তঃ"। পুরাতন বৃত্তান্তের নাম ইতিহাস। ইতিহাস ছিল না; কিন্তু ইতিহাসের নাম আছে, কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন? কোন্ সুবিবেচক ব্যক্তি যুক্তির বহিশ্চর হইয়া উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ বাক্য কহিতে অগ্রসর হইবেন? রাজতরঙ্গিণীর প্রথম তরঙ্গে কহ্লণ পণ্ডিত লিখিয়াছেন যে, সুব্রত প্রাচীন ইতিহাস অভ্যাসসুগমার্থ সংক্ষিপ্ত শ্লোকে গ্রথিত করিয়াছিলেন। সুতরাং, কালক্রমে মূল পুস্তকখানি বিলুপ্ত হইয়া যায়। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, সুব্রত মুনির পূর্ব্বে ভারতবর্ষের ইতিহাস কোন পুস্তকবিশেষ বাহুল্যরূপে বর্ণিত ছিল। অতি বিস্তৃতিহেতু সকলে তাহা অনায়াসে স্মরণ রাখিতে পারিতেন না। অতএব, ইতিবৃত্তের পঠন পাঠন প্রথা সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ ভারতে অপ্রচলিত ছিল না। হেলারাজ দ্বাদশ সহস্র ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কহ্লণ পণ্ডিত, নীলমুনি প্রণীত ইতিহাস এবং অন্যান্য আরও একাদশ খানি পুরাবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া প্রসিদ্ধ রাজতরঙ্গিণী পুস্তক সঙ্কলন করেন। মহাভারতেরও প্রারম্ভে "ইতিহাস" এবং ইতিবৃত্ত শব্দ দৃষ্ট হয়।

> ইতিবৃত্তং নরেন্দ্রাণামৃষীণাঞ্চ মহাত্মনাং।
> ভূপতিগণের এবং মহাত্মা ঋষিগণের ইতিবৃত্ত।
> তথা—
> ভারতস্যেতিহাসস্য পুণ্যাং গ্রন্থার্থসংযুতাং।
> ভারত-ইতিহাসের পুণ্য গ্রন্থার্থ সহিত।

অতএব ইতিহাস-দ্যোতক শব্দ আজ ভারতবাসীর কর্ণে নূতন প্রতিধ্বনিত হইতেছে না। বিদেশীয় বণিকেরা পোত যোগে এই শব্দটী আজ দুদিন ভারতের সাগরসদৃশ শব্দ কোষে রোপণ করেন নাই। এটী পুরাতন কথা; পুরাতন ইতিবৃত্ত এদেশের বিশাল সাহিত্য ক্ষেত্রের অঙ্গাভরণ ছিল। সম্প্রতি, দুই এক খানি ভিন্ন ভারতের ইতিহাস নাই; কিন্তু কেবল ইতিহাস কেন? যা ছিল এখন তার কি আছে? এখন ত গগনের ললাট-ফলক-পরিব্যাপক পূর্ণ শশধর ক্ষুদ্র নক্ষত্রে পরিণত হইয়াছে। নাই—নাই, কেবল ইতিহাসটী কেন?—তখনকার ভারতের এখন ত আর কিছুই নাই। ভারতের নামমাত্র আছে, সে শৌর্য্য বীর্য্য বিদ্যাবুদ্ধি সকলি অস্তমিত হইয়াছে। ভারতের কীর্ত্তিকলাপ কেবল রাহু-কবলিত শশি-কলার ন্যায় অন্ধকারের ভিতর হইতে অপরিস্ফুট নীল আভা প্রকাশ করিতেছে।

বৈদিশিক রাজবিপ্লবে ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন কহ্লণ এবং প্রাজ্যভট্ট প্রভৃতি সঙ্কলিত কাশ্মীর ইতিহাস কাত্যায়ন বর-রুচি প্রণীত বৃহৎ কথাভিধান, সোমদেব ভট্টকৃত তৎসারাংশ কথা সরিৎসাগর এবং বেদান্তাচার্য্য রচিত বিশ্বগুণাদর্শ প্রভৃতি কতিপয় ইতিহাস পুস্তক আমাদের হস্তগত হইয়া থাকে। অতএব ভারতে ইতিহাস ছিল না,—যাঁহার বাকশক্তি আছে ইচ্ছা করিলে মুখে যা আসে তিনি তাই বলিতে পারেন, সুতরাং এ কথাও বলিতে পারেন; তবে সদ্বিবেচক মিতভাষিদিগের কথা বলি, তাঁহারা প্রলাপ বাক্য বলিতে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইবেন।

পুরাণ কাব্য নাটক এবং ধ্বংসাবশিষ্ট ইতিহাসে অনেক প্রাচীন বৃত্তান্ত বিবৃত আছে। তৎসমুদায় পাঠে ভারতের বিস্তর পুরাতন ইতিতত্ত্ব সংগৃহীত হইতে পারে। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, আমাদের সকল পুস্তকই মানব-কপোল-সম্ভূত কল্পনারাশিতে পরিপূর্ণ। পরস্পর ঐক্য করিলে অনেক মত-বিসম্বাদিতা এবং ভ্রান্তিপুঞ্জ আসিয়া পড়ে, বিস্তর অলৌকিক ও অদ্ভুত ঘটনা দৃষ্টিগোচর হয়। তাই পুরাণ ও ইতিহাস পাঠ করিতে এক এক বার বড় অপ্রবৃত্তি জন্মে। তবে জিজ্ঞাসা করিবে, অন্য জাতির ধর্ম্মপুস্তকে ও ইতিহাসে কি অপ্রামাণিক কথার প্রসঙ্গ নাই? আছে খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মপুস্তক এখন পৃথিবীর যাবতীয় সভ্যজাতির উপাস্য সম্পত্তি। যাঁহারা দূরবীক্ষণে সূক্ষ্মদৃষ্টি সংযোগ করিয়া নভশ্চর গ্রহ উপগ্রহের আকার ও অবয়ব নিরূপণ

করেন, পৃথিবীর দৈনন্দিন ও সাম্বৎসরিক গতি এবং সূর্য্যের স্বস্থানে আবর্ত্তন অবধারিত করিয়া থাকেন, বাইবল তাঁহাদের শিরোভূষণ,—বাইবলের লিখিত নীতিপদ্ধতিতে তাঁহাদের অচলা ভক্তি। সূর্য্যদেব সুস্থির হইয়া থাকিলেন, প্রখর কিরণজালে জগৎ সন্তপ্ত হইতে লাগিল—এ কথা তাঁহারা অবিতর্কিতরূপে বিশ্বাস করেন। লোহিত সমুদ্র আপনার বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া দিল, ঈশ্বরভক্তেরা স্বচ্ছন্দে পদব্রজে সাগরগর্ভ উত্তীর্ণ হইলেন। থাকিবে না কেন?—অলৌকিক ঘটনা সকল জাতির ধর্ম্মপুস্তকেই দৃষ্ট হয়। কিন্তু, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বীরা আজ পৃথিবীর একাধীশ্বর, তাঁহারা প্রবল প্রতাপান্বিত, সুতরাং তাঁহাদের ধর্ম্মপুস্তকও অভ্রান্ত। তুমি আজ কে? ক্ষীণ ক্ষুদ্র খদ্যোত হইয়া পূর্ণ শশীর তুলা হইতে চাও? ঈশ্বরভক্তের অনুরোধে সাগরের বারিরাশি শুষ্ক হইল, মৌনভাবে বিশ্বাস কর তাহাতে সংশয় মাত্র নাই। কিন্তু, গাছ পাথরে সাগর বন্ধন করা হইয়াছিল,—তাও কি কখন সম্ভবিতে পারে? তুমি মূঢ়মতি ভ্রান্ত পৌত্তলিক, তাই এমন অসম্ভব কথায় বিশ্বাস করিতে চাও। তোমার অলৌকিক অদ্ভুত ঘটনাগুলি—তোমার দোষ; অন্যের পক্ষে সেগুলি দেবলীলা। তোমার শাস্ত্রার্থের গুণভাগগুলি কখন তোমার স্বকীয় নহে,—তাহা তোমার অপহৃত সম্পত্তি;—তুমি অন্যের ধন অপহরণ করিয়া এখন নিজের বলিয়া দোহাই দিতেছ।

পাঠক! জিজ্ঞাসা করিবেন,—'এত অনুশোচনা কেন? কে কি বলিয়াছে? কে কি মনোব্যথা দিয়াছে?' অনুশোচনা নয়, তবে বলি, মনে আছে?—না, যুগান্তরের কথা হইল, মনে করিয়া না দিলে স্মরণ হইবে না। দেখ দেখি, মনে পড়ে, জলকল্লোল-নিনাদিনী কালিন্দী-ধৌত সৈকতে বসিয়া কৃষ্ণসখা বিনোদ বেণুর স্বরমাধুরী গোপবালাদিগের কর্ণকুহরে ঢালিয়া দিতেন। মনে পড়েছে,—ক্ষুধার্ত্ত ব্রজের রাখাল জঠরানলে কাতর, অরণ্য মধ্যে কোথাও অন্ন মিলিল না; কৃষ্ণসখা অন্ন দিয়া সকলের ক্ষুন্নিবারণ করেন। এক বার ক্রূর অক্রূর কৃষ্ণধন হরণ করিয়াছিলেন; আমাদের কেমন কৃষ্ণহারানো কপাল! দেখ—আবার বুঝি কৃষ্ণনিধি চুরী যান। অক্রূর কৃষ্ণ চুরী করিয়াছিল, শত বর্ষের পর কৃষ্ণ পাইয়াছিলাম। এবার চুরী গেলে আর আমরা কৃষ্ণধন ফিরে পাব না। কৃষ্ণলীলার সঙ্গে যিশু খ্রীষ্টের লীলায় বিস্তর সৌসাদৃশ্য উপলক্ষিত হয়; তজ্জন্য খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাব-

লম্বীরা আজ বলিতেছেন,—(১) খ্রীষ্টচরিত দেখিয়া আর্য্য ব্রাহ্মণগণ কৃষ্ণ-লীলা বর্ণন করিয়াছেন। হা খ্রীষ্ট! ভক্তবৎসল তুমি বঞ্চনা করিবে না, জিজ্ঞাসা করি,—তুমিই কি সেই দেবকী নন্দন? বিশ্বাস ত নাই! পরের মাকে মা বলা তোমার বিলক্ষণ অভ্যাস আছে। একবার দৈবকীকে ছাড়িয়া যশোদাকে মা বলিয়াছিলে, আবার মেরীকে যে মা বলিবে না, তাহার অসম্ভাবনা কি?

যদুকুল-ধুরন্ধর কৃষ্ণের চরিতগত অনেকগুলি প্রসিদ্ধ ঘটনা যিশু খ্রীষ্টের লীলার সদৃশ। দৈবকীর গর্ভে গোলোকপতি ভগবানের বিভূতি প্রবিষ্ট হইল, তাহাতেই কৃষ্ণের জন্ম। মেরীর গর্ভেও পরমেশ্বরের তেজঃ প্রবেশ করিল, তাহাতে যিশু জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। বসুদেব কংসাসুরের ভয়ে ভীত হইয়া নন্দের নিকটে নিশীথকালে সদ্যঃপ্রসূত শিশুকে গোপনে রাখিয়া আসেন। যিশুর ভাগ্যেও সেই দুর্দৈব ঘটিয়াছিল। মহারাজ হিরড্ শিশুর প্রাণ সংহারে কৃতসংকল্প হন; তখন দৈববাণী হইল, যিশুর পিতা জোসেফ সন্তানকে স্থানান্তরিত করিলেন। কৃষ্ণের দ্বাদশ সখা, যিশুরও মতানুগামী বার জন শিষ্য। কৃষ্ণ অরণ্য মধ্যে ক্ষুধাতুর রাখালদিগকে অন্ন ভোজন করাইয়াছিলেন, যিশুও যৎসামান্য রুটী ও মৎস্যে পাঁচ শত লোকের ক্ষুন্নি-বারণ করেন। চরমে কৃষ্ণের নিষাদ হস্তে মৃত্যু হইয়াছিল, যিশুর মৃত্যুও একটা ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ ব্যাপার।

অনেকে অনুমান করেন, সেণ্ট পাল ভারতবর্ষে আসিয়া খ্রীষ্টীয় মত ও বিশ্বাস প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহারই নিকট হিন্দুগণ খৃষ্টচরিত অবগত হন। হিন্দুসমাজে পাল, পুলস্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই অনুমান সত্য ও সমূলক হইতে পারে, কারণ পুলস্ত এবং পাল এই উভয় শব্দে পকার এবং লকার দৃষ্ট হইতেছে। একটা অনুস্বার ও বিসর্গ নয়, একটা মাত্রা নয়,—দুইটা সমগ্র বর্ণ উভয় শব্দে বিদ্যমান রহিয়াছে; এমন স্থলে পাল ও পুলস্ত যে এক ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহের বিষয় কি!

হিন্দুগণ কথায় বলেন,—"কলিকালে এক বর্ণ করিবে যবন।" এই মহা-জনোক্ত বাক্য আমাদের প্রামাণিক বোধ হইতেছে। এক শব্দশাস্ত্রের

(১) ডাক্তার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্য খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বীরা বদ্ধ-পরিকর হইয়া সপ্রমাণ করিতেছেন যে, কৃষ্ণ ব্রাহ্মণদিগের দেবতা নহেন। তাঁহারা খ্রীষ্টীয় চরিত পাঠ করিয়া কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়াছেন।

ক্রমায় স্থানের নাম, মনুষ্যের নাম, ধর্ম্মের নাম, দেবতার নাম সমস্ত একাকার হইয়া যাইবে। পরমেশ্বর আদমকে সৃষ্টি করিয়া ইদন উদ্যানে অবস্থিতি করিতে দিয়াছিলেন। আদম শব্দটী জ্ঞান হয় আদিমের অপভ্রংশ। আদম প্রথম মনুষ্য; জগৎস্রষ্টা সর্ব্বাদৌ তাঁহাকেই সৃষ্টি করেন, তজ্জন্য তাঁহার নাম আদিম। ইদন শব্দটী উদ্যানের অপভ্রংশ, তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দু ধর্ম্মের সঙ্গে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অনেক সাদৃশ্য উপপন্ন হয়। ব্রাহ্মণেরা সন্ধ্যা বন্দনার সময় মনোমালিন্য এবং অন্তঃস্থ পাপ বিমোচনার্থ জলের আরাধনা করেন, খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বীরাও জর্ডান জলে স্নাত হইয়া নিষ্পাপ ও পবিত্র হন। হিন্দু দেবালয়ের উপর ত্রিশূল স্থাপিত থাকে, তাহা খ্রীষ্টীয় ক্রশের অনুরূপ। ব্রাহ্মণেরা অঙ্গন্যাস করিবার সময় বাহুর উপর বাহু সংস্থাপন করেন, তাহাও উক্ত ক্রশের অনুকৃতি। তবে মূলে সকলেই এক!!

যৎকালে ভারতবর্ষে শৈবমত ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল, সেই সময় শৈব নৃপতিদিগের দূত পৃথিবীর দিগ্‌দিক্ ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। কম্বোজ অর্থাৎ কাবুল, পারস্য, আফগান স্থান প্রভৃতি দেশে তাঁহারা শৈবধর্ম্মের বীজ রোপণ করেন। অদ্যাবধি ঐ সমস্ত অঞ্চলের নিবিড় অরণ্য মধ্যে সুরম্য প্রাচীন মন্দির দৃষ্ট হয়। স্কন্দ পুরাণের ভগবতী অনেক দিন পর্য্যন্ত শমীবৃক্ষে লুক্কায়িত ছিলেন, ভগবান্ পশুপতি তাঁহার বিস্তর অনুসন্ধান করেন। তিনি কিছুকাল কপোতরূপ ধারণ করিয়া শমীবনে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই বৃত্তান্তের অনুকরণ করিয়া বাবিলোনের বীরাঙ্গনা শমিরমা (Samiramis) রাণীর বীরত্বাদি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। শমিরমা পূর্ণ যৌবনাবস্থায় স্বীয় প্রণয়ীর সঙ্গে কলহ করিয়া মানভরাবনতা কান্তবিয়োগিনী হইয়া শমীবনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রণয়িনীবিরহ-তাপিত শমিরমার পতি শোকে বিহ্বলাঙ্গ হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

নবীন পাঠক! ইতিহাস পুস্তকে যে শমিরমা রাণীর বৃত্তান্ত পাঠ করেন, তাহা সম্পূর্ণ অলীক। হিন্দুদিগের স্কন্দপুরাণ অধ্যয়ন করিয়া বৈদেশিক পণ্ডিতগণ শমিরমার বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়াছেন। এখন জিজ্ঞাসা করি, কেউ বলিতে পারেন—কৃষ্ণের বৃত্তান্তটী কি? মেরীপুত্র খৃষ্ট কি সেই দৈবকী নন্দন? না,—য়িহুদীরা, ব্রাহ্মণদিগের কৃষ্ণনাম সুধাভিষিক্ত দেখিয়া

তাহা আপনাদের ধর্ম্ম পুস্তকে চালিয়া দিয়াছেন ? পাঠক ত দেখিলেন, উভয়ের চরিত্রগত ঘটনা প্রায় একরূপ। তবে উভয়কে এক ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে প্রতিবন্ধ কি ? আমরা ত কোন প্রতিবন্ধ দেখি না। এই অনুমানটী আমাদেরও কেমন কেমন লাগিতেছে। উভয় চরিত্রে যে প্রকার সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাতে নিশ্চিত অনুমিত হয়, উহাদের অন্যতরটী অনেকাংশে অবিকল অনুকৃতি। তন্মধ্যে কোন্ খানি মূল আদর্শ এবং কোন্ খানি তাহার অনুকরণ, সম্প্রতি তাহাই আমাদের প্রধান বিচার স্থল। এতদুভয় চরিত্রের মধ্যে যাঁহার বৃত্তান্ত সর্ব্বাগ্রে গ্রথিত হইয়াছে, কিম্বা যিনি প্রথমে জীবিত ছিলেন, তিনিই মূল আদর্শ, তাহাতে কিছুমাত্র মত-বিসম্বাদিতা ঘটিতে পারে না। আমরা "রামায়ণ ও মহাভারত" শীর্ষক প্রস্তাবে উল্লেখ করিয়াছি, কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর অতীত হইলে কুরুপাণ্ডবেরা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অতএব, ৪৩২৮ বৎসর পূর্ব্বে আমরা অবনীতে পাণ্ডবদিগকে দেখিতে পাই, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ২৪৪৭ বৎসর পূর্ব্বে কুরু-পাণ্ডবেরা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে,—পাণ্ডবদিগের প্রিয় সুহৃদ কৃষ্ণ, যিশু খ্রীষ্টের পূর্ব্বতন ব্যক্তি। আবার রাজতরঙ্গিণীর প্রথম তরঙ্গে লিখিত আছে, বলরাম কশ্মীর দেশাধিপতি মহারাজ গোনর্দ্দকে সংগ্রামে পরাস্ত করিয়া তদ্দেশ অধিকার করেন। পাণিনির ব্যাকরণে এই গোনর্দ্দ শব্দ দৃষ্ট হয়। তদ্ভিন্ন, অষ্টাধ্যায়ীর সূত্র বিশেষ দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, তৎপ্রণেতা বাসুদেব ও অর্জ্জুনের পরে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, যথা—

বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং বুন্ । ৪ । ৩ ৯৮ ।

হিন্দুদের কথা যাহাই হউক, বৈদেশিক পণ্ডিতগণ বিস্তর অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, পাণিনি খৃষ্ট জন্ম পরিগ্রহের ৮০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং খৃষ্টের অনেক পূর্ব্বে কৃষ্ণার্জ্জুন বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

সিদ্ধান্ত-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্বদা সরল পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর। ধর্ম্মান্ধতা ও কুসংস্কার পরিত্যাগ না করিলে সন্দেহ দূর হয় না এবং কোন বিষয়ের বিশুদ্ধরূপ মীমাংসা হইবারও সম্ভাবনা নাই। খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকে যে প্রকার লিখিত আছে, তাহাই অভ্রান্ত দেববাক্য জ্ঞান করিলে কিছুতেই সত্যতত্ত্ব উন্নীত হইবে না। প্রকৃততত্ত্বানুসন্ধায়িগণ কুসংস্কার-পরিশূন্য

এবং সমদর্শী হইবেন, নচেৎ তাঁহাদের সকল প্রয়াস বিফল। ব্যাবিলনে সর্ব্বাদৌ মানুষের সৃষ্টি হইয়াছিল, ইদন-উদ্যানে পরমেশ্বর সর্ব্বাদৌ স্ত্রীপুরুষকে সংস্থাপন করিয়াছিলেন ; অন্য জাতির ধর্ম্মপুস্তক কাল্পনিক, এ প্রকার অপরিব্যাপ্ত বিচারপদ্ধতির দ্বারা পুরাতন তত্ত্বানুসন্ধান করিলে সাধারণের মনস্তুষ্টি সাধিত হয় না,—সত্য হৈমন্তিক দিবসের ন্যায় সঙ্কুচিত হইয়া শীঘ্র শীঘ্র প্রস্থান করিবার পথ দেখেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ভাল,—পক্ষপাতশূন্য হইয়া বলুন দেখি, উপরে যে প্রকার প্রমাণ উদ্ধৃত হইল, তদ্দ্বারা কে অগ্রবর্ত্তী প্রতিপন্ন হইতেছেন ?—আমাদের দৈবকীনন্দন কৃষ্ণ ? না,—আপনাদের মেরীপুত্র খৃষ্ট ? যদি আমাদের ইতিহাসকে অনাদর ও অবিশ্বাস না করেন, তবে আমাদের কৃষ্ণই অগ্রবর্ত্তী এ কথা অবশ্য বলিবেন,—কাহারও অনুরোধে নয়, বিচারে পরাভূত হইয়া নয়, প্রমাণ দৃষ্টে এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিবেন। যদি তাঁহারা আমাদের পুরাণ ব্যাকরণ ও ইতিবৃত্তে অনাস্থা প্রদর্শন করেন,—করুন, তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু তাঁহারা যদি কেবল আপনাদের ধর্ম্মপুস্তককে অভ্রান্ত জ্ঞান করেন তবেই ঘোর বিপদের কথা। কারণ ও প্রমাণ দর্শাইয়া কোন মতের সমর্থন করুন, সকলেই তাহার আদর করিবেন। অকারণে কোন বিষয় বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করিলে সে কথা বলবৎ হয় না। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টীয় সকল ধর্ম্মপুস্তকেই মানব-কপোল-সম্ভূত কিম্বদন্তী সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রাচীন তত্ত্ববেত্তারা সেই অন্ধতমসাচ্ছন্ন জটিল বিষয়ের মধ্য হইতে যে কিছু সার ভাগ সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পরন্তু যাঁহার চিত্ত ধর্ম্মান্ধতা হইতে বিনির্মুক্ত হয় নাই, এমন কূটার্থ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র।

আমরা উপরে যে প্রকার সমাধান করিয়াছি, পক্ষপাতশূন্য ব্যক্তি তদ্দৃষ্টে নিশ্চিত বিশ্বাস করিবেন যে, খ্রীষ্টের পূর্ব্বে আমাদের কৃষ্ণ অবনীর ভারাবতারণ সঙ্কল্পে মানব দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। তৎপরে বহুকাল অতীত হইলে যখন য়িহুদিরা সভ্যতাপদবীতে অধিরোহণ করিলেন, তৎকালে বাণিজ্য বিস্তারের অনুরোধে তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষে আসিতে হইয়াছিল। হিন্দুদের সঙ্গে অবস্থিতি ও বাক্যালাপ করিতে করিতে তাঁহারা হিন্দুদের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মের মত এবং অনুশাসন শিক্ষা করিলেন। কৃষ্ণচরিত্রের বীজমন্ত্র হিন্দুরাই য়িহুদিদিগের হৃদয়ক্ষেত্রে রোপণ করিয়াছিলেন। হিন্দুরা

কস্মিন্ কালে ধর্ম্মানুশীলন এবং কল্পনাকলের ভিখারী নন। তাঁহাদের আর কিছু না থাকুক, হিন্দুদিগকে অন্নজলের জন্য আর বুদ্ধি-কল্পিত বিদ্যার জন্য পরের দ্বারস্থ হইতে হয় না। তাঁহাদের হোমধেনু দুগ্ধবতী, জন্মভূমি শস্যোৎপাদিনী এবং চিত্তভূমি প্রতিভাশালিনী। কল্পনাক্ষেত্রে অনুস্যূত যত কিছু রত্ন আছে, হিন্দুরা তাহা অপর্য্যাপ্ত ভোগ করেন। হিন্দুরা সে ধনের কাঙ্গাল নন, তাঁহারা সে ধনের ভিখারী নন; তাঁহারা তেমন ধন অন্যকে কত ভিক্ষা দিতে পারেন।

আমরা উপরে যে শর্ম্মিষ্ঠার বিবরণটী লিখিয়াছি, পাঠক! হয় ত তাহা অপ্রাসঙ্গিক উল্লেখ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বাস্তবিক তাহা নয়। আমরা এ স্থলে তৎপ্রসঙ্গতঃ কয়েকটী কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তজ্জন্যই তাঁহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। পাঠক! বলিতে পারেন শ্বেতদ্বীপ কোথা ? ইহা কি চিন্তাশীল কবিদিগের কপোলসম্ভূত একটী কাল্পনিক দ্বীপ ? না, উহা যথার্থই পৃথিবীর কোন প্রদেশ বিশেষকে আশ্রয় করিয়া আছে ? পুরাণে দৃষ্ট হয় শাল্মলি দ্বীপের অন্তর্গত শ্বেতদ্বীপ। সেটী দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ স্বরূপ। যাঁহারা বিষ্ণুভক্ত কিম্বা বিষ্ণুকর্ত্তৃক নিহত হন, তাঁহারাই সর্ব্ব-সুখাশ্রয় সেই পবিত্র ধামে বাসের অধিকারী। সেখানে স্বয়ং বিষ্ণু অবস্থিতি করিতেছেন (১) এবং তথাকার পুণ্যাত্মারা দীর্ঘকায় এবং মহাবল পরাক্রান্ত। দেবতাগণও সংগ্রামে তাঁহাদিগকে পরাভূত করিতে অক্ষম।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে একটী গল্প আছে যে, একদা লঙ্কাধিপতি রাবণ দেবর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্! আপনি ত্রিলোকজ্ঞ, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এই ত্রিলোকের সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথ অবগত আছেন। আমি যুদ্ধ কামনা করি, অতএব বলুন আমার সমকক্ষ মহাবীর কোন্ স্থানে। রাবণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া নারদ উত্তর করিলেন,—তুমি শ্বেতদ্বীপে গমন কর। তথাকার সমস্ত ব্যক্তি মহাকায় ও মহাবল। তুমি তাঁদের সহিত সংগ্রামে প্রীতিলাভ করিবে। রাবণ শ্বেতদ্বীপে উপনীত হইয়া দেখিলেন, তাহা দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠধাম। বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত হইলে তিনি সেই পুণ্যধামে বাসের

---

(১) শ্বেতদ্বীপং গতবতি ত্বয়ি দ্রষ্টুং তদীশ্বরং।
তত্র হাস্যকৃৎ প্রশ্নং মাং যমত্বপৃচ্ছসি। ভাগবত। ১০ স্কন্দ ;

অধিকারী হইবেন। তজ্জন্য লঙ্কাধিপতি বিষ্ণুর কোপবর্দ্ধনার্থ বৈদেহীকে হরণ করিয়াছিলেন (২)।

খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী-সম্প্রদায়ভুক্ত কোন কোন ইতিবেত্তা স্থির করেন যে, বাবিলনাদি প্রদেশকেই শ্বেতদ্বীপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইতেছে। য়িহুদিরা গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায় এবং পরাক্রান্ত, অতএব তাঁহারাই শ্বেতদ্বীপের লোক হইবেন। ব্রাহ্মণদিগের স্বর্গধাম, গোলোক, বৈকুণ্ঠ ও মোক্ষধাম সকলি ভারতবর্ষের পশ্চিমে অবস্থিত! স্কন্দ পুরাণের গল্পটীও পশ্চিম প্রদেশের শমিরমা রাণীর চরিত হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ভারতের সভ্যতা, বল বিক্রম এবং বিদ্যাবুদ্ধি সকলি পশ্চিম দেশ হইতে অধিগত!

অসীম বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বিদের এই ত মত, এই ত তাঁহাদের সিদ্ধান্ত! আধুনিক যবন তীর্থভূমি মক্কা না কি আমাদের মোক্ষধাম। পাঠক! জানেন ত?—আরবের জলশূন্য তৃণলতা তরুবিহীন অনন্ত বালুকাপূর্ণ মরুভূমিটী বাছিয়া বাছিয়া ভাল স্থান পুণ্যের পুরস্কার বলিয়া মনোনীত করা হইয়াছে। বিষয় ভোগ লালসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিবিড় অরণ্যে গলিত পত্র ভোজন করিয়া কঠোর তপস্যা করিলেন, দেহ অস্থিচর্ম্মাবশেষ হইল; পরিণামে যোগীর ভাগ্যে কি ফল মিলিল?—আরবের অনন্ত মরুভূমিতে মক্কাধাম লাভ! পোড়া কপাল আর কি! তপস্যার ফল দেখিয়া ধর্ম্মকর্ম্মে অরুচি জন্মে। মক্কা যদি মোক্ষধাম হয়, তবে এ মর্ত্ত্যলোকের অপরাধ? লোকের বিচার পদ্ধতিকে ধন্য, মনের প্রবৃত্তিকে শতবার ধন্য!

---

(২) ভগবন্ ব্রূহি মে যুদ্ধং কুত্র সন্তি মহাবলাঃ।
লোকমিচ্ছামি বলিভিস্তং জানাসি জগত্রয়ং॥
মুনির্ধাত্রা তু সুচিরং শ্বেতদ্বীপনিবাসিনঃ।
মহাবলা মহাকায়াস্তত্র যাহি মহামতে।
বিষ্ণুপূজারতা যে বৈ বিষ্ণুনা নিহতাশ্চ যে।
ত এব তত্র সংজাতা অজেয়াশ্চ সুরাসুরৈঃ॥
×　+　+　+　+　+
আশ্চর্য্যমতুলং লঙ্কা চিন্তয়ামাস দুর্ম্মতিঃ।
বিষ্ণুনা নিহতো যামি বৈকুণ্ঠমিতি নিশ্চিতঃ॥
ময়ি বিষ্ণুর্যথা ক্রুদ্ধস্তথা কার্য্যং করোম্যহং।
ইতি নিশ্চিত্য বৈদেহীং জহার বিগিমেশ্বরঃ॥ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

শুনিয়াছি, লণ্ডন নগর না কি অতীব সুরম্য। আবার পারিস নগরের তুল্য না কি মনোহর স্থান ভূমণ্ডলের কুত্রাপি নাই। রাজপথ প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত; বিচিত্র অট্টালিকাগুলি নানা কৌশলে সুসজ্জিত; উপবনগুলি চক্ষুর তৃপ্তিজনক; এ দিকে আবার নানা প্রকার ফল। ফলতঃ, নগরটার অনুপম সৌন্দর্য্য এবং অতুল সম্পত্তি দেখিলে দ্বিতীয় ইন্দ্রভবন বলিয়া ভ্রম জন্মে। যদি শত বর্ষ পূর্ব্বে কোন হিন্দু পারিসরাজধানীতে উপনীত হইতেন; তবে বৈকুণ্ঠধামই বল, ব্রহ্মপুরীই বল, আর ইন্দ্রের অমরাবতীই বল, তাঁহাকে যা বলিতে তিনি তাহাই বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু মক্কার কোন্ গুণে মোক্ষার্থী সাধকের মন আকৃষ্ট হইবে? তৃষ্ণাতুর হইলে শুষ্ককণ্ঠ শীতল করিবার স্নিগ্ধ জল নাই; রৌদ্রতাপে সন্তপ্ত হইলে তরুলতার ছায়াও মিলে না; একবার মৃত্তিকায় পদার্পণ করিলে,—ত্রাহি মাং মধুসূদন! প্রাণ যায়। এমন সুখের ধাম কোন্ দেবতার বরের ফল, বলিতে ত পারি না। ফাল্গুনী ঘণ্টাকর্ণের বুঝি?

এক্ষণে পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, মক্কাপুরী সুখের স্থান না হইলে মুসলমানদের এত আদরের স্থান কেন হইল? সৌন্দর্য্যাদিগুণের নিমিত্ত মক্কা প্রসিদ্ধ নহে। মুসলমানদের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের স্থান বলিয়াই মক্কা এত বিখ্যাত হইয়াছে। হিমালয় পর্ব্বত ত সৌভাগ্যহীন দুঃসহ হিমানী দোষে দূষিত; মহাদেবের অধিষ্ঠিত স্থান বলিয়া আমরাও ত তাহার সমাদর করিয়া থাকি। তবে হিমালয় পর্ব্বত দেখিতে অতি চমৎকার, মক্কা দেখিতে সেরূপ নহে।

শব্দ শাস্ত্র, সত্যতত্ত্বের গ্রীবাভঙ্গে কৃতসংকল্প হইয়াছে। মোক্ষধামের কথা ত ঐ গেল। এক্ষণে শ্বেতদ্বীপ কোথায়, স্থির করুন। প্রত্ন-তত্ত্বানুসন্ধায়ী ইতিবেত্তারা বলিতেছেন যে, জেরুযুলমই শ্বেতদ্বীপ। হবে!—আশ্চর্য্যের বিষয় ত নয়; তথাকার লোকেরা শ্বেতকায়, তজ্জন্য উক্ত দেশের নাম শ্বেতদ্বীপ হইতে পারে। কাশ্মীরিগণও অনুপম লাবণ্য সম্পন্ন গৌরবর্ণ ব্যক্তি; তাঁহারা কি অপরাধে শ্বেতদ্বীপবাসী হইলেন না? যাহা হউক শ্বেত মনুষ্য বাস করিলে যদি শ্বেতদ্বীপ হয়,—হউক। কিন্তু, হাতীর মত আজ কাল বড় বড় মোটা মোটা জাম পড়ে, সে জম্বু দ্বীপটা কোথা? ইডনের উদ্যানে? না,—বোধ হয় এতটা অসঙ্গত কথা স্বীকার করিবেন না। সে জম্বু-বৃক্ষ, সে জম্বুদ্বীপ কবির কল্পনাপ্রসূত অবশ্যই ইহা স্বীকার করিতে হইবে?

অবহিত চিত্তে বিচার করুন, শ্বেতদ্বীপও তাই। কবিগণ কোন প্রকৃত স্থানকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত দ্বীপের নাম করণ করেন নাই। শ্বেতদ্বীপবাসীদিগের বলবীর্য্য সুখৈশ্বর্য্য সকলি কবিকপোলোদ্ভূত কল্পনালহরীতে খেলিতেছে। তাহারা কখন কলেবর ধারণ করে নাই; লেখকের কল্পনালহরীতে আবির্ভূত হইয়া জলবুদ্বুদবৎ খেলিতে খেলিতে সেই খানেই বিলীন হইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত কপোল-সম্ভূত কাল্পনিক স্থান লইয়া যদি সত্য সমর্থন করিতে হয়; তবে পণ্ডিতগণ স্বপ্নযোগে রাজ্য লাভ করিয়া কোন্ দিন কোন্ রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া বসিবেন বলা যায়।

প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণেরা ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়া অন্যান্য স্থানেও উপনিবেশ করিয়াছেন। কিন্তু দূর দেশের বৃত্তান্ত ভালরূপ জ্ঞাত ছিলেন না। পুরাণাদিতে সপ্তবর্ষ ও তত্তদন্তর্গত দ্বীপ নদ নদী ও পর্ব্বতাদির যে প্রকার নাম ও স্থান এবং গুণ প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সে সমুদায় কল্পনাতে ভিন্ন সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিতে কখন বিদ্যমান ছিল না। ভূগোলের বিবরণ বিশিষ্টরূপ জ্ঞাত না থাকায় সকল স্থানের দিঙ্নিরূপণও ভ্রমশূন্য হয় নাই। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বানরগণ সীতান্বেষণার্থ সুগ্রীবের নিয়োগানুসারে চতুর্দ্দিকে গমন করে। বাল্মীকি সেই অবসরে অনেক নদ, নদী গিরি, প্রত্যন্ত পর্ব্বত এবং দেশ বিদেশ ও দ্বীপাদির নাম করিয়াছেন। তন্মধ্যে আমরা লোহিত সমুদ্র এবং শাল্মলীদ্বীপের নাম দেখিতে পাই। লোহিত সমুদ্রের নাম শুনিয়াই পাঠক হয় ত আহ্লাদে প্রফুল্ল হইয়া ভাবিবেন,—এটী আরবের সীমাবর্ত্তী লোহিত সাগর। বস্তুতঃ তাহা নহে। যে প্লবঙ্গমগণ পূর্ব্ব দিগ্‌ভাগে গমন করিবে, সুগ্রীব সেই দিকে তাহাদিগকে লোহিত সমুদ্রের কথা বলিয়া দিলেন। অতএব এটী অন্য কোন সমুদ্র,—কল্পনাসম্ভূতই হউক, কিম্বা বাস্তবিকই হউক, এখন তাহা বলিতে পারি না। পশ্চিমদিকে ঐ সমুদ্রের স্থান নিরূপণ করিলে উহা আরবের সীমাদেশবর্ত্তী লোহিত সাগর হইত। এই লোহিত সমুদ্রের নিকটেই শাল্মলী দ্বীপ।

ততো রক্তজলং ভীমং লোহিতং নাম সাগরং।
গত্বা প্রেক্ষ্যথ তত্রৈব বৃহতীং কূটশাল্মলীম্। ৪০। ৩৯।

তৎপরে রক্তজল বিশিষ্ট ভয়ঙ্কর লোহিত সমুদ্র প্রাপ্ত হইবে। তথায় বৃহৎ কূটশাল্মলী বৃক্ষ দেখিতে পাইবে।

শাল্মলী দ্বীপের অন্তর্গত শ্বেতদ্বীপ। অতএব উহা ভারতবর্ষের পশ্চি-

মাংশে জেরুজুলামাদি দেশে অবস্থিত হইতে পারে না। আমাদের অনুমান হয়, প্রশান্ত মহাসাগরাবস্থিত সেলিবীজ দ্বীপই প্রাচীন শাল্মলীদ্বীপ হইতে পারে। আলেকজান্ডারের ভারতবর্ষ আক্রমণের কিছু কাল পরে এ দেশীয় বণিকেরা পশ্চিমাঞ্চলে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে কখন তাঁহারা পারস্য আরব প্রভৃতি দেশে পদার্পণ করেন নাই। কিন্তু হিন্দু বণিকেরা পূর্ব্ব সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে আসিয়া বাণিজ্য করিতেন এবং কালক্রমে তথায় কেহ কেহ উপনিবেশও করিয়াছিলেন। যবদ্বীপ, সুবর্ণদ্বীপ (বর্ণন) প্রভৃতি স্থানে বানরেরা সীতার অন্বেষণ করিয়াছিল।

ততোযাত্তাযবদ্বীপং সপ্তরাজ্যোপশোভিতং।
সুবর্ণরূপ্যকদ্বীপং সুবর্ণকরমণ্ডিতং॥ ৪০। ৩০।

১৩০০ শকাব্দা পর্য্যন্ত যব দ্বীপ ও উহার নিকটবর্ত্তী অন্যান্য দ্বীপে হিন্দুধর্ম্ম এবং সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল। মুসলমানেরা ঐ সমস্ত দ্বীপপুঞ্জ নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া তত্তৎ স্থলে মহম্মদ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করেন। তদবধি হিন্দু-ধর্ম্মের বহুল প্রচারে এককালে রহিত হইয়া যায়। অতঃপর ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে দিনামারারা যবনদিগকে পরাজয় করিয়া শনৈঃ শনৈঃ আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করেন। বিধর্ম্মিদিগের উৎপীড়নে ক্রমে সংস্কৃত ভাষা এবং হিন্দু-সম্মত আচার ব্যবহার এককালে বিলুপ্ত হইয়া গেল। বলিদ্বীপ ভিন্ন কুত্রাপি আর বৌদ্ধ কিম্বা হিন্দুধর্ম্মের চিহ্নমাত্রও এক্ষণে বিদ্যমান নাই। বলিদ্বীপের "কবিভাষা" সংস্কৃতের অনুরূপ। উহা অদ্যাপি প্রাচীন দেবনাগর অক্ষরে লিখিত হইয়া থাকে। যব দ্বীপ এবং বলিদ্বীপে রামকবি নামে কাব্যপুস্তক আছে, তাহা রামায়ণের অনুবাদ। তদ্ভিন্ন পরীক্ষিৎ পীঠ, নীতিশাস্ত্র, কবি, শ্রুতি, ব্রতযুদ্ধ, বিবাহকবি, প্রভৃতি অনেকগুলি সংস্কৃত পুস্তক প্রচলিত আছে। যবদ্বীপান্তর্গত ব্রহ্মাবনন ও সিনগমরি নামক স্থানে পুরাতন দেবনাগর অক্ষরে ক্ষোদিত বিবিধ বিষয় উপলব্ধি হয়। কাল-সহকারে সেই গুলি উত্তমরূপে নির্ব্বাচিত হইলে অন্ধতমসাচ্ছন্ন প্রত্নতত্ত্বে অনেক আলোক প্রতিফলিত হইবে।

হিন্দুদিগের পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য এবং ধর্ম্মশাস্ত্র সমস্তই ভারতবর্ষ হইতে সমুদ্রকুক্ষিগত দ্বীপপুঞ্জে আনীত হইয়াছিল। আর্য্যেরা যব, বলি প্রভৃতি দ্বীপে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া তত্তৎস্থলে কোন নূতন বিধি প্রণয়ন করিয়াছিলেন কি না, এখন তাহা নিশ্চিত জানিবার উপায় নাই।

যবদ্বীপবাসিদের "শাস্ত্র মানব" আমাদের কৃতযুগের মানবধর্ম্মশাস্ত্রের অনুরূপ। কালসহকারে এতদুভয়ের মধ্যে যতই পার্থক্য ঘটুক না, আদৌ উহারা একই পুস্তক তাহাতে সংশয় নাই। "পাণ্ডব" এবং "ব্রতযুদ্ধ" এই কাব্যদ্বয় ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ মহাভারতের সারভাগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু, মহাভারত যেমন বিস্তীর্ণ, ঐ পুস্তকদ্বয় তাদৃশ নয়। উহাদের শ্লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। ব্রতযুদ্ধে কেবল ৭১২ সাত শত বারটী মাত্র শ্লোক আছে। বলিদ্বীপের অট্টালিকাদির ভগ্নাবশেষে অদ্যাপি যে সমস্ত পুরাতন প্রশস্তি ক্ষোদিত আছে, তাহাতে উত্তরকালে আরও অধিক ইতিতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে। কিন্তু, সেই সমস্ত অক্ষর নির্ব্বাচন করা সহজ নহে। চলিত দেবনাগরের সহিত উহার বিস্তর প্রভেদ দৃষ্ট হয়, অতএব কোন কালে অনবগীতরূপে তাহার প্রকৃত মর্ম্ম সংগৃহীত হইবে এমন আশা নাই।

এই প্রকার নানা কারণে আমরা দেখিতে পাই, আর্য্যদিগের ভারতবর্ষের পূর্ব্বদিকভাগে অধিক গতিবিধি ছিল। পশ্চিমে বাণিজ্যের অনুরোধেই হউক কিম্বা অন্য কোন কারণেই হউক তাঁহারা তত যাতায়াত করিতেন না। ফিনিক্, আরব প্রভৃতি দেশবাসিরা স্বয়ং এদেশে আসিয়া বাণিজ্য করিতেন, এবং বিনিময়ে কেবল যে এ দেশীয় বাণিজ্যজাত দ্রব্য সামগ্রী লইয়া যাইতেন এমত নহে, তাঁহারা এতদ্দেশের বিদ্যা এবং আচার ব্যবহার এবং ধর্ম্মনীতিও লইয়া যাইতেন। কিষ্কিন্ধ্যাধিপতি যৎকালে সীতান্বেষণ জন্য প্লবঙ্গমদিগকে দিগ্বিদিক্ পাঠাইলেন, আমরা দেখিতে পাই—পশ্চিমদিকে বাল্মীকির ভূতত্ত্বজ্ঞান অবিশুদ্ধরূপে প্রকাশিত হয় নাই। তিনি সিন্ধুনদ পার হইয়া যত পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছেন, ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া যতই দুর্গম সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছেন, ততই কাল্পনিক নদ নদী গিরি বন ও জনপদ তদীয় প্রতিভাশালী চিত্তফলকে আলিখিত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য কি?—চতুর পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিয়াছেন,—কবির কপোল সম্ভুত কল্পনাই ঐ সমস্ত স্থানে বিচরণ করিয়াছে, মানব চক্ষু কখন সে সকল প্রদেশ দেখে নাই।

শ্বেতদ্বীপ পশ্চিমদিগ্‌ভাগের কোন প্রকৃত দেশবিশেষ নহে,—কবির উত্তাল তরঙ্গায়িত কল্পনা লহরীর বুদ্বুদ মাত্র। আমাদের কৃষ্ণ, খ্রীষ্ট নহেন; তিনি মেরীকে আবার মা বলেন নাই,—মা বলিয়াছিলেন সে কেবল যশো-

দাকে। বিষয় শিক্ষাপরিশূন্য ব্রাহ্মণেরা চৌর্য্যবৃত্তি জানিতেন না,—জেরুজুলামবাসিরাই গোপীদিগের মনচোরাকে চুরী করিয়াছেন।

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।

দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর।)

দেবগণ আহারাদি করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর দফরাগাজি দেখিতে চলিলেন। তাঁহারা একটী পোলের উপর উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন "এই পোলের নিম্ন দিয়া সরস্বতী নদী প্রবাহিত হইতেছে। যমুনাও চেয়ে দেখুন পরপারে গঙ্গার নিকট হইতে বিদায় লইয়া ধীরে ধীরে যাইতেছে।"

ব্রহ্মা। আহা! মা আমার এই স্থানে একা পড়েন।

ক্রমে সকলে দফরাগাজিতে উপস্থিত হইয়া দেখেন—একটী প্রস্তরনির্ম্মিত ছাদবিহীন বাড়ী রহিয়াছে। বরুণ কহিলেন "ঠাকুর দা! প্রাচীরে গাজির কুড়ুল দেখুন। এই কুড়ুল নড়ে চড়ে অথচ খসে না।"

"হাঁ! বল কি—নড়ে চড়ে খসে না!" বলিয়া, নারায়ণ হাস্য করিতে করিতে কত টানাটানি আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই খুলিতে সমর্থ হইলেন না। দেবরাজ প্রভৃতি সকলেই এক এক বার চেষ্টা করিয়া দেখিলেন সর্ব্বশেষে উপও অনেক টানাটানি করিল।

ইন্দ্র। বরুণ দফরাগাজি কি?

বরুণ। দরফ খাঁ নামক এক জন মুসলমান গঙ্গাবাসী হইয়া এই স্থানে গঙ্গার তপস্যা করেন। তাঁহারই নাম অনুসারে স্থানটীকে দফরাগাজি কহে।

ব্রহ্মা। বরুণ! দরাফ খাঁ মুসলমান হইয়া কি জন্য গঙ্গাবাসী হইলেন?

বরুণ। কথিত আছে—দরফ খাঁ এক জন ধনাঢ্য মুসলমান ছিলেন। এক দিন সন্ধ্যার পর স্থানান্তর হইতে যখন তিনি নিমন্ত্রণ খাইয়া প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে অকস্মাৎ বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইলে তাঁহার সঙ্গিগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কে কোথায় পলায়ন করিল। তিনি বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার জন্য পথিপার্শ্বস্থ শ্মশান ভূমির সন্নিকটে একটী বট বৃক্ষের তলে

আশ্রয় লন। এই সময় তিনি শুনিলেন বৃক্ষোপরি ভূত প্রেতিনীতে কথোপকথন হইতেছে। প্রেতিনী কহিতেছে "ভাই! আমার কি বিবাহ হইবে না, চিরদিনই অবিবাহিত থাকিব?" ভূত কহিতেছে "দিদি! অমুক গ্রামের দরফ খাঁর ভৃত্যকে আগামী কল্য সেই বাড়ীর বুধিয়া গাই শৃঙ্গাঘাতে হত্যা করিবে, সে মরিয়া ভূত হইবে। সেই ভূতের সহিত তোমার বিবাহ দেব।" দরফ খাঁ এই কথা শুনিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন; কিন্তু কাহারও নিকট কোন কথা প্রচার করিলেন না। প্রাতে উঠিয়াই ভৃত্যকে একটী গৃহমধ্যে বদ্ধ করিয়া দ্বারে তালা লাগাইয়া কার্য্য বশতঃ স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় তিনি চাবিটী ফেলিয়া গেলেন তৎপত্নী কুড়াইয়া রাখিলেন। এ দিকে বুধিয়া দড়া ছিঁড়িয়া অত্যন্ত উপদ্রব আরম্ভ করিল। সে যাহাকে দেখে "ফোঁস" "ফোঁস" শব্দে ছুটিয়া গুঁতাইতে যায়। কখন কখন নক্ষত্র বেগে বাটীর বাহির হইয়া গঙ্গাতীর দিয়া ছুটিয়া আসে। দরফ খাঁর পত্নী বেগতিক দেখিয়া গোরুটীকে বাঁধিবার জন্য ভৃত্যকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন। হতভাগা যেমন বুধিয়াকে বন্ধন করিতে যাইবে, বুধিয়া অমনি ছুটিয়া আসিয়া শৃঙ্গাঘাতে তাহাকে হত্যা করিল। এবং শান্ত মূর্ত্তিতে নিজের গোঁজের নিকট যাইয়া দাঁড়াইল। দরফ খাঁ এই সমাচারে দ্রুতপদে বাটী আসিয়া দেখেন ভৃত্য কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে। তিনি কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া সন্ধ্যার পর পুনরায় আবার ধীরে ধীরে সেই শ্মশান ভূমির সন্নিকটস্থ বট-বৃক্ষের তলে যাইয়া উপবেশন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে শুনিলেন—প্রেতিনী কহিতেছে "ভাই! তুমি বলিয়াছিলে দরফ খাঁর ভৃত্য বুধিয়া কর্ত্তৃক হত হইলে ভূত হইবে এবং তাহার সহিত আমার বিবাহ দিবে; কিন্তু কই সে ত ভূত হইল না?" ভূত কহিল "হত্যার পূর্ব্বে বুধিয়া গঙ্গাতীরে ছুটিয়া যাওয়ায় তাহার শৃঙ্গে গঙ্গা মৃত্তিকা লাগে; ঐ গঙ্গা মৃত্তিকা স্পর্শে ভৃত্য উদ্ধার হইয়া গিয়াছে।" দরফ খাঁ এই কথা শ্রবণে মনে মনে কহিলেন—আহা! হিন্দু দেবতা গঙ্গার কি অসীম মাহাত্ম্য! তিনি তৎপর দিনই সংসার পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে আসিয়া গঙ্গার স্তব করিতে লাগিলেন। "সুরধুনি মুনিকন্যে ইত্যাদি" শ্লোক ইহাঁরই রচিত। প্রবাদ আছে ভাগীরথী ইহাঁর স্তবে সন্তুষ্টা হইয়া দক্ষিণ হস্ত-উত্তোলন করিয়া দেখাইয়াছিলেন।

"উঃ! মাগো! দেখা দে মা!" বলিয়া পিতামহ স্ত্রীলোকের ন্যায় কাঁদিতে আরম্ভ করিলে দেবগণ সান্ত্বনা বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন।

নারদ। দরফ খাঁর বাটীর ছাদ নাই কেন?

বরুণ। লোকে বলে বিশ্বকর্ম্মা বাটী নির্ম্মাণ করিতে করিতে রজনী প্রভাত হওয়ায় ছাদ প্রস্তুত করিতে পারেন নাই।

এখান হইতে প্রত্যাগমন সময় এক স্থানে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন "পিতামহ! ঐ যে শিবপুরের সন্নিকটে একটী স্থান দেখিতেছেন, ঐ স্থানের নিম্নে ভাগীরথীর একটী দহকে কালীদহ কহে। ঐ কালীদহে মনসার আজ্ঞায় হনুমান চাঁদ সওদাগরের সপ্তডিঙ্গা জলমগ্ন করিয়াছিল।

এখান হইতে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া সকলে দেখেন সম্মুখে একটী চতুষ্পাঠী রহিয়াছে। উহা দেখিয়া পিতামহ মহাসন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন "আহা! ত্রিবেণীতে সংস্কৃতালোচনা হয় দেখিয়া বড় সুখী হইলাম।"

বরুণ। পিতামহ! এই ত্রিবেণীতে এক সময় বিস্তর টোল ছিল। টোলের পণ্ডিত মৃত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের নামে অদ্যাপিও ত্রিবেণীর গৌরব চলিতেছে।

ব্রহ্মা। জগন্নাথ পঞ্চানন কে, আমাকে সংক্ষেপে বল?

বরুণ। ইনি রুদ্রদেব তর্কবাগীশের পুত্র। রুদ্রদেব শেষ অবস্থায় দ্বিতীয় পক্ষে সংসার করিয়া এই পুত্র রত্ন লাভ করেন। জগন্নাথ পিতার বৃদ্ধ বয়সের পুত্র বলিয়া অত্যন্ত আদরের ছিলেন। বাল্যকালে অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিতেন, স্ত্রীলোকের জলের কলসী ভাঙ্গিয়া দিতেন, অশ্বত্থতলা হইতে পঞ্চানন, বাবাঠাকুর আনিয়া পুষ্করিণীর জলে নিক্ষেপ করিতেন। ইহাঁর স্মরণ শক্তি এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, যাহা একবার পাঠ করিতেন তৎক্ষণাৎ তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া লইতেন। ইনি বালককালে নিজ পিতার নিকট বিদ্যাভ্যাস করেন এবং অচিরাৎ একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হন। ইহাঁর স্মরণ শক্তি এত প্রবল ছিল যে, এক সময় বর্দ্ধমানের রাজা ত্রিলোকচন্দ্র বাহাদুরের নিকট নিমন্ত্রণে যাইলে রাজা জিজ্ঞাসা করেন—"ভট্টাচার্য্য! পথে আসিতে কি দেখিয়া আসিলে?" জগন্নাথ উত্তরে ত্রিবেণী হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বের বৃক্ষ, লতা, জলাশয়, ঘর, দ্বার, দেবালয় প্রভৃতি এমন পর্য্যায়ক্রমে বলিয়াছিলেন যে রাজা লিখিয়া লইয়া লোক দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হন এবং তাঁহার মেধাশক্তির ভূয়সী

প্রশংসা করিয়া পাণ্ডুয়া পরগণার অন্তর্গত হেঁড়ুয়া পোতা নামক এক খানি গ্রাম ও অনেক ব্রহ্মোত্তর জমী এবং তিন শত বিঘা আন্দাজ একটী পুষ্করিণী দান করিয়াছিলেন। ইহাঁর স্মরণ শক্তির আরো একটী দৃষ্টান্ত আছে—এক সময় ইনি ঘাটে বসিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন এমন সময় ইংলণ্ড ও ফ্রান্স-দেশীয় দুই জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নৌকা আসিয়া লাগিল। উহারা উভয়ে কথান্তর সূত্রে বিবাদ করিয়া মারামারি করে, এবং উভয়ে সুপ্রিমকোর্টে অভিযোগ করিয়া জগন্নাথকে সাক্ষী মানে। জগন্নাথ বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া কহেন "আমি উহাদের কথার অর্থ জানি না, তবে যে যাহা বলিয়া বিবাদ করিয়াছে অবিকল বলিতে পারি" বলিয়া আদ্যোপান্ত বিবৃত করিয়াছিলেন। ইনি রাজপ্রতিনিধি ওয়ারেন হেষ্টিংসের আদেশে হিন্দু ব্যবস্থা সংগ্রহ করিয়া "বিবাদ ভঙ্গার্ণব সেতু" নামক একখানি বৃহদাকার ব্যবস্থা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গবর্ণমেন্ট হইতে মাসিক পঞ্চশত মুদ্রা বৃত্তি লাভ করেন। সার, উইলিয়ম জোন্স ইহাঁর নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিতেন। ইহাঁর জীবদ্দশায় কলিকাতা ও হুগলি হইতে বড় বড় সাহেবেরা জগন্নাথের নিকট ত্রিবেণীতে পরামর্শ লইতে আসিতেন। ইনি এক শত ত্রয়োদশ বৎসর জীবিত থাকিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

দেবগণ বাজারে আসিয়া দেখেন পাণ্ডারা হরিধ্বনি করিতেছে। কারণ বারোয়ারি তলায় যাত্রার দল উপস্থিত। চাহিয়া দেখেন গোঁপ কামান কাল কাল নিম্নেগুলো এবং স্ত্রীলোকের ন্যায় মস্তকে চুল ছেলেগুলো দাঁড়াইয়া আছে। বরুণ কহিলেন "উহারাই যাত্রার দলের লোক।"

দেবতারা পুনরায় ভাগীরথীতে সন্ধ্যা আহ্নিক করিতে চলিলেন। উপ দোকান ঘরে তাঁহাদের দ্রব্যাদি আগলাইবার জন্য বসিয়া রহিল। নদীতে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন "বাম দিকে দেখা যাইতেছে ডাকাইতে ডুমুর দহ। এক সময় ঐ স্থানের বালক বৃদ্ধ সকলেই ডাকাত ছিল। ভদ্রলোকেরা বাটীতে অতিথিদিগকে বাসা দিয়া রজনীতে প্রাণ সংহার করিত। মৎস্যজীবীরা মৎস্য ধরিত এবং রজনীতে নৌকায় বোম্বেটেগিরি করিত। ফলতঃ সেই সময় কি জলপথ কি স্থলপথ কোন পথেই ডুমুরদহের নিকট দিয়া গেলে লোকের নিস্তার ছিল না। প্রায় ৬০ বৎসর অতীত হইল বিখ্যাত ডাকাইত বিশ্বনাথ বাবু এই স্থানে বাস করিতেন। ইহাঁর অধীনস্থ ডাকাইতেরা নৌকাযোগে যশোহর পর্য্যন্ত ডাকাইতি করিয়া বেড়াইত। পরে মত্ত অবস্থায়

বিশ্বনাথ বাবু কতিপয় সঙ্গীর সহিত ধৃত হইলে ফাঁসিতে প্রাণদণ্ড হয়। যে বাড়িতে তিনি বাস করিতেন, উহা গঙ্গাতীরের সন্নিকটস্থ একটী দোতালা কোঠা। ঐ বাড়ীর ছাদ হইতে গঙ্গার বহু দূর পর্য্যন্ত কোথায় কে আছে দেখিতে পাইতেন।

নারা। বাবু ডাকাইত!!

বরুণ। হঁ্যা ভাই! ইনি অগ্রে সংবাদ দিয়া শিবিকারোহণে ডাকাইতি করিতে যাইতেন। এক সময় আশানন্দ ঢেঁকী এই ডুমুরদহে বড় রঙ্গ করিয়াছিলেন।

ইন্দ্র। আশানন্দ ঢেঁকী কি?

বরুণ। ইনি অত্যন্ত বলবান পুরুষ ছিলেন এবং দুই হস্তে দুটী ঢেঁকী তুলিয়া অবলীলাক্রমে ঘুরাইতে পারিতেন বলিয়া ঢেঁকী উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি লেখা পড়া তাদৃশ জানিতেন না। অনেকে বলে—শান্তিপুরে ইহঁার বাড়ী ছিল। কিন্তু গুপ্তিপাড়ায় বিবাহ করাতে সচরাচর শ্বশুরালয়ে বাস করিতেন এবং ঐ স্থানের বৃন্দাবনচন্দ্র নামক বিগ্রহের বাড়ীতে ৪।৫ টাকা বেতনে গমস্তাগিরি কর্ম্ম করিতেন। এক সময় আশানন্দ হুগলি হইতে বৃন্দাবনচন্দ্রের কয়েক শত টাকা লইয়া গুপ্তিপাড়ায় প্রত্যাগমন কালে ডুমুরদহের দীঘির ধারে বসিয়া ফলার করিতেছিলেন, পশ্চাতে চাহিয়া দেখেন দুই জন লাঠিয়াল দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহারা কেন দণ্ডায়মান রহিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে কহে "ডুমুরদহে কিসের ভয় তাহা কি তুমি জান না?" হঁ্যা হঁ্যা জানি, দাঁড়া এই কয়টা খেয়ে নিই। বলিয়া আশানন্দ আহার সমাপনান্তে দীঘির জলে মুখ হাত প্রক্ষালন করিয়া যেমন উপরে উঠিতেছিলেন, ডাকাইতেরা তাঁহাকে ঘন ঘন আঘাত করিতে লাগিল। তখন আশানন্দ তাহাদিগের প্রতি চাহিয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক উভয়ের হস্ত হইতে যষ্টি কাড়িয়া লইয়া দুই জনকে দুই বগলে করিয়া গুপ্তিপাড়ায় উপস্থিত হইলেন এবং শ্বশুরকে কহিলেন কি দুটী জন্তু ধরিয়া আনিয়াছি প্রদীপ আনিয়া দেখুন। শ্বশুর প্রদীপ আনিয়া দেখেন দুটী লোক অচৈতন্য অবস্থায় আছে। তৎপরে আশানন্দ তাহাদের চোখে মুখে জলের ছিটা দিয়া চৈতন্য সম্পাদন করাইয়া উত্তমরূপ আহার করিতে দিলেন। কিন্তু বিদায় কালে পাছে তাহারা পুনরায় মনুষ্য হত্যা করে, এই আশঙ্কায় দুই জনেরই দুই খানি করিয়া হস্ত ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন।

ব্রহ্মা। বরুণ! আশানন্দ কি বলবান পুরুষই ছিল! আমার বোধ হয় সে রীতিমত যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিলে কলির ভীম হইতে পারিত। বরুণ! আর কি তেমন ঢেঁকী ঢেকী জন্মে?

বরুণ। এক্ষণে বিদ্যার ঢেকী বিস্তর পাওয়া যায়, বলের ঢেঁকী অতি বিরল। হয়েছে কি জানেন—আর কেহ কুস্তি কি ব্যায়াম শিক্ষা করে না। তদ্ভিন্ন পূর্ব্বের ন্যায় নির্জ্জল দুগ্ধ ও খাঁটি গাভি ঘৃতও কাহারও পেটে পড়ে না; সুতরাং ঢেঁকী জন্মিলেও সাধারণে প্রকাশ পায় না।

দেবগণ সন্ধ্যা আহ্নিক সমাপ্ত করিয়া দোকানঘরে আসিয়া জলযোগ করিলেন এবং অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সকলে বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্বর্গ হইতে কত টাকা আনিয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত কত খরচ হইয়া কত আছে এবং যাহা আছে, তাহাতে আর কত দিন চলিতে পারে। এ বিষয়ের মুখে মুখে একটা হিসাব করিলেন।

ক্রমে বাজারে লোকে লোকারণ্য। বারোয়ারি তলায় যাত্রা বসিয়াছে। খুলিয়া "ঘা ঘিচা" "ঘা ঘিচা" শব্দে খোল বাজাইতেছে। পিতামহ "উপ! উঠ যাত্রা শুন্তে যাই" বলিয়া উপকে তুলিলেন এবং সকলে আসরে গিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহারা গিয়া বসিবার অব্যবহিত পরেই সাজানে কৃষ্ণ আসিয়া আসরে দেখা দিলেন। তাহার ম্যালেরিয়া জ্বরে পেটে প্লীহা যকৃৎ থাকায় পেটটা মোটা হইয়াছিল। গাত্রের বর্ণে প্রকৃতই কৃষ্ণ। পরিধান ছেঁড়া নেকড়ার পীত ধড়া। বক্ষে শ্বেত চন্দনের ধ্বজ-বজ্রাং-কুশ চিহ্ন। মস্তকে শোলার চূড়া। হস্তে এক গাছি লাল ছড়ি। ছেলেটা আসিয়া দেবগণের সম্মুখে ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার ভঙ্গী দেখিয়া দেবগণ হাস্য করিতে লাগিলেন; নারায়ণ কিছু লজ্জিত হইলেন। এই সময় খুলিয়া আবার বাদ্য আরম্ভ করিল—"তাক্ তাক্ তাক্ তাক্তা ধিনা" "ধিচাং ধিনা তাকতা ধিনা" অমনি কৃষ্ণ মুখে হাত দিয়া "আয় আবু আবু ধবলি। মা ননী দে।" শব্দ করিয়া, তালে তালে পা ফেলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। পিতামহ নৃত্য দেখিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। দেবরাজ, নারায়ণের কাণে কাণে কহিলেন "ভাই, পেটের জ্বালা ধরিলে তুমি কি ঐ বেশে ঐরূপ নৃত্য করিয়া ননী চাহিতে?"

নারা। বাঃ! তা চাব কেন? বাঙ্গালীদের যত অন্যায়। আমাকে

তাহারা দেবতা বলিয়া পূজা করিতেও ছাড়ে না, এবং স্থল বিশেষে সং সাজাইয়া বানর নাচেও দেখিয়া থাকে।

এই সময়ে আটচালার বাহিরে এক পাল ছেলে গান ধরিল। ক্রমে দলটা গান করিতে করিতে আসরে আসিয়া দেখা দিল। তৎ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গোঁপ কামান স্থূলাকায় কৃষ্ণবর্ণের দূতীও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে আসরে আসিয়া এই ভাবে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন যেন রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছে। সাজান কৃষ্ণ উঠিয়া এক প্রান্ত হইতে কহিল—" বৃন্দে ও বৃন্দে, বলি কথা কও ? " দূতি ও দূতি বলি কথা কও, দুটো কথা কবার দোষ কি ? বৃন্দে ও বৃন্দে—

বৃন্দে অমনি বৃহৎ চক্ষু দুটো ঘুরাইয়া, ডাইনে বামে সেই সমস্ত ললিতা বিশখা প্রভৃতিকে লইয়া লণ্ঠনের দিকে চাহিয়া দুই হস্ত বিস্তার করত দেবগণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অতি মৃদু স্বরে গান ধরিল ;—

কৈব কি কথা, নহে কবার কথা,
কইলে কথা লোকে বলে কত কথা। ২।

(পুনশ্চ ঘাড় হেট করিয়া, হস্ত নাড়িয়া অতি সযোরে)—

কৈব কি কথা, নহে কবার কথা,
কইলে কথা লোকে বলে কত কথা।
করলে তোমার নাম,হয় হে দুর্নাম,
সে বদনামে শ্যাম তোলা যায় না মাথা ॥
কইলে কথা যদি কেহ দেখতে পায়,
কিম্বা লোক মুখে যদি শুন্তে পায়,
যে প্রকারে হউক যদি প্রকাশ পায়,
হবে নিরুপায়, সে বড় লজ্জার কথা ॥

শ্রোতৃবর্গ এই সময় চতুর্দ্দিক হইতে " হরি হরি বল ভাই " বলিয়া " হরি হরি বল " বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। নারায়ণ চটিয়া আগুন। তিনি দেবগণকে কহিলেন " আপনারা যাত্রা শুন্থন, আমি চল্লাম। কি বলবো আজ যদি জীবিত থাকিতাম, তাহা হইলে বেটাদের নামে ডিফামেসন অব ক্যারেক্টরের দাবিতে নালিশ করিয়া আচ্ছা জব্দ করিতে পারিতাম। " বলিয়া গাত্রোত্থান করিয়া চলিয়া যাইলেন। দেবগণের ভাগ্যেও আর গান শোনা হইল না পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

প্রাতে দেবতারা গঙ্গাস্নান করিয়া নগরা অভিমুখে চলিলেন। তাঁহারা বারোয়ারি তলার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখেন লোকে লোকারণ্য, সকলেই এক বাক্যে কহিতেছে গান বড্ডো জমেছে। তাঁহারা শুনিলেন আটচালার মধ্যে বালকগণ নাচিতে নাচিতে এই গানটী ধরিয়াছে ;—

আর আমি যাব না সখি ! যমুনার জলে।
নিতান্ত লম্পট কৃষ্ণ কলসী দেয় ফেলে।
দূতি ! কাঁকের কলসী দেয় ফেলে।

নারা। উৎসন্ন যাও।

ব্রহ্মা। বরুণ ! অবতার হ'ল বৃন্দাবনে এরা এত পেয়ে বসলো কেন ?

সকলে ত্রিবেণীর বাহিরে যাইলে বরুণ কহিলেন "এই ত্রিবেণী এক সময় জনাকীর্ণ নগর ছিল। তখন ইহার শোভা সমৃদ্ধির পরিসীমা ছিল না। সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রণীত প্রায়শ্চিত্ত তত্বে লিখিত আছেঃ—

" প্রদ্যুম্নসা হ্রদাৎ যাম্যে সরস্বত্যাস্তথোত্তরে।
তদ্দক্ষিণপ্রয়াগস্তু গঙ্গাতো যমুনা গতা॥
স্নাত্বা তত্রাক্ষয়ং পুণ্যং প্রয়াগ ইব লভ্যতে॥"

এক সময় এখানকার জল হাওয়া বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল। সেই সময় কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের জমীদারেরা এখানে স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য আসিয়া বাস করিতেন। এবং এখান হইতে পানীয় জল লইয়া যাইতেন। এই স্থান যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ভাল ছিল, তাহা অনেক পুস্তকাদিতেও দেখিতে পাওয়া যায় ; কারণ ৩৩৫ বৎসর হইল কবিকঙ্কণ স্বরচিত কাব্য মধ্যে ত্রিবেণী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;—

সপ্ত গ্রামের বেণে সব কোথাও না যায়।
ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়॥
তীর্থ মধ্যে পুণ্য তীর্থ অতি অনুপম।
সপ্ত ঋষি শাসনে বলয়ে সপ্তগ্রাম॥
কাণ্ডারের বচনে করিয়া অবগতি।
ত্রিবেণীতে স্নান করেন সাধু ধনপতি॥
নায়ে তুলে সদাগর নিল মিঠা পানী।
বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন ফরমানী॥

ব্রহ্মা। কবিকঙ্কণ কে ?

বরুণ। ইহাঁর অপর নাম মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী। ইনি বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী দামুন্যা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম হৃদয় মিশ্র। যদি চ ইহাঁদের প্রকাশ্য উপাধি মিশ্র কিন্তু এতদ্দেশে চক্রবর্ত্তী উপাধিতেই বিখ্যাত। ইনি জীবনের প্রথমাবস্থায় বিশেষ কষ্ট পাইয়াছিলেন শেষাবস্থায় রাজা রঘুনাথ রায়ের দ্বারা প্রতিপালিত হন। এবং তাঁহারই আদেশে চণ্ডী কাব্য রচনা করেন। ইনি বাঙ্গালা ভাষায় এক জন প্রধান কবি। সম্রাট আকবরের সময় ইনি জীবিত থাকিয়া জাহাঙ্গীরের রাজ্যারম্ভ কালে প্রাণত্যাগ করেন।

নারা। ত্রিবেণীর অপরাপর বিষয় বল?

বরুণ। সরস্বতীর খালে অদ্যাপি মৃত্তিকা খনন করিবার সময় অনেক গুলবৃক্ষ, জীর্ণ নৌকা ভাঙ্গা তক্তা ও শৃঙ্খলাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রামের কোন কোন অংশে মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে অনেক ইষ্টকাদি ও অট্টালিকাদির চিহ্ন দৃষ্ট হইয়াছে। ফলতঃ কাল সকল সময়ে সকল স্থানকে এক ভাবে রাখে না। কালের স্রোতে ত্রিবেণী এক্ষণে অরণ্য পূর্ণ ও মনুষ্যবিহীন হইয়াছে। দুর্দান্ত ম্যালেরিয়া গ্রামস্থ অপর লোকগুলিকে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এখানকার লোকের চরিত্র সাধারণতঃ মন্দ নহে। মাতাল অপেক্ষা গেঁজেলের সংখ্যা বেশী। ত্রিবেণীতে গ্রহণ ও উত্তরায়ণের সময় বিস্তর যাত্রী গঙ্গাস্নানে আসিয়া থাকে। চলে আসুন টিকিটের ঘণ্টা দিয়াছে।

দেবগণ দ্রুতপদে যাইয়া টিকিট লইতে না লইতে ট্রেণ আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলে তাড়াতাড়ি টিকিট খরিদ করিয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন। ট্রেণ আবার নক্ষত্র বেগে হুপাহুপ শব্দে ছুটিতে লাগিল।

উপ। ঠাকুর কাকা "কলসী দেয় ফেলে" ও গানটা তোমার মনে আছে?

নারা। আরে জেঠা ছেলে! তুই কি চুপ করে বসে থাকতে পারিস নে?

ক্রমে ট্রেণ হুগলিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবগণ গেটে টিকিট দিয়া বাহিরে আসিলেন এবং একখানি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিয়া নগরাভিমুখে চলিলেন।

হুগলি।

বরুণ। হুগলি এক সময় অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। ইহার পূর্ব্ব

নাম গোলিন; কিন্তু ক্রমে ক্রমে শেষড় ন কারের লোপ হইয়া গোলি তৎপরে হুগলি নাম হইয়াছে।

এই সময় গাড়ি একটী বৃহদাকার বাগানের নিকট উপস্থিত হইলে নারায়ণ কহিলেন " বরুণ! এ বাগানটী কাহার? "

বরুণ। এই বাগানটীর নাম জীবন পালের বাগান। বাগানটী আয়তনে অত্যন্ত বৃহৎ। পূর্ব্বে এই বাগানের সন্নিকটে অত্যন্ত দস্যু ভয় ছিল।

ইন্দ্র। ওদিকে দেখা যাইতেছে ও বাড়িটী কাহার?

বরুণ। জজ সাহেবের বাড়ী। উহার সন্নিকটস্থ ঐ বাড়ীটী রেভারেণ্ড লালবিহারী দের। দূরে দেখ সিঙ্গুরের নব বাবুর বৈঠকখানা। পূর্ব্বে ঐ বৈঠকখানায় হুগলির নর্ম্মাল স্কুল বসিত। এক্ষণে নর্ম্মাল স্কুল চুচুড়ার বারিকের মধ্যে বসিতেছে।

ব্রহ্মা। বরুণ! তুমি বলিলে—রেভারেণ্ড লালবিহারী দে। ঐ নামের সমস্তই বাঙ্গালা কিন্তু নামের পূর্ব্বে একটী ইংরাজী কথা বসিবার কারণ কি?

বরুণ। আজ্ঞে! ইনি খ্রীষ্টান হওয়াতে ঐ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি বঙ্গদেশের মধ্যে একজন উপযুক্ত লোক। ইহার বিশেষ গুণ—সাধারণ প্রজাবর্গের দুঃখে বড় কাতর হন এবং তাহাদের দুঃখ দূর করিতেও সাধ্যমত চেষ্টা করেন।

ব্রহ্মা। লালবিহারি দের জীবন বৃত্তান্ত আমাকে সংক্ষেপে বল?

বরুণ। ইনি ১৮২৬ অব্দে বর্দ্ধমানের সন্নিকটস্থ পলাশী নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথমে ইনি কলিকাতার " জেনেরল এসেমব্লি ইনষ্টিটিউসন " নামক বিদ্যালয়ে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ১৮৪৩ অব্দে ইনি খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষা লন এবং তৎপরে ৬ বৎসর কাল বিজ্ঞান শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৮৫১ অব্দে ইনি ধর্ম্ম প্রচারকের পদ প্রাপ্ত হন এবং ১৮৫৫ অব্দে ধর্ম্ম যাজকের পদে বৃত হইয়াছেন। ইহার পর কয়েক বৎসর কাল্নার প্রচার কার্য্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। ১৮৬০ অব্দে হেদুয়ার গির্জ্জায় ধর্ম্মযাজকের পদে নিযুক্ত হন। ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধে ইংরাজী ভাষায় অনেকগুলি বক্তৃতা করিয়া ক্রমে তাহা পুস্তকাকারে প্রচার করিয়াছেন। ইতি পূর্ব্বে ইনি বাঙ্গালা ভাষায় বৈদান্তিক মত সম্বন্ধেও এক খানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচার জন্য অরুণোদয় নামক এক খানি পত্রের প্রায় দুই বৎসর কাল সম্পাদক ছিলেন। ১৮৬০ অব্দে কলিকাতায় আসিয়া

ইণ্ডিয়ান রিফমার ও ফ্রাইডে রিভিউ নামক দুই খানি সাপ্তাহিক ইংরাজী পত্র প্রচার করেন। ১৮৬৭ অব্দে ইনি বহরমপুর কলেজের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৭২ অব্দে হুগলি কলেজে বদলি হইয়াছেন। ১৮৭৬ অব্দে অধ্যাপকতা পদে নিযুক্ত হইয়া শিক্ষা বিভাগের চতুর্থ শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন। ইনি সাধারণ প্রজাবর্গের দুঃখে কাতর; ইনি সাধারণ লোকের শিক্ষা সম্বন্ধে প্রাইমারি এডুকেশন অব বেঙ্গল নামক এক খানি পুস্তক লিখিয়াছেন। ইহাঁর প্রণীত গোবিন্দ সামন্ত নামক এক খানি ইংরাজী উপন্যাস পুস্তকে প্রজাদিগের অবস্থা অতি সুন্দর ও বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ইংলণ্ডে অতি সমাদরের সহিত গৃহীত হইয়াছে। এক্ষণে ইনি বেঙ্গল ম্যাগ-জিন নামক এক খানি ইংরাজী মাসিক পত্রের সম্পাদক।

ক্রমে দেবগণের গাড়ি অরণ্যপূর্ণ অসংখ্য ডোবা ও বন জঙ্গলের নিকট দিয়া আসিয়া হুগলির চকের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাঁহারা দেখেন দোকানে নানা প্রকার দ্রব্যাদি বিক্রয় হইতেছে। কোন দোকানে কাঁদি কাঁদি কলা টাঙ্গান রহিয়াছে। কোন দোকানে শ্লেট, পেন্সিল, বটতলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক ও কালী দুর্গার পট বিক্রয় হইতেছে। কোন দোকানে হালদার মহাশয় কচুরির মধ্যে বুটের ডাল বাটা প্রবেশ করাইয়া হস্তে চেপটাইয়া উত্তপ্ত ঘৃতে ছাড়িতেছেন। কোন দোকানে বস্ত্রবিক্রেতারা গজে বস্ত্র মাপিয়া কপালে ঘসিয়া চিহ্ন করিয়া সযোরে "ফাঁস ফাঁস" শব্দে ছিন্ন করিতেছে। রাস্তায় স্কুলের ছেলেরা বাহির হইয়াছে, কোন দুষ্ট বালক অপর বালককে প্রহার করাতে সে কাঁদিতেছে এবং স্কুলে যাইয়া মাষ্টারকে বলিয়া দিবে বলিয়া ভয় দেখাইতেছে। ক্রমে দেবগণের গাড়ি হুগলির কালেক্টরির সন্নিকটে উপস্থিত হইলে তাঁহারা গাড়োয়ানদিগকে বিদায় দিয়া একটা দোকান ঘরে যাইয়া উপবেশন করিলেন।

ইন্দ্র। বরুণ! সম্মুখে ঐ সুগভীর নদীর আকার দেখা যাইতেছে উহা কি?

বরুণ। মুসলমান রাজত্বকালে হুগলিনগর সৌন্দর্য্যে প্রায় মুরশিদা-বাদের সমকক্ষ ছিল। সেই সময় এখানে এক জন ক্ষত্রিয়া ফৌজদার বাস করিতেন। ঐ ফৌজদারের অধীনে অনেকগুলি ক্ষত্রিয়া সৈন্য থাকিত; তদ্ভিন্ন তাঁহারা এখানে একটা সুদৃঢ় গড় খনন করাইয়াছিলেন। সেই গড়ের সুগভীর খাত অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

দেবগণ কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর স্নান করিতে চলিলেন। সকলে একটী বাঁধাঘাটে উপস্থিত হইলে পিতামহ কহিলেন "বরুণ এ সুন্দর ঘাটটী নির্ম্মাণ করে কে?"

বরুণ। স্মিথ নামক এক জন সাহেবের যত্নে ও উদ্যোগে এই ঘাটটী নির্ম্মিত হয় বলিয়া ইহাকে স্মিথ সাহেবের ঘাট কহে। এই ঘাট প্রস্তুত করিবার সময় হুগলি জেলার যাবতীয় জমীদার সাহায্য করিয়াছিলেন। জমীদারদিগের মধ্যে ভাস্তাড়ার সিংহ বাবুরা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী টাকা চাঁদা দেওয়াতে তাঁহাদের বাড়ীর দ্বারে শাস্ত্রি পাহারা থাকিবার হুকুম হয়।

ঘাটে নামিয়া দেবগণ স্নান আহ্নিক সারিলেন এবং বাসায় আসিয়া চাউলে ডাইলে চাপাইয়া দিলেন। পিতামহ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন "মর্ত্ত্যে আসিয়া ক্রমেই কাল বিলম্ব হইতে চলিল। জানি না যে, আমার বাটীতে কি হইতেছে। গিন্নি মাগী একা, অসুখ হইলে কেবা ওষুধ দেবে, কেবা পথ্য দেবে! আবার খড় কুটো গুলোর সময় বাড়ী হইতে আসায় বিস্তর ক্ষতিও হইবার সম্ভাবনা। গোরু গুলো হয় ত সময়ে ঘাস জল পাবে না, হাঁস গুলোকে হয় ত শিয়ালে মেরে ফেলিবে।

উপ। আমার শালিক পাখিটীর ও বেজির বাচ্ছাটীর যে কি হচ্চে ভেবে কিছু ঠিক পাচ্চি নে। বাড়ীতে যে বিড়ালের উপদ্রব না খেয়ে ফেলে! বাবার যেমন বুদ্ধি রেলওয়েতে চাকরী করতে পাঠালেন। রেলওয়েতে শত শত শনি বিরাজ কচ্চেন তার খোঁজ রাখেন না।

আহারান্তে দেবগণ কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া জজ সাহেবের কাছারির নিকট আসিয়া দেখেন—ভোলানাথ হালদার, কাশীনাথ সেন এবং মাধব ময়রার নাতী পদ্মনাথ ময়রা জুরি সাজিয়া আদিগা বটতলাতে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চেন। ক্রমে জজ সাহেব আসিলেন, বিচার আরম্ভ হইল। তখন জুরিরা যাইয়া নিজ নিজ স্থান দখল করিয়া বসিলেন। দেবগণ দেখেন বিচার আরম্ভ হইলে কাশীনাথ সেন নাসিকা ধ্বনি করিয়া নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। কাশীনাথকে নিদ্রা যাইতে দেখিয়া ভোলানাথ হালদার গা ঠেলিয়া কহিল "কাশীনাথ জেঠা করচো কি? সাক্ষীরা কি বলে না শুনলে এর পর বিচার করবে কেমন করে?"

কাশীনাথ "হ্যাঁ!" শব্দে উত্তর দিয়া তুড়ি দিতে দিতে কহিল "আহারের পর নিদ্রা যাওয়াটা অভ্যাস থাকায় একটু তন্দ্রা আসছিল। তুমিই বাবা

ভাল করে শোন, তার পর তুমিও যা বলবে আমিও তাই বলবো। ঐ কথা দুটো কি?—একটা "নট গিলটী" আর একটা "গিলটী" কেমন নয়?"

এখান হইতে বাহিরে আসিয়া দেবগণ দেখেন আমলা মোক্তার এবং উকীলের দল একটি বাবুকে লইয়া ব্যঙ্গ করিতেছেন। এক জন মোক্তার কহিতেছেন "মহাশয়েরা এই বাবুটাকে ভাল করিয়া দেখিয়া রাখুন। পারেন ত গোবরের ছাঁচ করিয়া উহার মূর্ত্তি থাম্‌য় তুলিয়া লউন। ইনি এক জন কম লোক নহেন; যেহেতু লোকে পিতৃ ঋণ পরিশোধ করিতে পারে না। কিন্তু ইনি পিতৃ ঋণ পরিশোধ করিয়া কিঞ্চিৎ ফাজিল হওয়ায় ডিক্রি করিয়া বাপের বাড়ী ঘর বিক্রয় করিয়া লইবার জন্য নালিশ করিয়াছেন।

ব্রহ্মা। বরুণ! কাণ্ডখানা কি?

বরুণ। ঐ বাবুটী এক সময় পিতার সহিত বিবাদ করিয়া বাটী হইতে চলিয়া যান। বাটী হইতে প্রস্থান করার অব্যবহিত পরে উহার কমিসরিয়েটে কর্ম্ম হয়। এই কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া বাবু বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, কিন্তু পিতার উপর রাগ থাকায় পাছে তাঁহার মুখ দর্শন করিতে হয়, এই আশঙ্কায় আর পিতৃভবনে যাইলেন না। স্বতন্ত্র বাস করিবার জন্য ঐ গ্রামে একটা সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইলেন এবং ক্রমে ক্রমে বাবুর বাগান বাটী, ঠাকুর বাটী, প্রমোদকানন স্কুলবাটী প্রস্তুত হইলে দ্বারে পাহারা বসাইয়া তাহাকে আজ্ঞা দিলেন—বাবা যদি কখন কিছু দেখিতে আসে, গলা ধাক্কা দিয়া বিদায় করিয়া দিস্। পিতা পুত্রের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া সুখী হইলেন, কিন্তু তাহার বাড়ী ঘর একটা বার চক্ষে দেখিবার জন্য ইচ্ছা হইলেও অপমানের ভয়ে দেখিতে সাহসী হইলেন না। পুত্র পিতার বাসস্থান (দুটী কুঠারি) কিরূপে কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দিবেন এই চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন। দৈবক্রমে পিতার কোন বিষয়ের জন্য কিছু অর্থের প্রয়োজন হইলে, পুত্র বেনামীতে পিতার বাটী বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ দেন। এক্ষণে সেই টাকা সুদে আসলে আদায় করিয়া লইবার জন্য পিতার নামে নালিশ করিয়াছেন।

ব্রহ্মা। উঃ! কি পাষণ্ড! হতভাগার মুখ দেখলে পাপ হয়। বরুণ! অন্য স্থানে চল।

উপ। কর্ত্তা জেঠা একটু দাঁড়াবে?

ব্রহ্মা। কেন?

উপ। আমিও গোবর এনে বাবুর একটা ছাঁচ তুলে নিয়ে যাই।

বরুণ। পিতামহ! ওদিকে দেখুন হুগলি ব্রাঞ্চস্কুল। ঐ স্থানে পূর্ব্বে খাঁ জাহা নামক এক জন ফৌজদারের আবাস বাটী ছিল।

ইন্দ্র। বরুণ! ওদিকে দেখা যাচ্ছে ওটা কি?

বরুণ। উহার নাম ব্যাণ্ডেল চর্চ্চ। ঐ চর্চ্চটী ১৫৯৯ অব্দে খ্রীষ্টান-দিগের দ্বারা নির্ম্মিত হয়। উহার চূড়া অনেক দূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।

এখান হইতে যাইয়া দেবতারা এমামবাড়ার বাটীতে প্রবেশ করিলেন এবং কয়েকজন ফ্যাক্কামুখো হইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিলেন। দেখেন—বাড়াটী দুই তালা। বাটীর মধ্যস্থলে একটী পুষ্করিণী ক্রমে সকলে এমামবাড়ার বিস্তৃত দালানে গিয়া উঠিয়া দেখেন, নানা রঙ্গের ঝাড়, লণ্ঠন, আয়না, দেয়ালগিরি দ্বারায় অতি সুন্দররূপে সুসজ্জিত করা। প্রাচীরে কোরাণের বর্ণিত মত নানা রঙ্গে, নানা বিবরণ পারসী অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। দ্বারে গিলটী করা স্বর্ণাক্ষরে এমামবাড়ার বিবরণ সকল লেখা হইয়াছে।

নারা। বরুণ! প্রাচীরের এ দিকে এ সব কি লেখা রহিয়াছে?

বরুণ। হাজি মহম্মদ মহসীন নামক এক জন ধনী মুসলমানের দানের বিষয়।

ব্রহ্মা। আমাকে পাঠ করিয়া শোনাও।

বরুণ। মহম্মদ মহসীন লিখিতেছেন—আমার নাম হাজি মহম্মদ মহ-সীন। আমার পিতার নাম হাজি ফৈজুল্লা। এই হুগলি নগরে আমার আবাস ভূমি। আমি সুস্থ ও সচ্ছন্দ শরীরে স্বেচ্ছামত লিখিয়া দিতেছি যে, যশোহর প্রভৃতি স্থানে আমার যে সমস্ত জমীদারি আছে, এবং হুগলিতে যে বাজার হাট আছে আমি ঐ সমস্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকারীর অভাবে ঈশ্বরের কার্য্যেই বিনিযোজিত করিলাম, আমার জীবিতাবস্থায় আমার দ্বারায় যে সমস্ত দান কার্য্য নির্ব্বাহ হইত, আমার মৃত্যুর পর ঐ সমস্ত বিষয় হইতে তদ্রূপ হইতে থাকিবে। ঐ সমস্ত দান কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ জন্য আমি দুই জন মাতোয়ালি (পর্য্যবেক্ষক) নিযুক্ত করিলাম। ইহাঁরা উভয়ে পরামর্শ করিয়া

সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। আমার বিষয়ের আয় হইতে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বাদ বাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা নয় অংশে বিভক্ত হইবে। ঐ অংশের তিন অংশ মহরমের দিবসের ও অন্যান্য উৎসব দিবসের জন্য ও ইমামবাড়া ও মসজিদ মেরামত জন্য ব্যয়িত হইবে। দুই অংশ মাতয়ালিদিগের নিজ ব্যয়ার্থ প্রদত্ত হইবে। চারি অংশ হইতে সরকারী লোক জনের বেতন দান এবং অপর এক অংশ হইতে মাসিক বৃত্তি দান করা হইবে। মাতয়ালিরা লোক জন নিযুক্ত বা পদচ্যুত করিতে পারিবেন, এবং আপনাদিগকে অক্ষম বিবেচনা করিলে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া কার্য্য চালাইতে পারিবেন। এতদর্থে আমি এই দানপত্র লিখিয়া দিলাম। আবশ্যক হইলে ইহা বিচারালয়ে আমার নিদর্শন দলিল স্বরূপ হইবে। লিখিত তারিখ ১৯ এ বৈশাখ, ১২২১ হিজিরা, ও ১২১৩ সাল।

সকলে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ইমামবাড়ার চতুর্দ্দিক দেখিয়া যেমন বহির্গত হইলেন, অমনি ঘড়িতে "চং" "চং" শব্দে দুইটা বাজিল।

ইন্দ্র। বরুণ! এমন ঘড়ির শব্দ ত কুত্রাপি শুনি নাই।

বরুণ। হাঁ৷ ভাই, এই ইমামবাড়ার ঘড়িটী বড় বিখ্যাত। এই ঘড়ির শব্দ লোকে প্রায় ২। ৩ ক্রোশ দূর হইতে শুনিতে পায়। পিতামহ! এই হুগলি নগরেই প্রথমে ছাপাখানার সৃষ্টি হয়। হলহেড ও উইলসন সাহেব সর্ব্ব প্রথমে ঐ প্রেসে বাঙ্গালা ব্যাকরণ মুদ্রিত করেন। ১৮৭৮ অব্দে ঐ মুদ্রাযন্ত্রটী এনড্রুস নামক এক জন পুস্তক বিক্রেতা করিয়াছিল।

ইন্দ্র। মুদ্রাযন্ত্র কি পূর্ব্বে ভারতে ছিল না?

বরুণ। ছিল না কে বলিল? রাজপ্রতিনিধি ওয়ারেন হেষ্টিং সাহেবের শাসনকালে বারাণসী জেলার সন্নিকটস্থ স্থানে মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে একটী মুদ্রাযন্ত্র ও কতকগুলি অক্ষর বাহির হয়। ঐ মুদ্রাযন্ত্র দৃষ্টে স্থির হইয়াছে প্রায় এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন ছিল পরে যবনাধিকার কালে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান মুদ্রাযন্ত্র সকল ইংরাজেরা এদেশে আনিয়াছেন।

এখান হইতে কিছু দূরে যাইলে উপ চীৎকার করিয়া কহিল "বরুণ কাকা, বরুণ কাকা, এটা কি?"

বরুণ। পিতামহ, হুগলির জেল দেখুন। জেলখানার সন্নিকটে ঐ যে ঘাট দেখিতেছেন উহার নাম ঘোল ঘাট। এই ঘাটের সন্নিকটে ১৫৪০ খ্রীঃ

অব্দে পর্টুগিজেরা একটী কেল্লা নির্ম্মাণ করেন। কেল্লাটী এক্ষণে গঙ্গাগর্ভে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এক্ষণেও জাহ্নবীগর্ভে কেল্লাটীর কোন কোন অংশ দেখিতে পাওয়া যায়।

নারা। পরপারে দেখা যাইতেছে উহা কি?

বরুণ। গরিফা নামক স্থানের চটের কল। ঐ গরিফা একটী বৈদ্য প্রধান স্থান। ঐ স্থানে দেওয়ান রামকমল সেন জন্ম গ্রহণ করেন।

ব্রহ্মা। দেওয়ান রামকমল সেনের জীবন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বল?

বরুণ। ইহাঁর পিতার নাম গোকুলচন্দ্র সেন। ১৭৮৩ অব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। রামকমল সেন প্রথমে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ১৮০৪ অব্দে এসিয়াটিক সোসাইটীতে ইহাঁর ১২ টাকা বেতনে একটী কেরাণীগিরি কর্ম্ম হয়। ইহার পর ইনি কার্য্যদক্ষতাগুণে কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের সেক্রেটারি ও কাউন্সিলের মেম্বর পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে ইনি ইংরাজি ভাষায় বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করেন এবং কলিকাতায় টাঁকশালে দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন। ইহার পর ইনি বেঙ্গল ব্যাঙ্কেরও দেওয়ান হইয়াছিলেন। ১৮১৭ অব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। ঐ বৎসরেই স্কুলবুক সোসাইটী খোলা হইয়াছিল। রামকমল সেন হিন্দুকলেজের ম্যানেজিং কমিটীর মেম্বর থাকিয়া এই নিয়ম করেন যে, প্রকৃত হিন্দুসন্তান ভিন্ন কেহ এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে পাইবে না। ১৮৩০ অব্দে ইহাঁর বাঙ্গালা ও ইংরাজী অভিধান প্রচার হয়। ১৮৪৪ অব্দে ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছিল। ইহাঁর হরিমোহন, প্যারিমোহন, বংশীধর ও মুরলিধর নামে চারি পুত্র ছিল। রামকমল সেনের হিন্দুধর্ম্মে বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল। ইনি প্রতি বৎসর বাটীতে দুর্গোৎসব করিয়া স্বজাতীয়দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেন, এবং যত্নের সহিত রাখিয়া বস্ত্রাদি প্রদানপূর্ব্বক বিদায় দিতেন। স্বজাতির প্রতি ইহাঁর যথেষ্ট স্নেহ ছিল। ইনি স্বজাতীয়দিগকে সাধ্যমত অন্ন, বস্ত্র, ও আশ্রয় দানে পরাঙ্মুখ হইতেন না।

উপ। বরুণ কাকা! জেলখানার প্রাচীরে একটা টিক্‌টিকি হাঁ করিয়া রহিয়াছে দেখ?

বরুণ। ওরে বাবা, জেলখানার মাকড়সাটা পর্য্যন্ত হাঁ করিয়া থাকে।

এই সময় একটী বাবু নৌকা হইতে তীরে উঠিলেন। বাবুটীর সঙ্গে তাঁহার ১৮। ১৯ বৎসরের পুত্র। তাঁহাদিগকে দেখিয়া ২। ১ জন ভদ্রলোক

ছুটিয়া আসিয়া কহিল "ঘনেশ্যামকে ফেরত পেলেন কোথায়?" বাবু কহিলেন "অনেক সন্ধানে দেখি, ও খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া খ্রীষ্টানদিগের সহিত বসিয়া একত্র খানা খাইতেছে। অনেক ভুলাইয়া তবে নিয়ে আসিলাম। এক জন কহিলেন " উনি খ্রীষ্টান হইয়াছেন গৃহে নিলে কোন গোল হবে না?"

"গোল হবে কেন? আমি এই উপলক্ষে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়া কাশী, কাঞ্চী, তৈলঙ্গ, দ্রাবিড় এবং নবদ্বীপ প্রভৃতি বিখ্যাত স্থান সকল হইতে চৈতনধারী মহাত্মাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিব। তাঁহারা অর্থের প্রলোভনে দীর্ঘ দীর্ঘ বচনসকল উদ্ধৃত করিয়া দিয়া সমাজে লইবার ব্যবস্থা দিবেন। খানা কে না খায়? কিন্তু কয়জনে জাতিচ্যুত হইয়াছে? তবে ঘনেশ্যাম খ্রীষ্টান হওয়ায় ইংরাজী কাগজওয়ালারা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে ঐ যা একটা দোষ।

বাবুটী চলিয়া যাইলে পিতামহ কহিলেন "বরুণ, আজ কাল মর্ত্ত্যে জাতিবিচারও বেশ! গোপনে সবই চলিতেছে প্রকাশ হইলেই যত দোষ। কিন্তু তাহাও আবার পয়সা থাকিলে ঢাকিয়া যায়। হ্যা! তবে দেখিতেছি জাতি বাক্সের মধ্যে!

দেবতারা গঙ্গার ধারে ধারে চলিলেন। ভাগীরথী তীরে অসংখ্য সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা দেখিয়া দেবরাজ কত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বরুণ কহিলেন "১৫৩৭ খৃঃ অব্দে পর্টুগীজেরা এই হুগলি নগর নির্ম্মাণ করেন। ১৬২৮ অব্দে এখানে অনেক পর্টুগীজ বাস করিত। তাহাদের একটী সুরক্ষিত কুঠী ছিল। সাজেহান দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে এক সময় হুগলি আসিয়া দেখিয়া যান উহারা বলপূর্ব্বক দেশীয়দিগকে খ্রীষ্টান করিয়া থাকে। এই ক্রোধ অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার মনে জাগরূক থাকায় সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া পর্টুগীজদিগকে দেশ-বহিষ্কৃত করিয়া দিবার আজ্ঞা প্রচার করেন। তদনুসারে ১৬৩২ অব্দে হুগলিনগর মুসলমানেরা অবরোধ করিয়া প্রায় চারি সহস্র পর্টুগীজকে বন্দী করিয়াছিল। এই ঘটনার পর পর্টুগীজেরা আর কখন বাঙ্গালায় প্রভাবশালী হয় নাই। এই সময় হইতেই নগরটী মোগলদিগের হস্তগত হইয়া বাঙ্গালার মধ্যে প্রধান বাণিজ্য স্থান হইয়া উঠে। তদবধি সপ্তগ্রামের অবনতি হইতে আরম্ভ হয়।"

পতিত হইলে কিরূপে উঠিতে সমর্থ হয়? যদি বল কাষ্ঠ-লোষ্ট্র-ফল মূলাদির সঙ্গে বিহঙ্গমের তুলনা হয় না; বিহঙ্গ আতা নহে,—সে প্রাণবান্ জীব। তদ্বলেই ভূমি হইতে অবলীলা ক্রমে শূন্য পথে উত্থিত হয়। কিন্তু মনুষ্য-গো-মেষাদিও জীবন্ত জীব, তাহারা কি কারণে উড়িতে পারে না? অবশ্যই তবে পতত্রির অঙ্গবিশেষে বিশ্বকর্ত্তার কোন বিশেষ কারু-কার্য্য আছে।

আমরা প্রতিনিয়ত চক্ষের উপর যে সমস্ত অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পাই, তাহাতে সহসা আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক হয় না। আজ যদি প্রথম একটী পক্ষীকে উড়িতে দেখিতাম, তবে এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা মনকে জাগরিত করিয়া তুলিত, প্রীতির উৎসে নয়নযুগল উচ্ছলিত হইত, কৌতূহল-তরঙ্গে চিত্ত দুলিয়া উঠিত। কিন্তু প্রতিদিন উঠিতে বসিতে দেখিতে পাইতেছি, বিহঙ্গদেহ ক্ষুদ্রাকার তরণীখানির ন্যায় বায়ুসাগরে ভাসিতেছে, সুতরাং চিত্ত বিস্ময়ে জাগরিত হয় না। এস তন্ন তন্ন করিয়া নিরূপণ করি, পক্ষীর দেহ কি কৌশলে আকাশের বায়ুপ্রবাহে ভাসমান হইয়া ইতস্ততঃ চালিত হইতেছে।

মৎস্যের ও বিহঙ্গের দেহ সন্তরণার্থ সমান উপযোগী। উভয়ের অঙ্গ-গঠন-প্রণালী অনেকাংশে একরূপ। তাহাদের বল বিক্রম ও প্রকৃতি ভিন্ন, দেহের আকার ও অবয়ব বিভিন্ন, কিন্তু মৎস্য যে কৌশলে অগাধ জল-রাশির উপর সন্তরণ করিয়া বেড়ায়, সেই কৌশলে পক্ষিজাতি বায়ু-রাশিতে বিচরণ করে। কিন্তু পক্ষীর দেহ তরণীর অধিক অনুরূপ। যৎ-কালে নীলাকাশে পক্ষ বিস্তার করিয়া গৃধ্র উড়িতে থাকে, মস্তক তুলিয়া উন্নমিত চক্ষে দেখ—যেন সাগরজলে ক্ষুদ্র নৌকাখানি ভাসিয়া বেড়াইতেছে। পক্ষদ্বয় ক্ষেপণী; পুচ্ছ—কর্ণ; ইচ্ছামত চতুর্দ্দিকেই চালিত হইতেছে। পক্ষীর পক্ষ আছে, মনুষ্য-গো-মেষাদির তাহা নাই। পক্ষ ব্যতীত পক্ষীর দেহে আর কি বৈসাদৃশ্য আছে, তাহা দেখা আবশ্যক। প্রথমতঃ মনুষ্য ও বিহঙ্গের কঙ্কালের তুলনা কর, দেখিবে উভয়ের অব-য়বে অনেক জাতীয় সাদৃশ্য বিদ্যমান আছে। অস্থির গঠন-সমা-বেশ-প্রণালী দৃষ্টি করিলে উভয় জন্তুকে এক শ্রেণীর বলিয়া বিবেচিত হয়। মস্তক, কণ্ঠ, জত্ৰ্বস্থি, পর্শুকা, মেরুদণ্ড, বক্ষোস্থি, হস্তের ঊর্দ্ধ ও অধোভাগ প্রভৃতির মেলন করিলে সর্ব্বত্র তুল্যতা উপলক্ষিত হইবে। কিন্তু তাহা-

দের প্রকৃতি এবং বিধানোপাদান এক প্রকার নহে। উভয় জন্তুর কঙ্কালে অস্থিগুলির পরস্পর এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিলেও প্রকৃত পক্ষে তন্মধ্যে পার্থক্য অনেক। পক্ষীর মস্তকের মধ্যভাগ স্থূল, তৎপরে ক্রমে সরু হইয়া আসিয়াছে। মনুষ্যের মস্তক সে প্রকার গঠনের নয়। মানুষের মস্তক গোলাকার, উভয় পার্শ্ব চেপটা এবং ওষ্ঠের অংশ সূচ্যগ্রের আকৃতি নহে। পক্ষিজাতির কণ্ঠ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকার এবং স্থিতিস্থাপক। মনুষ্য বাহু ও হস্ত দ্বারা যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন করে, পক্ষী কণ্ঠ দ্বারা তৎসমুদয় করিয়া থাকে। সে কারণ উহা অনায়াসে প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হয় এবং চতুর্দ্দিকে ফিরাইতে ঘুরাইতে কষ্ট বোধ হয় না। মনুষ্য হস্ত প্রসারিত করিয়া কোন দ্রব্য গ্রহণ করে এবং তৎপরে হস্ত গুড়াইয়া লয়; যথা ইচ্ছা চারি দিকে হস্ত চালনা করিতে পারে। পক্ষজাতিও সম্মুখে খাদ্য দ্রব্য দেখিলে তৎক্ষণাৎ কণ্ঠ প্রসারিত করিয়া তাহা গ্রহণ করে। সকলেই দেখিয়াছেন, পুষ্করিণীর কিম্বা নদীর তটে বক নিস্তব্ধ ভাবে আহারের প্রতীক্ষা করে, মৎস্যাদি দৃষ্টিগোচর হইলেই অবিলম্বে প্রলম্ব গলদেশ প্রসারিত করিয়া তাহাকে চঞ্চুপুটে ধরিয়া ফেলে। কণ্ঠের অস্থিমালা এ প্রকার দীর্ঘ নমনীয় এবং স্থিতিস্থাপক না হইলে সকল পক্ষীকেই অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হইত। মনুষ্য হস্ত দ্বারা ঐ সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করে, সুতরাং তাহার কণ্ঠ ক্ষুদ্র স্থূল এবং অপেক্ষাকৃত কঠিন।

তৎপরে পক্ষীর পক্ষদ্বয় (ডানার মূলদেশ) বিশেষ দ্রষ্টব্য। এস্থলে দুই খানি অস্থি দুটী খিলে নিবদ্ধ আছে। মনুষ্য দেহে ইহা এককালে বিরল। বোধ হয় মানুষের কণ্ঠপার্শ্বস্থ জত্রস্থিদ্বয়ের নিকটস্থ কোরেকএড্ অস্থি প্রবন্ধে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু, পক্ষীর ঐ প্রবন্ধাস্থিই কণ্ঠদেশের প্রধান উপকরণ। জত্রস্থি অপেক্ষা ঐ অস্থিদ্বয় দীর্ঘ এবং ধনুরাকৃতি। পক্ষীর বক্ষোগ্র উচ্চ, পার্শ্বদ্বয় ঈষদ্বক্রভাবে ঢালু; কিন্তু মনুষ্যের বক্ষঃস্থল সে প্রকার নহে। উহা প্রশস্ত এবং কোমল। পক্ষীর বক্ষঃস্থল দ্বারা দুটী প্রধান কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। পক্ষদ্বয় চালনার উপযোগী মাংসপেশীতে বক্ষঃস্থল জড়িত, তদ্দ্বারা বক্ষোস্থি বিলক্ষণ সুদৃঢ় হয়। ঐ পেশি বক্ষঃস্থলের দুই পার্শ্বে জড়িত থাকায় ডানাতে প্রচুর বল নিয়োজিত হইতে থাকে। উহা না থাকিলে পক্ষীরা কখন অধিকক্ষণ শূন্যে উড়িতে পারিত না এবং পক্ষদ্বয়ও এত দৃঢ় ও পরাক্রান্ত হইত না। অল্পকাল উড়িয়া বেড়াইলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িত।

এক্ষণে পক্ষীর ও মনুষ্যের বাহু এবং হস্তের অস্থির একটী একটী করিয়া তুলনা কর, স্থূলকল্পে অধিক বৈসাদৃশ্য উপমিত হইবে না। কিন্তু সূক্ষ্মরূপে নিরূপণ করিলে তাহারা সম্পূর্ণ পৃথক ও বিভিন্ন দেখা যায়। পক্ষীর ঊর্দ্ধবাহু অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ এবং কঠিন, মনুষ্যের সেরূপ নহে। আবার ডানার অগ্রভাগও মানুষের হস্ত অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ ও দৃঢ়। এ দিকে মানবজাতির মণিবন্ধ এবং করপল্লব মাংসল ও বলিষ্ঠ; পক্ষিদের সে প্রকার নহে। ডানার অগ্রভাগে কেবল কতকগুলি পক্ষ সংলগ্ন আছে এই মাত্র, তাহার দ্বারা বিশেষ কোন কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না। এইরূপে কথঞ্চিৎ সাদৃশ্যভাব সকল অবয়বেই দৃষ্ট হয়।

একখানি মনুষ্য অস্থি ব্যবচ্ছেদ কর, দেখিবে তাহা নিরেট নহে;— বাঁশের পর্ব্বের ন্যায় ফোঁকরা। পক্ষীর অস্থিও সছিদ্র। এই দুই জীবের সমানাকার দুই খানি অস্থির তুলনা করিলে, পক্ষীর অস্থি অধিক ফোঁকরা হইবে। কিন্তু গুরুত্বপক্ষে, মানুষের অস্থি অনেক লঘু; কারণ পক্ষীর অস্থির উপাদান পরস্পর দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়া আছে। পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে, গুরুত্বপক্ষে তুলনা করিলে মনুষ্যের অস্থি লৌহ অপেক্ষা চারিগুণ কঠিন; আবার পক্ষীর অস্থি ছয়গুণ কঠিন দৃষ্ট হইয়া থাকে। এক খণ্ড মনুষ্য অস্থিতে ১১।০ এগার মণ দশ সের ভার সহে। পরন্ত, তদ্রূপ স্থূল পক্ষীর অস্থিতে ১৮৸০ আঠার মণ ত্রিশ সের ভার সহিতে পারে। অস্থির মধ্যস্থলে ত একটী বৃহদাকার ছিদ্র আছে, আবার উহার দলও অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রকোষে পরিপূর্ণ। ঐ কোষ সমূহে রস সঞ্চিত থাকে, তদ্দ্বারা পোষণ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

সৃষ্টিকর্ত্তার বিশ্বমধ্যে কিছুই নিষ্ফল নাই; সকলি এক একটী প্রধান উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে। খেচর পক্ষীর অস্থিগুলি অধিকতর ফোকরা,— অবশ্যই তদ্দ্বারা কোন বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। নতুবা কি কারণে ছিদ্রের আয়তন এত প্রশস্ত হইবে? কণ্টকের সূক্ষ্ম অগ্রভাগও প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত; একটী রেণু একটী পরমাণুও বিফল যায় না; তবে অস্থির আবৃত ছিদ্রে কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়? খেচর পক্ষীর দেহ নিতান্ত শ্রমশীল। আকাশমার্গে উড়িবার সময় তাহাকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। সাতিশয় পরিশ্রমে দৈহিক বিধানোপাদানের ক্ষয় হইতে থাকে, তখন ভোজ্য দ্রব্য দ্বারা সেই ক্ষয় পূরণ করা আবশ্যক। পক্ষি-

জাতির শ্রম অধিক, সুতরাং দৈহিক ক্ষয়ও অধিক; সে কারণ তাহাকে অধিক পরিমাণে ভোজন করিতে হয়। চাতক চকোর চড়ুই ভারত প্রভৃতি পক্ষী প্রত্যহ নিজ নিজ দেহের পরিমিত ভারী দ্রব্য ভোজন করিয়া থাকে। অর্থাৎ একটী চড়ুইয়ের ওজন যদি অর্দ্ধ কাঁচ্চা হয়, তবে সেই চটাপাখী প্রতি-দিন অর্দ্ধ কাঁচ্চা দ্রব্য ভোজন না করিলে তাহার দৈহিক ক্ষতি পূরণ হয় না। কতকগুলি মৎস্যাদ বিহঙ্গ নিজ দৈহিক গুরুত্বের দেড়গুণ ভারী দ্রব্য প্রত্যহ ভোজন করে। মনুষ্যাদি জীবের বক্ষস্থ ফুস্‌ফুসে নির্ম্মল অম্লজানাক্ত বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া শোণিত প্রবাহের ক্লেদরাশি পরিষ্কার করে। কিন্তু, খেচর পক্ষীর শোণিতগত ধ্বস্তদ্রব্য কেবল ফুস্‌ফুস দ্বারা পরিষ্কৃত হয় না। তাহাদের অস্থিরন্ধ্রেও কিয়ৎ পরিমাণে বায়ু প্রবেশ করে। তদ্দ্বারা রক্তের ক্লেদ মার্জ্জিত হয়। পক্ষিদিগের ফুস্‌ফুসপথে দেহান্তর্ভূত অন্যান্য কোষে বায়ুর গতিবিধির দ্বার আছে। আমরা যেমন ইচ্ছা করিলে দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ দ্বারা ফুস্‌ফুসের ছিদ্রজাল বায়ুরাশিতে পরিপূর্ণ করিতে পারি এবং ইচ্ছা করিলে অবিলম্বে সেই বায়ু ত্যাগ করিতে পারি। তদ্রূপ, পক্ষীরাও ইচ্ছামত দেহের সমস্ত গহ্বর বায়ুতে পরিপূর্ণ করিতে পারে, এবং ইচ্ছামত তাহা ত্যাগ করিতে পারে। পাঠক দেখিয়াছেন, কোন ভারী দ্রব্যের ভিতর বায়ু সঞ্চিত থাকিলে তাহা জলের উপর ভাসিতে থাকে, কিন্তু বায়ু নির্গত হইয়া গেলে তৎক্ষণাৎ তাহা নিমগ্ন হয়। শিকারী পক্ষী শূন্যে উড়িতে উড়িতে মৃত্তিকায় কোন জন্তু দেখিলে তাহাকে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে দেহান্তর্ভূত সমস্ত বায়ু প্রশ্বাস দ্বারা ত্যাগ করে, তাহাতেই চকিতাবসরে নিম্নে অবতীর্ণ হইতে সমর্থ হয়। আবার ছোঁ মারিয়া তৎক্ষণাৎ দেহ বায়ুতে পরিপূর্ণ করিয়া শূন্যমার্গে উড়িয়া যায়। কেবল ফুস্‌ফুসের কোষজাল বায়ুতে স্ফীত করিয়া এই অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই; তজ্জন্য বিধাতা পক্ষীর অস্থিগুলিও এমন কৌশলে নির্ম্মাণ করিয়া-ছেন যে, তন্মধ্যে অনায়াসে বায়ুর গতিবিধি হইতে পারে।

কোন একটী বৃক্ষের কিঞ্চিৎ নির্দ্দিষ্ট অংশ দেখিতে পাইলে তাহার সমগ্র পরিধি অঙ্কিত করা যায়। জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গও পরস্পরের উপযোগী করিয়া এমন আশ্চর্য্য কৌশলে বিধাতা নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে, তাহার কোন এক স্থানের কিঞ্চিৎ অংশ দৃষ্টি করিলে দেহের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যথাপূর্ব্ব খাটাইয়া দেওয়া যায়। বিবেচনা কর, তোমাকে বকের পুচ্ছ দেখা-ইলাম। যিনি কস্মিন্ কালে বক পক্ষী দেখেন নাই, কিন্তু জীবমাত্রের দেহ-

তত্ত্ব সবিশেষ অবগত আছেন; তিনি অনায়াসে কেবল ওষ্ঠটী দেখিয়া বকের আকার প্রকার নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিবেন! কি উপায়ে বকের অদৃষ্ট অবয়ব নিরূপিত হইবে? সূচ্যগ্রবৎ দীর্ঘ চঞ্চু দ্বারা ইহাই নিশ্চিত হয়, পক্ষীটী মাংসাশী; কিন্তু বৃহৎ জন্তুর মাংস নিষ্কোষিত করিবার যোগ্য ওষ্ঠ দৃঢ় ও চেপ্টা নহে। শকুনি গৃধ্র চিল প্রভৃতির ওষ্ঠ অধিকতর কঠিন, অগ্রভাগ বড়শীবৎ বক্রাকার। তদ্দ্বারা মৃতদেহের মাংস স্বচ্ছন্দে নিষ্কোষিত করিতে পারে। বকপক্ষীর চঞ্চুপুট বিভিন্ন প্রকার। দীর্ঘাকার সূচির ন্যায় ওষ্ঠ, অধিক দৃঢ় নহে; অতএব তদ্দ্বারা কিরূপ কার্য্য সাধন হইতে পারে? মৃত্তিকা হইতে সূক্ষ্ম শস্যাদি আহরণ করিবার যোগ্য নহে; কপোতাদির ওষ্ঠই তাহার উপযোগী। বকের ওষ্ঠ কর্ত্তরী সদৃশ; তদ্দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য ভেক ও অন্যান্য জীব ধরিয়া ভক্ষণ করে। ওষ্ঠ দীর্ঘাকার,—তদ্দ্বারা এই অনুমিত হয়, যে পঙ্কমধ্যে অথবা জলে উহা প্রবেশ করাইয়া বধ্যজন্তুকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারে। বকের চঞ্চু ক্ষুদ্রাকার হইলে মৎস্য ধরিবার সময় বারম্বার জলে মস্তক নিমগ্ন হইত এবং চক্ষু ও নাসিকা কর্দ্দমাক্ত হইয়া পড়িত। তদ্ভিন্ন, দীর্ঘ ওষ্ঠ দৃষ্টি করিয়া ইহাও বুঝিতে পারা যায়, বকপক্ষী কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া অতি সাবধানে মৎস্যাদিকে আক্রমণ করে। বিধাতার সৃষ্টির এই একটী অবিচলিত নিয়ম আছে, পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে একটী অন্যটীর সর্ব্বতোভাবে অনুকারী। কেবল একটী কারণ বিদ্যমান থাকিলে সকল প্রয়োজনসিদ্ধির আশা নাই। মৃত্তিকার ভিতর উদ্ভিজ্জের মূল নিবদ্ধ থাকে। কিন্তু রসাক্ত মৃত্তিকায় তৃণাদির মূল থাকিলেই উহার পরিপোষণ কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না। সুচারুরূপে উদ্ভিজ্জের পরিপোষণের নিমিত্ত আরও কত আনুষঙ্গিক আয়োজন নিয়োজিত আছে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার মীমাংসা করিয়া দেখ। বৃক্ষের সমস্ত মূলগুলি সচ্ছিদ্র এবং কোমল; তাহাদের রস আকর্ষণ করিবার শক্তি আছে। বৃক্ষের উপরিভাগও সছিদ্র, তন্মধ্যে রস সঞ্চারিত হইতে পারে। উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এইরূপে নির্ম্মিত না হইলে কোন ক্রমে অভীষ্ট সিদ্ধ হইত না। বকপক্ষীর চঞ্চুটী কেবল দীর্ঘাকার হইলে অক্লেশে মৎস্যাদি বধ করিতে পারিত না, উহার গলদেশও প্রলম্ব নমনীয় এবং স্থিতিস্থাপক। শিকার দেখিলে কণ্ঠ প্রসারিত করিয়া নিমিষাবসরে তাহাকে চঞ্চুপুট দ্বারা ধরিতে পারে। ওষ্ঠের পার্শ্বদ্বয় শাণিত অস্ত্রের ন্যায় পাতলা ও তীক্ষ্ণ। তদ্দ্বারা জীবন্ত মৎস্যাদি ধরিয়া

তাহায় প্রাণবধ করে। এই প্রণালীতে দেহের একটী অংশ দৃষ্টি করিলে সমস্ত অবয়ব পরস্পরের সম্বন্ধে নিরূপণ করা যায়।

মনুষ্যের হস্ত একটী প্রকৃত তৌল দণ্ডের ন্যায় (১)। পক্ষীর ডানাও ঠিক তদনুরূপ। উহাদের ওজন এবং তসলীর মধ্যস্থলে আকর্ষণী শক্তি স্থাপিত আছে। কিন্তু ঐ শক্তি ঠিক মধ্যস্থলে স্থাপিত নহে,—ওজনের অনেক টুকু নিকটবর্ত্তী। তদ্দ্বারা হস্ত কিম্বা ডানা সঞ্চালন কালে বিলক্ষণ বলাধিক্য হয়। যাহা হউক, উহার সংস্থাপন গুণে দ্রুত পক্ষ নিক্ষেপ কালে বলের অনেকটা হানি হইয়া থাকে। পক্ষীর ডানার অগ্রভাগই তসলী; ঐস্থলে পর্য্যাপ্ত মাত্রায় বায়ু সঞ্চিত থাকে। স্থলকল্পে উহাকে বায়ুভাণ্ড বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও চলে। পক্ষীর দেহখানি তৌলদণ্ডের ওজন স্বরূপ। এবং পক্ষদ্বয়ের মূলাবস্থিত মাংসপেশীই উহার আকর্ষণী শক্তি। যদ্রূপ একটী দণ্ডের মধ্যস্থলে সূত্রবন্ধন পূর্ব্বক ঝুলাইয়া তাহার উভয় প্রান্তে দুটী সমান ওজনের গুরু দ্রব্য সংলগ্ন করিলে ঐ দণ্ড কোন দিকে ঝুকিয়া পড়ে না, খেচর পক্ষীর দেহখানিতেও উড়িবার সময় ঠিক তদনুরূপ প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয়। উপরের লিখিত অংশগুলির যথা পূর্ব্বক এক একটী মেলন কর, পক্ষীর বক্ষঃস্থলাবস্থিত উভয় পার্শ্বস্থ মাংসপেশী সূত্রস্বরূপ। এক প্রান্তে

---

(১) এই তৌল দণ্ডের প্রকৃত নিয়ম সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া কিঞ্চিৎ দুষ্কর যে সমস্ত গৃহস্থ পাঠক শুবদের বৈজ্ঞানিক নিয়ম অবগত নহেন, ইহার কথঞ্চিৎ আভাসের নিমিত্ত এ স্থলে এই কয়েকটী সহজ কথা উল্লিখিত হইতেছে।

খ গ
____
ক

এস্থলে বিবেচনা কর, (গ) চিহ্ন ওজন; (খ) শক্তি আকর্ষণের স্থান; (ক) তসলী।

ইহার দৃষ্টান্ত দেখুন, স্ত্রীলোকেরা ঢেঁকীতে চাউল কাঁড়ে। ঢেঁকীর এক অন্তভাগে পায়ের চাপ দিবার স্থান; তাহার কিঞ্চিৎ দূরে তসলী; অন্য অন্তভাগে ঢেঁকীর মস্তক। পায়ের চাপ দিলে সেই অংশে শক্তি প্রযুক্ত হইল; পরে মধ্যস্থলে তসলীতে ভর পাইয়া তদবলম্বনে ঢেঁকীর মস্তক (ওজনের অংশ) উত্থিত হয়। এই প্রক্রিয়া তৌলদণ্ডের নিয়মে সম্পন্ন হয়।

সাধারণ গৃহস্থ লোকের বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলির অবগতির নিমিত্ত তৎসমুদয় সহজ ও সরল ভাষায় আমরা প্রকাশিত করিব। কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে ক্রমে তাঁহাদের বুৎপত্তি জন্মিবে।

দেহের ওজন, অন্য প্রান্তের পক্ষের অগ্রস্থিত বায়ুপুঞ্জ—উভয়ে সাম্যভাব রক্ষা করিতেছে।

উড়িবার সময় পক্ষদ্বয় একবার উত্থিত, তৎপরেই নিক্ষিপ্ত হয়। এই প্রক্রিয়াও লৌহদণ্ডের ক্রমানুসারে সম্পাদিত হইয়া থাকে। পক্ষ উচ্চ নীচ করিবার জন্য দুই প্রকার মাংসপেশী সংযোজিত আছে। যদ্দ্বারা পক্ষ আকৃষ্ট হইয়া নিম্নে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা অপেক্ষাকৃত অধিক দৃঢ় এবং বলিষ্ঠ। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, পক্ষীর জত্রস্থি দুটী খিলে সংলগ্ন আছে। তদ্দ্বারা সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগ ভিন্ন পক্ষদ্বয় নানা প্রকারে চালিত হইতে পারে। কিন্তু সম্মুখ এবং পশ্চাদ্ভাগে ফিরাইতে গেলে অস্থি ভগ্ন হইয়া যায়। পক্ষদ্বয় ঊর্দ্ধাধোভাগেই সঞ্চালিত হইবার উপযোগী। পেশিমণ্ডলের আকুঞ্চন দ্বারা জীবন্ত জন্তুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হইয়া থাকে। কোন অনৈসর্গিক কারণে উক্ত আকুঞ্চন শক্তির লাঘব হইলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পাষাণের ন্যায় দৃঢ় হইয়া পড়ে।

দেহের মাংসরাশিই পেশিমণ্ডলী নামে অভিহিত হয়। সেই পেশিরাশি গ্রন্থির কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে সরু হইয়া পরিশেষে পেশিসূত্রে পরিণত হইয়াছে। হস্তের মণিবন্ধে দৃষ্টি কর, দৃঢ় শিরার ন্যায় প্রলম্বপেশিরজ্জু স্পষ্ট দেখিতে পাইবে। পদদ্বয়ের পশ্চাদ্ভাগে গুল্‌ফের উপর টিপিয়া দেখ, কঠিন পেশিরজ্জু দৃঢ়রূপে আবদ্ধ রহিয়াছে। পক্ষীর বক্ষোস্থি হইতে পেশিরজ্জু নির্গত হইয়া ডানাতে দৃঢ়রূপে নিবদ্ধ হইয়াছে। এই পেশি রজ্জুটাই প্রধান এবং বিশেষ বলশালী। এতদ্দ্বারা পক্ষদ্বয় নিম্নে নিক্ষিপ্ত হয়। অপর আর একটী পেশি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ, উহার উপরিভাগে আবদ্ধ আছে। তদ্দ্বারা পক্ষদ্বয় উত্তোলিত হয়। ডানা চালনা করিবার সময় পেশিবন্ধনীর সহায়তায় উহাতে বলাধিক্য হয়। যে পেশিমণ্ডলীর দ্বারা পক্ষ নিম্নে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা ত্রিভুজাকৃতি। কিন্তু বস্তুতঃ উহার আকার সরল ত্রিভুজের ন্যায় নহে। ঐ পেশিজালক তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, উহার সমগ্র ভাগ কীলকের সদৃশ বিস্তারিতরূপে আবদ্ধ আছে, উহার রেখাগুলি সরল অথচ উপরিভাগে বক্রাকার। প্রত্যুত, উহা জ্যামিতির "হাইপরবোলার" প্রকৃতির অনুরূপ। উহা প্রশস্তভাবে উৎপন্ন হইয়া ক্রমে সূক্ষ্মরূপে পরিণত হইয়াছে। দৃষ্টে সহজেই প্রতিপন্ন হয়, উহার এক প্রান্ত অধিকতর দৃঢ় ও বলবান্। পরন্তু

নিয়বেশে ঐ পেশিমণ্ডল এমন আশ্চর্য্য কৌশলে বিনিবিষ্ট হইয়াছে যে উহার কোন অংশে বলের কিছুমাত্র ন্যূনতা নাই। পক্ষের পেশিজালে এই কৌশলটী বিদ্যমান না থাকিলে পক্ষিদিগের ডানা অত্যল্পকাল মধ্যে একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িত। উড়িবার সময় যতবার পেশিমণ্ডল সঙ্কুচিত হইত, ততবার উহার সূত্রগুলি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইত। পেশিবন্ধনই অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বল; পেশিবন্ধন ছিন্ন ভিন্ন হইলে পক্ষ পরিচালনার সামর্থ্য কোথা হইতে থাকিবে? সুতরাং পক্ষীর পক্ষ শোভা সম্পাদন ভিন্ন অন্য কোন প্রয়োজনে লাগিত না। কিন্তু বিধাতার নির্ম্মাণ-কৌশল সামান্য বুদ্ধির অগোচর। তাঁহার সৃষ্ট পদার্থ অবিশ্বনর নহে,—সত্য; কিন্তু সহজে বিনষ্ট হইবারও নহে।

যে পেশির দ্বারা পক্ষ উত্তোলিত হয়, তাহার আকৃতি বিভিন্ন প্রকার। ইহা দেখিতে ঠিক পালকের সদৃশ। জন্তুর দেহে এতাদৃশ গঠনের পেশি নিতান্ত বিরল, কচিৎ কোন কোন স্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে। মধ্যবর্ত্তী একটী পেশিরজ্জু হইতে ঐ সমস্ত সূত্র বহির্গত হইয়া বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। উহাদের দৈর্ঘ্য এবং পরস্পরের দূরতা সর্ব্বত্রই সমান। পেশিসূত্রগুলি সাতিশয় ভারসহ। অধ্যাপক ডণ্ডারস্ নিশ্চিত করিয়াছেন যে, ·১· ইঞ্চি স্থূল পেশি সূত্র প্রতি আকুঞ্চনে দেড় রতি ভার উত্তোলন করে। অধ্যাপক হটন্ কহেন, এক ইঞ্চি পরিধি স্থূল পেশি দ্বাদশ ইঞ্চি পরিমিত স্থানে এক মিনিটের মধ্যে ১৷২ এক মণ বার সের ভার উত্তোলন করিতে পারে। পক্ষির হৃদবস্থিত পেশিপুঞ্জে কত দূর বল সংযোজিত হইতে পারে, এতদ্দ্বারা তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু ঐ মাংসপেশিরূপ তোল পক্ষীর শরীরেই নিবদ্ধ থাকায় শক্তির অনেকটা হানি হইয়া পড়ে। অন্যথা উহাদের হৃদয়ের মাংসপেশি যে প্রকার দৃঢ়, তদ্দ্বারা প্রচুর বলোদ্ভব হইবার সম্ভাবনা ছিল। হরিত পক্ষীর হৃদয় এত কঠিন ও বলিষ্ঠ যে তাহার পেশি দ্বারা ১৷০ একমণ দশ সের ভার অনায়াসে উত্তোলিত হইতে পারিত, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটে না। পারাবতকে ক্লোরোফরম ঔষধ দ্বারা চৈতন্যশূন্য করিয়া তাড়িত বেগ দিলে ⁄২॥০ আড়াই সের মাত্র ভার আকর্ষণ করে। প্রত্যুত উহার পেশি এত দৃঢ় যে, উপযুক্ত বল প্রকাশ করিলে তাহাতে আরও অধিকতর ভার অক্লেশে আকর্ষণ করিতে পারিত। জীবিতাবস্থায় দেহের পেশিসূত্রের যে প্রকার দৃঢ়তা থাকে, মৃত্যুর পর আর তদ্রূপ

থাকে না। জীবন্ত পক্ষীর পেশিতে /৫ পাঁচ সের ভার অনায়াসে সহিতে পারে, কিন্তু মৃত পক্ষীর পেশিতে /৪ চারি সের ভার ঝুলাইলে ছিঁড়িয়া পড়ে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনা করিবার সময় সমস্ত পেশি এককালে আকুঞ্চিত হয় না। ঐ আকুঞ্চন তরঙ্গান্বিত বেগে একটী পেশি বিন্দু হইতে বিন্দ্বন্তরে নিঃসৃষ্ট হয়। জীবিতাবস্থায় পেশি আকুঞ্চিত হইবার সময় এক প্রকার চুড় চুড় শব্দোদ্ভব হয়, তাহা অনায়াসে শুনিতে পাওয়া যায়। অঙ্গুলি দ্বারা কর্ণকুহর বদ্ধ করিয়া হস্তাস্থি চালনা করিলে অবিস্ফুট শব্দ উদ্ভূত হয়; অভিনিবিষ্ট চিত্তে নিস্তব্ধ থাকিলে তাহা শ্রুতি-গোচর হইবে। তাড়িত বেগ লাগাইলে জন্তুর পেশিমণ্ডল আকুঞ্চিত হইয়া পড়ে। অতএব তাড়িত বেগই পেশি-মণ্ডল আকুঞ্চনের প্রধান কারণ। কিন্তু দেহমধ্যে ঐ তাড়িত প্রক্রিয়া কিরূপে সম্পাদিত হয়? একটী তাড়িত যন্ত্রে পরিচালকসূত্র, তাড়িত দণ্ড এবং প্রয়োজনানুমত জনৈক চালনকর্ত্তা থাকে। জীবের দেহে সেই চালনকর্ত্তা কে? পরিচালকসূত্রই বা কোথা? পাঠক দেখুন, মস্তিষ্কই দেহীর দেহমধ্যে প্রয়োজনানুরূপ তাড়িত বেগ পরিচালনের কর্ত্তা এবং মস্তিষ্ক-বিনিঃসৃত স্নায়ুসূত্রই তৎপরিচালনের উপায়ভূত পথস্বরূপ। এক্ষণে দেখুন, পেশি-মণ্ডলে তাড়িত বেগ সংযোগ না করিয়া কেবল স্নায়ুসূত্রে যথোচিত উক্ত বেগ লাগাইলে তৎসঙ্গে পেশিও আকুঞ্চিত হয়। ঐ বেগের আধিক্য হইলে পেশির আকুঞ্চনেরও আধিক্য হইয়া পড়ে। কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক দেহের স্থান-বিশেষ দৃঢ় করিলে তথাকার পেশি অত্যন্ত আকুঞ্চিত হয়, তৎকালে সেখানে তাড়িত বেগও প্রখররূপে চালিত হইয়া থাকে। কিন্তু স্নায়ুর বেগাপেক্ষা তাড়িতগতি অধিকতর দ্রুতগামিনী। এইরূপ অনুমিত হয় স্নায়ুবল অপেক্ষা তাড়িতগতি ২০০০০০০ বিংশতি লক্ষ গুণ অধিক বেগবতী। মস্তিষ্ক ইচ্ছার স্থান। মস্তিষ্কে ইচ্ছার উদয় হইল, আমি দক্ষিণ হস্ত চালনা করিব। কিন্তু ঐন্দ্রিক স্নায়ুদ্বয় দ্বারা সেই ইচ্ছাবেগ হস্তে উপনীত হইতে কিঞ্চিৎকাল বিলম্ব হইয়া থাকে। ইচ্ছার উদয় এবং ক্রিয়া সম্পাদনের ব্যবধানকাল অনতুভাব্য ও অকিঞ্চিৎকর সন্দেহ নাই; পরন্তু তন্মধ্যে কিয়ৎকালের অবসর আছে, তাহা নিশ্চিত। তাড়িত বেগের সেই ব্যবধানকাল যৎসামান্য মাত্র,—২০০০০০০ বিংশতি লক্ষ ভাগ স্বল্প। অনুমান কর, মস্তিষ্কে ইচ্ছাভাবের উদয় হইলে যদি ২০০০০০০ বিংশতি লক্ষ বিপলে সেই ইচ্ছা হস্তে উপনীত হয়; তাড়িত বেগ এক বিপলে

উপনীত হইতে পারে। স্নায়ুসূত্র পথে অনেকগুলি আগুনালিক কোষ বিদ্যমান আছে। তাড়িত স্রোতের সঞ্চরণকালে ঐ সমস্ত কোষে তাহার বেগ কিয়ৎপরিমাণে প্রতিহত হইতে থাকে। তজ্জন্য উহা যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে শীঘ্র উপনীত হইতে পারে না। বোধ করি পথিমধ্যে ঐ অবরোধ উপস্থিত না থাকিলে স্নায়ুবেগ, তাড়িতের ন্যায় চকিতাবসরে পরিচালিত হইতে পারিত।

দেহিমাত্রের শরীর মধ্যে দুই বিভিন্নজাতীয় স্নায়ু উপন্যস্ত আছে। তাহাদের আকার প্রকার এবং গঠনের বিধানোপাদান একরূপই অনুমিত হয়। অণুবীক্ষণ ও রাসায়নিক বিসমাস দ্বারা তন্মধ্যে কিছুই পার্থক্য উপলক্ষিত হয় না। পরন্তু তাহাদের কার্য্য সম্পূর্ণ পৃথক। তন্মধ্যে একটী স্নায়ু, ক্রিয়াস্থান হইতে প্রয়োজনোপযোগী ইচ্ছাকে মস্তিষ্কমধ্যে চালিত করিয়া দেয়; অপরটী মস্তিষ্ক হইতে ক্রিয়াস্থানে প্রয়োজনানুরূপ সংবাদ বহন করে। বিবেচনা করুন, হস্তের অঙ্গুলি একত্র মিলিত করিয়া মুষ্টিবদ্ধ করিব, স্নায়ুপথে সেই ইচ্ছা মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হইল। তৎপরে অপর স্নায়ুসূত্রে সেই কার্য্য সম্পাদনার্থ করাঙ্গুলির পেশিতে ইচ্ছা উপনীত হইয়া পড়িল,—তখন আমি মুষ্টিবদ্ধ করিলাম। ডানার ঐচ্ছিক পেশি কর্ত্তন করিয়া দিলে পক্ষীর আর উড়িবার সামর্থ্য থাকে না। তখন উড়িয়া যাইবার জন্য পক্ষীটী ঝট্ পট্ করিতে থাকে; কিন্তু উড়িয়া যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে পরিচালক পেশিসূত্র কর্ত্তন করিলে পক্ষীর উড়িবার জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে প্রবল থাকে, তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় না, অথচ উড়িবার শক্তি এককালে বিনষ্ট হইয়া যায়। পেশিমণ্ডলে সঞ্চার্য্যমাণ তাড়িত বেগ কর্তৃক কিয়ৎপরিমাণে তাপোৎপাদিত হয়। আবার পরম্পরাক্রান্ত ক্রিয়ার সহায়তায় সেই সন্তাপ হইতে তাড়িত উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এক্ষণে পক্ষীর পক্ষগুলি তন্ন তন্ন করিয়া দেখ। কি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ সকল পক্ষেরই উপাদান তুল্য, তাঁহাতে কিছুই ইতরবিশেষ নাই। প্রত্যেক পক্ষের মস্তক, পর্ব্ব এবং লোমাংশ আছে। লোমগুলি কঙ্কতের দন্তের ন্যায় পরস্পরের গায়ে নিবিষ্ট থাকিয়া পক্ষীকে শূন্যে উত্তোলন করিবার বিশেষ আনুকূল্য করে। নখ কোণ এবং দন্তের ন্যায় পক্ষও দেহের নিম্ন চর্ম্ম হইতে জন্মে। কেশ এবং পালকের উৎপত্তি-প্রণালী একরূপ। কিন্তু তাহাদের প্রকৃত গুণ স্বতন্ত্র। রস ও শৈত্যাদিতে কেশ কোমল হইয়া যায়, কিন্তু পাল-

কের কোন রূপান্তর ঘটে না। কিন্তু ভূচর পক্ষীর পালক শৈত্যাদিতে শীঘ্র কোমল হইয়া যায়। তাহার কারণ, জলচর এবং খেচর পক্ষীর পালকে এক প্রকার তৈলবৎ আঙনালিক পদার্থ আছে, তাহাতে জল পালকের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পার না। পক্ষীর দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থান ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পালকে আবৃত। অনেক পক্ষীর দেহ লোমবৎ কৃষ্ণবর্ণ পক্ষে আচ্ছন্ন; কৃষ্ণবর্ণ লোম এবং কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রাদিতে দৈহিক সন্তাপ উত্তমরূপে রক্ষিত হয়, সে কারণ সৃষ্টিকর্ত্তা তাহাদের শরীর কৃষ্ণবর্ণ কোমল লোমবৎ পালকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছেন। পক্ষীর পুচ্ছ নৌকার কর্ণের কাজ সম্পাদন করে। নাবিক যেমন কর্ণ ফিরাইয়া ইচ্ছামত চতুর্দ্দিকেই তরণী চালাইতে পারে, পক্ষিজাতিও পুচ্ছদ্বারা নিজ গতি ফিরাইয়া যথা ইচ্ছা সেই দিকে উড়িয়া যায়। কিন্তু ময়ূর বুলবুলি প্রভৃতি কতিপয় পক্ষীর বিচিত্র সুবিস্তীর্ণ পুচ্ছ পরিচ্ছদে অঙ্গ-সৌষ্ঠবই সম্পন্ন হয়, তাহা বিশেষ কোন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য নহে। যে সকল বিহঙ্গমের পাদদ্বয় সুদীর্ঘ, তাহাদের পুচ্ছ প্রায় বৃহৎ হয় না। তাহার কারণ ঐ সমস্ত পক্ষী উড়িবার সময় পদদ্বয় পশ্চাদ্ভাগে তুলিয়া রাখে তদ্দ্বারা কর্ণের কার্য্য সম্পাদিত হয়।

পক্ষীর ডানার পক্ষরাজি তিনটী প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। ডানার অগ্রভাগের পালক নাতিশয় দীর্ঘ। ডানার মধ্যস্থলের পালক তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং দেহের নিকটবর্ত্তী পালকগুলি আরও ক্ষুদ্র। যে অংশে বৃহদাকার পালক সংলগ্ন আছে, তথায় তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। আবার যে স্থল ক্ষুদ্রাকার পালকে আবৃত, সে স্থলে তাহাদের সংখ্যা অত্যধিক। পক্ষগুলির সমাবেশের ক্রম দ্বারা পক্ষীর ডানা প্রকৃত একটী ত্রিভুজের রূপ ধারণ করে। দেহের সঙ্গে ডানার সংলগ্ন স্থানে তাহার তলদেশ। কিন্তু ঐ ত্রিভুজ বিপর্য্যস্ত হইলে হৃদয়ের পেশিমণ্ডল অপেক্ষাকৃত আরও দৃঢ় হওয়া আবশ্যক হইত। কুত্রাপি পক্ষিদের ডানার আকার এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু মক্ষিকা ও অন্যান্য কীটের পক্ষ তাদৃশ বিপরীতভাবে নির্ম্মিত। তাহাদেরও পক্ষ ত্রিভুজাকৃতি, কিন্তু ঐ ত্রিভুজের শীর্ষ দেশ দেহে সংলগ্ন আছে। মক্ষিকাদির পক্ষ এই প্রণালীতে দেহে সংলগ্ন থাকায় তাহারা বিহঙ্গমাপেক্ষা অধিক দ্রুতবেগে উড়িতে পারে।

পক্ষীর একটী ডানার সমগ্র পক্ষভাগ বিশিষ্টরূপে দৃষ্টি কর, সমস্ত পালক একটীর উপর আর একটী পরস্পর মসৃণভাবে সন্নিবেশিত আছে।

পালকগুলি এই প্রণালীতে নিবেশিত থাকায় পক্ষিরা অবলীলাক্রমে শূন্য-মার্গে উঠিতে পারে। আবার ডানার অধোভাগ দৃষ্টি কর, পালকগুলি পৃথক্ পৃথক রূপে সাজান আছে। তন্মধ্য দিয়া বায়ু নিঃসৃষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং উড়িবার সময় কোন প্রতিবন্ধ ঘটে না। ডানার সম্মুখভাগ বিলক্ষণ দৃঢ়, কিন্তু পালকের অগ্রভাগগুলি নিতান্ত শিথিল। ডানাদ্বয় কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধ ও পার্শ্বভাগে চালনা করিলে পক্ষীর সম্মুখগতি সাধিত হয়। আবার কিঞ্চিৎ নিম্ন ও সম্মুখ দিকে ডানা চালনা করিলে ঊর্দ্ধগতি হইয়া থাকে। ভূমি হইতে শূন্যে উড়িবার সময় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে পক্ষীকে মৃত্তিকাভিমুখে আকৃষ্ট করিয়া রাখে সন্দেহ নাই। কিন্তু বায়ুর উপর পক্ষের প্রতিঘাত করিয়া সেই আকর্ষণকে অতিক্রম করিতে সক্ষম হয়।

এক্ষণে পাঠক! জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, কখন কখন শূন্যে চিল প্রভৃতি কোন কোন পক্ষী কি প্রকারে সুস্থিরভাবে অবস্থিতি করিতে পারে, মৃদু-মন্দ-মারুত-সঞ্চরণকালে পক্ষী সম্পূর্ণরূপে আপনার পুচ্ছ বিস্তারিত করে। পক্ষদ্বয় দেহ হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চ করিয়া শরীরের ভার রক্ষা করিতে থাকে, সুতরাং নিম্নে পতিত হয় না। তাহার প্রমাণ স্বরূপ ক্রীড়নক ঘুড়ী দেখ। তাহার উভয় পার্শ্বস্থ ভার তুল্য থাকিলে অনায়াসে শূন্যে অবস্থিতি করিতে পারে। ঘুড়ীর পক্ষ নাই, উড়িবার নিমিত্ত কিছুই সঞ্চালন করিতে হয় না, কেবল সমভাবে বায়ু ধারণ করিয়াই শূন্যমার্গে অবস্থিতি করে। পরমেশ্বর মনুষ্যকে স্থলচর জীব করিয়াছেন। শূন্যে উড়িবার যোগ্য তাহার দেহে কোন প্রকার উপকরণ নাই। মানুষের কফোণি পশ্চাদ্ভাগে থাকিলে উপযুক্ত প্রকরণ দ্বারা মনুষ্যজাতিও অনায়াসে উড়িতে পারিত। যাহা হউক, বিজ্ঞান-শাস্ত্রের সমধিক উন্নতি হইলে এককালে মানুষও পক্ষীর ন্যায় আকাশপথে উড়িতে পারিবে এমন আশা করা যায়।

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়—রাহুতা।

ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্।

নিপু যথাকালে লোকান্তর-গমন করিলে হলায়ুধ, হরিহর, কন্দর্প, বিশ্বম্ভর, নরহরি, নারায়ণ, প্রিয়ঙ্কর, ধর্ম্মাঙ্গদ, তারাপতি এবং কামদেব ভট্ট-নারায়ণ হইতে এই একাদশ পুরুষ, ক্রমান্বয়ে ১৩১৫ শকাব্দা পর্য্যন্ত

(১৩৯৪ খৃঃ) আদিশূরের নিকট হইতে ক্রীত রাজ্য নিষ্কর ভোগ করিয়াছিলেন।

মহারাজ কামদেবের বিশ্বনাথ প্রভৃতি * চারি পুত্র। অর্থ অনর্থের মূল। মায়া দয়া স্নেহ মমতা অর্থ-লোভের নিকট সকলেই কুণ্ঠিত,—পিতৃবিয়োগের পর, ভ্রাতৃগণ পৈতৃক বিষয় বিভাগের নিমিত্ত দারুণ কলহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ম্লেচ্ছ দেশাগত (ক) গজনবীবংশোদ্ভব সুলতান-

---

* কামদেবাত্মজাস্তেশ্চত্বারঃ পুত্রা বিশ্বনাথপ্রভৃতয়ঃ পিতরি মৃতে রাজ্যাংশং গ্রহীতুং পরস্পরং বিবদন্তে স্ম। অস্মিন্নেব সময়ে ম্লেচ্ছদেশাদাগত্য সুলতান মামুদ্ গজনবী নাম্না প্রসিদ্ধ যবনেন ইন্দ্রপ্রস্থ নগরাধিপং নির্জ্জিত্য তৎপুরে স্বাধিপত্যং চকার। এতৎ শ্রুত্বা কামদত্তা বিশ্বনাথাদয়ো বিবদন্ত ইন্দ্রপ্রস্থপুরাধিপযবনং সম্রাট্‌কল্পনুপযযুঃ। যবনাধিপোঽপি বহুনা কালেনাপি তদ্বিবাদং পরিচ্ছেত্তুমশক্নুবন্ বিশ্বনাথাদীনাহ, ভবন্তো রাজ্যকরং মহ্যং দাতুং স্বীকুরুত। অনন্তরং জ্যেষ্ঠো বিশ্বনাথো যবনাধিপায় নিজরাজ্যস্য করং দাতুং স্বীকৃত্য যবনাধিপানুমত্যা পৈতৃকং সকলং রাজ্যমবাপ। তস্য চ সোদরাস্ত্রয়ঃ করদানং ন নীচযুক্তং ত্বঞ্চ বয়ং নিষ্কর-পৈতৃকরাজ্যস্য করং দাতুং ন শক্নুম ইতি। অতএব তে রাজ্যেঽধিকারং নাবাপুঃ।

বিশ্বনাথোঽপি যবনাধিপং পরিতোষ্য কাঁকদি প্রভৃতি বহুবিধ দেশান্ পৈতৃকরাজ্যাতিরিক্তান্ লব্ধা প্রসিদ্ধপ্রতাপ একত্রিংশদ্বর্ষান্ রাজা বভূব। তদবধি এতেষাং করদানমযোগি প্রবর্ত্ততে স্ম। ততস্তস্মিন্মৃতে যবনাধিপায় করং দত্বং রামচন্দ্রনাম্না প্রাপ্তরাজ্যঃ সুখেন ত্রয়োবিংশতিবর্ষং কালং নিনায়। তস্মিন্মৃতে তৎপুত্রঃ সুবুদ্ধিরায়ঃ পঞ্চবিংশতিবর্ষান্ রাজা বভূব। তস্মিন্মৃতে ত্রিলোচন রায়স্তস্য পুত্রস্ত্রিংশদ্বর্ষং রাজা বভূব। তস্মিন্নপি ক্ষিতিমধিশাসতি পরলোকং গতে তৎপুত্রঃ কংসারির্নৃপতিরভূৎ। ষড়্‌বিংশতিবর্ষং ক্ষিতিমধিশাস্য তস্মিন্মৃতে তৎপুত্রঃ হরীশান ঊনত্রিংশদ্বর্ষান্ নৃপো বভূব। তস্মিন্মৃতে তৎপুত্রঃ কাশীনাথরায়ঃ চতুস্ত্রিংশদ্বর্ষান্ রাজা বভূব। এতস্মিন ক্ষিতিমধিশাসতি ক্ষিতীশে ত্রিপুরাদিদেশাধিপেন ইন্দ্রপ্রস্থপুরেশ্বরযবনায় আকবরনাম্নে প্রেষিতগজযূথাৎ কশ্চিদ্‌হস্তী পরিভ্রষ্টঃ।

(ক) ম্লেচ্ছ অপশব্দে নীচজাতৌ। ম্লেচ্ছজাতি বলিলে কেবল যবন বুঝায় এমত নহে, কদাচার বিশিষ্ট নীচজাতি মাত্রকেই বুঝাইয়া থাকে। অর্জ্জুন, কৃষ্ণের রমণীগণকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিতেছেন, পথিমধ্যে আভীরগণ পতিহীনা কামিনীদিগকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিতে লাগিল। এস্থলে আভীরেরা ম্লেচ্ছ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

প্রেক্ষতশ্চৈব পার্থস্য বৃষ্ণ্যন্ধকবরস্ত্রিয়ঃ।
জগ্মুরাদায় তে ম্লেচ্ছা সর্ব্বতামুনিসত্তম।

বিষ্ণুপুরাণ। ৫। ৩৮। ২৮

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! পার্থের সম্মুখে বৃষ্ণি ও অন্ধক-কুলকামিনীদিগকে ম্লেচ্ছগণ লইয়া প্রস্থান করিল।

মামুদ নামা প্রসিদ্ধ যবনরাজ (খ) (গ) ইন্দ্রপ্রস্থপুরের অধিপতিকে পরাজয় করিয়া তথায় স্বকীয় আধিপত্য স্থাপন করেন।

এ স্থলে যাবনিক ইতিহাসের সঙ্গে অনেক গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। সুবক্তজিন খৃঃ ৯৯৬ সালে পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সুলতান মামুদ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। তিনি সপ্তদশ বার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং হিন্দু দেবালয় ও রাজভাণ্ডার লুঠ করিয়া গজনবী নগর বিপুল ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ করেন। তিনি চৌত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। অতএব খৃঃ ১০৩০ সাল পর্য্যন্ত আমরা তাঁহাকে জীবিত দেখিতে পাই। এদিকে দেখুন, ১৩৯৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত কামদেব রাজ্য শাসন করিতেছেন। এতদ্দ্বারা সময়ের এত অন্তর হইয়া পড়িতেছে যে, কিছুতেই উভয় মতের সামঞ্জস্য করিবার উপায় নাই। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সুলতান মামুদনামা কোন নৃপতি দীল্লির সিংহাসন অধিকার করেন নাই। মহম্মদ সা (১৩২৫-১৩৫১) ফিরুজ সা (১৩৫১-১৩৮৮) এবং মহম্মদ সা (১৩৯২-১৪১২) খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

ক্ষিতীশবংশাবলীর লেখক ভট্টনারায়ণের সন্তান সন্ততিগণের রাজত্বকাল

(খ) ক্ষিতীশবংশাবলিচরিতে "জবন" এইরূপ বর্গীয় জকারে লিখিত আছে। গ্রীসের সমীপবর্ত্তী দ্বীপ (ইওন) হইতে যদি যবন শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তবে উহা বর্গীয় জকারে লিখিত হওয়া সঙ্গত নহে।

পর্ব্বতাদিতে যবনের অপভ্রংশ শব্দ "যোনা এইরূপ অঙ্কিত আছে। যবনের অপভ্রংশে যোনা হওয়া অসম্ভব নহে। লবণ এই শব্দের অপভ্রংশে লোনা এইরূপ সচরাচর কথিত হইয়া থাকে।

যাঁহারা বলেন, ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত কোন হিন্দুস্থানী পণ্ডিতের বিরচিত, এস্থলেও তাঁহাদের মতের খণ্ডন হইতেছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পণ্ডিতেরা "যবন" শব্দের (ইয়ওন) এই প্রকার উচ্চারণ করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশের (য) বর্ণের এবং (জ) বর্ণের উচ্চারণগত কিছুই পার্থক্য নাই।

(গ) হস্তিনাপুর এবং ইন্দ্রপ্রস্থ এই দুই নগরের মধ্যে হস্তিনাপুর আধুনিক দিল্লীর অনেক উত্তরে গঙ্গানদীর কূলে অবস্থিত ছিল। চন্দ্রবংশীয় নিচক্ষু রাজার রাজত্বকালে ঐ নগর গঙ্গার গর্ভস্থ হইয়া যায়। অতঃপর, নিচক্ষু রাজা কৌশাম্বী নগরে গিয়া বাস করেন।

যোগঙ্গয়াপহৃতে হস্তিনাপুরে কৌশাম্ব্যাং
নিবৎস্যতি। (বিষ্ণুপুরাণ)

ইন্দ্রপ্রস্থ নগর দিল্লীর সন্নিকটে অবস্থিত ছিল।

নির্ণয় সম্বন্ধে যে ভ্রম করিয়াছেন, তাহাও বিবেচিত হয় না। ১০৭৮ খৃঃ অব্দে পঞ্চব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আগমন করেন, অতএব তাহার পূর্ব্বেই ত সুলতান্ মামুদ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

যদি স্যাৎ যথার্থই কামদেবপুত্র বিশ্বনাথাদির সময় সুলতান্ মামুদ দিল্লীর অধীশ্বর হইয়া থাকেন এবং ভট্টনারায়ণের অধস্তন একাদশ পুরুষের রাজত্বকাল ভ্রমশূন্য হয়, তবে বিক্রমপুরাধিপতি মহারাজ আদিশূরকে আমরা আরও বহু পূর্ব্বে বর্ত্তমান দেখিতে পাই। ভট্টনারায়ণ হইতে কামদেব পর্য্যন্ত এই দ্বাদশ পুরুষ সর্ব্বসমেত ৩১৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এদিকে যবনরাজ সুলতান্ মামুদ ৯৯৬ খৃঃ অব্দে ইন্দ্রপ্রস্থপুরাধিপকে সংগ্রামে পরাজয় করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। অতএব (১০৭৮—৩১৬) ৭৬২ খৃঃ অব্দে (৬০২ শকাব্দে) শ্রীহর্ষাদি পঞ্চবিপ্র আদিশূরের অনুষ্ঠিত যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন।

বিশ্বনাথের সিংহাসনাধিরোহণের ১৯৮ বৎসর পরে ষষ্ঠ পুরুষে আমরা কাশীনাথ রায়কে * দেখিতে পাই। তদীয় শাসনকালে প্রসিদ্ধ সম্রাট

---

* অরণ্যানীং পরিভ্রমন্ কদাচিৎ কস্মিংশ্চিৎ গ্রামে সমাগতা লোকান্ত্রাসয়ামাস। অথৈকদা কাশীনাথনারণ্য কুত্রচিৎ গ্রামে সমাগতা স গজঃ সমস্তান্ লোকান্ বিত্রাসয়ামাস। কাশীনাথোঽপি লোকমুখাৎ শ্রুত্বা বহুভিঃ সৈন্যৈঃ সমবেতস্তং গজং ব্যাপাদয়ামাস। এষ চ বৃত্তান্তস্তদ্দেশাবস্থিতযথার্থবৃত্তান্তলিখনার্থনিযুক্তামাত্যেন নিজস্বামিনে ইন্দ্রপ্রস্থপুরেশ্বর বরনায় বিশেষতো লিখিতঃ। ইন্দ্রপ্রস্থপুরেশ্বরোঽপি সম্যগবেত্য মহারোষাবিষ্টঃ কাশীনাথং নিয়ম্য প্রেরয়িতুং আহ্ জীরনামে রাজধন্যামধিকৃতং যবনং লিপনেনাজ্ঞাপয়ামাস সৈন্যং চাদিদেশ। অথ জাহাঙ্গীরনগরেশ্বরঃ প্রাপ্তানুজ্ঞো বহূনি সৈন্যানি দিদেশ উবাচ চ। কাশীনাথং সপরিবারং বদ্ধা ইন্দ্রপ্রস্থপুরে প্রেষয়ত ইতি।

কাশীনাথোঽপি নিজচরপ্রমুখাৎ সর্ব্বং জ্ঞাত্বা মন্ত্রিভির্মন্ত্রয়িত্বা পলায়মানো ভাগীরথীতীরং গন্তুমুপচক্রমে। যবনাধিপপ্রেষিত সৈন্যাং চ পশ্চাৎ পশ্চাদাগচ্ছন্তিস্ম। অথ কিয়তা দিনেন দিনেকদেশগম্যমার্গান্তরিতৌ যবনাধিপসৈন্যকাশীনাথৌ বভূবতুঃ।

ততো বাগোয়ানাখ্যপ্রদেশান্তর্গত আন্দুলিয়া নাম গ্রামপূর্ব্বভাগস্থিতং নদীমুত্তরীতুং কাশীনাথ উপবিবেশ। তত্রৈব কাচিৎ কৈবর্ত্তী মৎস্যান্ বিক্রেতুমাজগাম। কাশীনাথোঽপি মৎস্যান্ দৃষ্ট্বা হৃষ্টো বভূব চিন্তয়ামাস চ। মম বরাটাদিকং নাস্তি মৎস্যাশ্চ বহুদিনানি ন ভুক্তঃ। অতো মৎস্যাহরং কেনোপায়েন নেতব্য ইত্যাদি। অনন্তরং স্বহস্তাবস্থিতহীরকখচিতং স্বর্ণাঙ্গুরীয়কং তস্যৈ দিত্বা একং মহান্তং মৎস্যং জগ্রাহ জগাদ চ। মম পশ্চাদায়তকল্পো ভূত্যো ভবত্যৈ সমুচিতং মূল্যং মযা বিজ্ঞাপিতং দত্ত্বাঙ্গুরীয়কং নেষ্যতি। ততো যবনাধিপপ্রেষিতসৈন্যাং চ তত্রাগত্য বহুমূল্যহীরকখচিতস্বর্ণাঙ্গুরীয়কং কৈবর্ত্তীহস্তে দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছ। অরে কৈবর্ত্তি!

আকবর দিল্লীর অধীশ্বর ছিলেন। মুসলমানদের ইতিহাসানুসারে আকবর ১৫৫৬ খৃঃ অব্দে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ১৬০৫ খৃঃ অব্দে লোকান্তর গমন করেন। এস্থলে ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতের সঙ্গে মুসলমান ইতিহাসের কোন বিবাদ উপস্থিত হইতেছে না। কাশীনাথ রায় ১০৫৮ খৃঃ অব্দে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া ১৫৯২ খ্রীঃ অব্দে যবন সৈন্য কর্তৃক নিহত হন। সুতরাং তিনি যথার্থই আকবর সম্রাটের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এতদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, কামদেব গজনবী সম্রাট সুলতান মামুদের সমসাময়িক নহেন। তিনি ৯৯৬ খৃঃ অব্দে রাজ্যের অধিকারী হন। তৎকালে বিশ্বনাথ রায় জীবিত থাকিলে আমরা (৯৯৬×১৯৮) ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কাশীনাথ রায়কে বর্ত্তমান দেখিতে পাই। অতএব তিনি কদাচ বাদসাহ আকবরের সমকালীন হইতে পারেন না।

অতি প্রাচীন কাল হইতে মুসলমানদিগের ইতিহাস রচনায় বিলক্ষণ প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল দেখা যায়। তাঁহারা প্রসিদ্ধ ঘটনাগুলি যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়া যত্নপূর্ব্বক তাহা পাঠ করিতেন। হিন্দু ইতিহাসের ন্যায় মুসলমানদিগের ইতিতত্ত্ব বৃথা অলৌকিক গল্পে পরিপূর্ণ নহে। তবে তৎসমুদায় এক কালে কল্পনাবিরহিত এবং ভ্রমপরিশূন্য, আমরা এমন কথা বলিতে পারি না, অনেক স্থলে অবিতর্কিতরূপে বিশ্বাস করা যায় না। যাহা হউক, মুসলমানদের ইতিহাসে যতই কেন দোষ থাকুক না, সে সমস্ত মার্জ্জনীয়। কল্পনা দেবী যথার্থই যেন ম্লেচ্ছ বলিয়া ঘৃণাবিকৃত মুখভঙ্গীতে অপসৃত হইয়াছেন, পূজা গ্রহণ করিতে যবনেতিহাসে অধিষ্ঠিত হন নাই। যেখানে কল্পনা নাই; তথায় বাক্যের

ভার্য্যা বহুমূল্যমঙ্গুরীয়কং কুতঃ প্রাপ্তং তূর্ণং বদ। নোচেত্ত্বমপি চৌর্য্যোপেনং ভ্রমাহ ইতি তঙ্কয়ে। ততশ্চ দেশাধিপে তথা বিজ্ঞাপিতে তব সমুচিতদণ্ডোভবিষ্যতি। ইতি শ্রুত্বা কৈবর্ত্তো সসম্ভ্রমমাহ। একোব্রাহ্মণোমৎস্যং নীত্বা তন্মূল্যং বরাটকমদত্ত্বৈতদঙ্গুরীয়কং স্থাপয়িত্বা গতঃ। ততো যবনেশ্বর সৈন্যাঃ পুনরাহ। ক স ব্রাহ্মণঃ অস্মান্ দর্শয়। ততঃ সা কৈবর্ত্তো অম্বিষ্য তন্যাং নন্যাং স্ব স্বা অনন্যমনসা দেবতাং পূজয়ন্তং দৃষ্ট্বা। কথায়মাস। যবনাধিপসৈন্যাঃ চ তথা শ্রুত্বা কাশীনাথং ববন্ধ কিয়ন্তঃ পরিবারাশ্চ পলায়ন্তে স্ম। কাশীনাথোঽপি বদ্ধঃ সৈন্যেন নিবেদিতো ভূয়াধিপেন ঘাতিতোঽপি জগন্নারায়ণনাম্নোঽষ্টৈকক্ষান্ত্রবন্ ত্যক্তপ্রাণো যোগিভিঃপাদাভ্যাং পরিমাণ। কাশীনাথপত্নী চ সনয়া স্বর্ণশতদ্বয়সহিতা একেন ভৃত্যেনৈকয়া চ দাস্যা পরিচারিতৈক ব্রাহ্মণেন চ সহিতা হরিকৃষ্ণসমুদ্রস্য বাটীং পিতৃমন্দির ইব তস্থৌ।

ইতি ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

অঙ্গ ভেদ করিয়া মধ্যাহ্নরবির ন্যায় সত্যের জ্যোতি ফাটিয়া পড়িতেছে। কল্পনা নাই, যদি থাকে—অধিক নহে, তাও বসন-ভূষণ-বিহীন,—বিবস্ত্র, নিরলঙ্কৃত। চক্ষুর সম্মুখে পড়িলেই চিনিতে পারা যায়,—আমরা উপরের কপট লজ্জাকেই ত ভয় করি, নচেৎ আশঙ্কা কি! যাবনিক ইতিহাস বাহ্য-সজ্জা-বিরহিত, প্রতি অঙ্গই আর্জ্জব-সম্পন্ন, সে কারণ তৎপ্রতি আমরা অধিক বিশ্বাস করিতে পারি। অতএব সুলতান মামুদ যে কামদেবের সমকালীন লোক নহেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

কামদেবের পুত্র বিশ্বনাথাদির গৃহবিচ্ছেদ সহজে নিবৃত্ত হইল না। পরিশেষে তাঁহারা বিবাদ ভঞ্জনের নিমিত্ত দিল্লীর সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্রপ্রস্থাধিপতি বহুকালেও তাঁহাদের ভ্রাতৃবিরোধ দূরীভূত করিতে অসমর্থ হইয়া বিবাদপদ রাজ্যের রাজস্ব দিতে অনুমতি করিলেন। রাজদত্ত নিষ্কর পৈতৃক রাজ্য, কিরূপেই বা তাহাতে করদানক্রম প্রবর্ত্তিত করা যায়—এই ভাবিয়া বিশ্বনাথের অনুজেরা বিস্তর আপত্তি করিলেন। বিশ্বনাথ দেখিলেন দিল্লীশ্বর প্রবল প্রতাপান্বিত; বিশেষতঃ তদীয় অর্থ-লোলুপ দৃষ্টি একবার যখন তাঁহার রাজ্যের উপর নিপতিত হইয়াছে, তখন রাজস্ব প্রদানে অসম্মত হইলে কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই। অগত্যা তিনি উপ-যুক্ত কর দিবার অঙ্গীকার করিলেন। সম্রাট নিরতিশয় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সমস্ত পৈতৃক রাজ্য এবং তদতিরিক্ত আরও কতিপয় পরগণার অধীশ্বর করিয়া দিলেন। তদবধি গৌড়রাজ-আদিশূর-প্রদত্ত নিষ্কর রাজ্যে কর দান প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিল। তৎপরে রামচন্দ্র, সুবুদ্ধিরায়, ত্রিলোচন, কংসারি এবং ষষ্ঠীদাস এই পঞ্চপুরুষ সুখে রাজ্য-শাসন করেন।

ষষ্ঠীদাসের পুত্র কাশীনাথ রায়ের অধিকারকালে ত্রিপুরাধিপতি কতক-গুলি হস্তী দিল্লীতে প্রেরণ করেন। তৎকালে আকবর তথাকার সম্রাট ছিলেন। একটী উন্মত্ত গজ যূথভ্রষ্ট হইয়া কাশীনাথের জমিদারীতে বিস্তর উপদ্রব করে। তিনি লোকমুখে এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে হস্তীকে বিনাশ করিলেন। একে সম্রাট, তাহে তদানীন্তন স্বেচ্ছাচারী যবন; চিত্তের খেয়াল—রাজনীতি মস্তিকের ঝোঁক—বিচার; রাজ অধিকারের, পতঙ্গ বিনষ্ট করিলে নিস্তার নাই,—এ ত মাতঙ্গ! স্থানীয় রাজকীয় সংবাদদাতা তাবৎ বিবরণ আকবরকে লিখিয়া পাঠাইলেন।

পাঠক! দেখুন, যবনাধিকারকালে দেশের সমস্ত বৃত্তান্ত সম্রাটকে লিখিয়া পাঠাইবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে একজন অমাত্য নিযুক্ত থাকিতেন। রাজ্য মধ্যে কোন অসদৃশ ব্যাপার ঘটিলে তদ্দণ্ডেই তাহা সম্রাটকে লিখিয়া পাঠাইতেন। কিন্তু তাৎকালিক বিচারপতিরা স্বেচ্ছাচারী এবং উৎকোচ-লোলুপ ছিলেন। অর্থবলে সকলই হইতে পারিত। সুতরাং সুবিচারের প্রত্যাশা অল্পই ছিল।

স্থানীয় সংবাদদাতা সম্রাটকে কি প্রণালীতে পত্র লিখিয়াছিলেন, তদ্বিষয় এক্ষণে যথাযথ অবগত হইবার উপায় নাই। দিল্লীশ্বর পত্র পাঠে সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া কাশীনাথ রায়কে সত্বর বন্দীভূত করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে প্রেরণ করিতে আদেশ দিলেন। বোধ করি, পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গালার নবাবের সঙ্গে কাশীনাথ রায়ের অপ্রণয় ছিল, তিনি তাহার যথোচিত শাস্তি বিধানার্থ সম্রাটের নিকট কল্পিত দোষারোপও করিয়া থাকিবেন। কারণ মত্ত হস্তী হত্যা করিয়া কাশীনাথ রায় উচিত কর্ম্মই করিয়াছিলেন। যাহা হউক, লোকে কথায় বলে—"ধরে আনিতে বলিলে বেঁধে আনে।" নবাবও তাহাই করিয়াছিলেন। তিনি সম্রাটের আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র সৈন্য প্রেরণ করিয়া কাশীনাথ রায়ের প্রাণবধ করাইলেন। নবাবের শাসন কালে বিচারের প্রথা এই প্রকারই ছিল, সে কারণ পূর্ব্ব হইতে কোন বৈর ছিল কি না অনুধানবলে স্থির করিবার উপায় নাই। প্রত্যুত, কাশীনাথের প্রতি তাঁহার নৃশংস আচরণ দেখিলে পূর্ব্ব হইতে নিদারুণ অস্বরস ছিল তাহা স্পষ্ট অনুমিত হয়।

কাশীনাথ লোকপরম্পরায় শুনিলেন নবাবের সৈন্য তাঁহার অনুসরণে আসিতেছে। তিনি অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া স্বীয় সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে গৃহ হইতে ভাগীরথীকূলাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। সৈন্যগণও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। কয়েক দিন পরে যশোয়ানাথ্য পরগণার অন্তর্গত আন্দুলিয়া গ্রামের পূর্ব্বভাগাবস্থিত জলঙ্গী নদী উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত তন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। তিনি পথিমধ্যে দেখিলেন জনৈক ধীবরকন্যা মৎস্য বিক্রয় করিতে যাইতেছে। অনেক দিন মৎস্য ভোজন করেন নাই, কিন্তু তাঁহার নিকটে এক কপর্দ্দকও ছিল না। সুতরাং নিজ হস্তস্থিত হীরক খচিত বহুমূল্য স্বর্ণাঙ্গুরীয় দিয়া একটী বৃহৎ মৎস্য ক্রয় করিলেন এবং কৈবর্ত্তীকে এই সঙ্কেত করিয়া দিলেন যে, পশ্চাতে তাঁহার অনুচরেরা আসি-

তেছে। তাহারা এই অঙ্গুরীয় লইয়া মৎস্যের সমুচিত মূল্য দিবে। দৈব রুষ্ট হইলে কর্ম্ম-বিপাক কে খণ্ডাইতে পারে? কাল মৎস্যক্রয়ই কাশী-নাথের বিনাশের কারণ হইল। হয় ত শত্রুহস্ত হইতে তিনি নির্ব্বিঘ্নে অব্যা-হতি পাইতেন; কিন্তু লোভেই মনুষ্যের মৃত্যু। কাশীনাথের পশ্চাদ্গামী যবনসৈন্যেরা কৈবর্ত্তীর হস্তে বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরীয় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—রে কৈবর্ত্তি! এই বহুমূল্য অঙ্গুরী তুই কোথায় পাইলি? বোধ হইতেছে, তুই ইহা কোথাও হইতে অপহরণ করিয়া আনিয়াছিস? দেশাধিপতিকে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিয়া তোর সমুচিত দণ্ডবিধান করিব"। যবনসৈন্যের ভর্ৎসিত বাক্যে ভীরুস্বভাবা কৈবর্ত্তী ভয়সঙ্কুচিত চিত্তে উত্তর করিল—"জনৈক ব্রাহ্মণ মৎস্য ক্রয় করিয়া পশ্চাদ্গামী ভৃত্যের নিকট তাহার মূল্য লইবার নিমিত্ত আমাকে এই অঙ্গুরী দিয়াছেন।" সৈনিকেরা জিজ্ঞাসা করিল—"সে ব্রাহ্মণ কোথায়, শীঘ্র দেখাইয়া দাও।" কৈবর্ত্তী ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া দেখিল, কাশীনাথ গঙ্গাজলে স্নানান্তর একাগ্রচিত্তে ইষ্টদেবের অর্চ্চনা করি-তেছেন। কালের কুটিলা গতি; কি অনুশোচনা! দৈবানুষ্ঠানেও তাহার গতি নিরুদ্ধ হয় না। নিকুম্ভাগারে রক্ষোবীর মেঘনাদের বিনাশ! দুরাত্মা যবন সৈন্যেরা কাশীনাথকে বন্দী করিয়া তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে প্রাণনাশ করিল। কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে এইরূপ প্রথিত আছে, তিনি বন্দীভূত হইয়া দিল্লীতে প্রেরিত হইয়াছিলেন; তথায় কারাগারের দারুণ যন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ করেন। তদীয় পত্নী তৎকালে কঠোর গর্ভাবস্থায় ছিলেন। তিনি এক জন পরিচারক ব্রাহ্মণ এবং এক জন দাসীর সমভিব্যাহারে প্রসিদ্ধ জমিদার হরিকৃষ্ণ সমু-দ্দারের বাটীতে আশ্রয় লইলেন। হরিকৃষ্ণ সমুদ্দার নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি কাশীনাথের স্ত্রীকে দত্রিমা দুহিতার ন্যায় পরম স্নেহে লালন পালন করিতে লাগিলেন।

মনুসংহিতা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সংরক্ষণার্থং জন্তূনাং রাত্রাবহনি বা সদা।
শরীরস্যাত্যয়ে চৈব সমীক্ষ্য বসুধাঞ্চরেৎ ॥ ৬৮ ॥

শরীরে পীড়া উপস্থিত হইলেও পাছে পিপীলিকাদি সূক্ষ্ম জীবগণের

প্রাণনাশ হয়, এই শঙ্কায় কি রাত্রি কি দিনের বেলা সর্ব্বদা পৃথিবী দর্শন করিয়া পদক্ষেপ করিবে।

অহ্না রাত্র্যা চ যান্ জন্তূন্ হিনস্ত্যজ্ঞানতোযতিঃ।
তেষাং স্নাত্বা বিশুদ্ধ্যর্থং প্রাণায়ামান্ ষড়াচরেৎ ॥ ৬৯ ॥

যতি জানিতে না পারিয়া রাত্রিতে অথবা দিবসে যে সকল জীবের প্রাণ সংহার করেন, সেই পাপ নাশার্থ স্নান করিয়া ছয় বার প্রাণায়াম করিবেন। পূরক-কুম্ভক-রেচকক্রিয়া-ক্রমে তিন বার প্রণব ও ব্যাহৃতিযুক্ত গায়ত্রী পাঠের নাম প্রাণায়াম।

প্রাণায়ামাব্রাহ্মণস্য ত্রয়োপি বিধিবৎ কৃতাঃ।
ব্যাহৃতিপ্রণবৈর্যুক্তা বিজ্ঞেয়ম্পরমন্তপঃ ॥ ৭০ ॥

ব্রাহ্মণ বিধিপূর্ব্বক প্রণব ও ব্যাহৃতি সহিত যদি তিন বারও প্রাণায়াম করে, তাহা তাহার শ্রেষ্ঠ তপস্যা বলিয়া জানিবে।

দহ্যন্তে ধ্মায়মানানাং ধাতূনাং হি যথা মলাঃ।
তথেন্দ্রিয়াণাং দহ্যন্তে দোষাঃ প্রাণস্য নিগ্রহাৎ ॥ ৭১ ॥

স্বর্ণ রজতাদি ধাতু দ্রব্য অগ্নিতে দাহিত হইলে তাহার ময়লা যেমন পরিষ্কার হয়, তেমনি প্রাণায়াম দ্বারা ইন্দ্রিয়কৃত দোষের সংশোধন হইয়া থাকে।

প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্ধারণাভিশ্চ কিল্বিষং।
প্রত্যাহারেণ সংসর্গান্ ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্ ॥ ৭২ ॥

প্রাণায়াম দ্বারা রাগাদি দোষের, ব্রহ্মে মনোনিবেশ দ্বারা পাপের, বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ দ্বারা সংসর্গ জন্য দোষের এবং ঈশ্বর ধ্যান দ্বারা ক্রোধ লোভাদির নিবারণ হয়।

উচ্চাবচেষু ভূতেষু দুর্জ্ঞেয়ামকৃতাত্মভিঃ।
ধ্যানযোগেন সম্পশ্যেৎ গতিমস্যান্তরাত্মনঃ ॥ ৭৩ ॥

যাহাদের অন্তঃকরণ শাস্ত্র দ্বারা সংস্কৃত না হয়, তাহারা এই জীবাত্মার উৎকৃষ্ট-অপকৃষ্ট-দেবপশ্বাদি-যোনিতে জন্মপ্রাপ্তি জানিতে পারে না। অতএব ব্রহ্মধ্যাননিষ্ঠ হইয়া জীবের গতি দর্শন করিবে।

সম্যগ্দর্শনসম্পন্নঃ কর্ম্মভির্ন নিবধ্যতে।
দর্শনেন বিহীনস্তু সংসারম্প্রতিপদ্যতে ॥ ৭৪ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি পাপ পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হয় না। পূর্ব্ব জন্মা-

র্জ্জিত পাপ পুণ্য ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞান নাই, সেই ব্যক্তিই জন্ম মরণ বন্ধ প্রাপ্ত হয়।

অহিংসয়েন্দ্রিয়াসংগৈর্বৈদিকৈশ্চৈব কর্ম্মভিঃ।
তপসশ্চরণৈশ্চোগ্রৈঃ সাধয়ন্তীহ তৎপদং ॥ ৭৫ ॥

অবৈধ হিংসা পরিত্যাগ, বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ, বেদোক্ত নিত্য-কর্ম্ম, চান্দ্রায়ণাদি ব্রতাদির অনুষ্ঠান, এই সকল দ্বারা ব্রহ্মপদ লাভ হয়।

সংসারের প্রতি বৈরাগ্য মোক্ষের প্রধান সাধন। নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় দ্বারা দেহের অসারতা বর্ণন করিয়া সেই বৈরাগ্যের উৎপাদন চেষ্টা করা হইতেছে।

অস্থিস্থূণং স্নায়ুযুতং মাংসশোণিতলেপনং।
চর্ম্মাবনদ্ধং দুর্গন্ধি পূর্ণং মূত্রপুরীষয়োঃ ॥ ৭৬ ॥

গৃহের সহিত শরীরের উপমা দেওয়া হইতেছে। অস্থিরূপ স্থূণা (খুঁটী) বিশিষ্ট, স্নায়ুরূপ রজ্জু যুক্ত, মাংস ও রুধির দ্বারা উপলিপ্ত, চর্ম্মাচ্ছাদিত, মূত্র ও পুরীষে পূর্ণ, অতএব দুর্গন্ধি।

জরাশোকসমাবিষ্টং রোগায়তনমাতুরং।
রজস্বলমনিত্যঞ্চ ভূতাবাসমিমং ত্যজেৎ ॥ ৭৭ ॥

জরা-রোগ-শোক-যুক্ত, শীতোষ্ণাদি-ক্লেশ-সহনে কাতর, রজোগুণান্বিত, বিনশ্বর, পৃথিব্যাদি-ভূত-নির্ম্মিত, এই দেহকে পরিত্যাগ করিবে।

নদীকূলং যথা বৃক্ষোবৃক্ষং বা শকুনির্যথা।
তথা ত্যজন্নিমন্দেহং কৃচ্ছ্রাৎ গ্রাহাৎ বিমুচ্যতে ॥ ৭৮ ॥

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি এই অসার দেহ পরিত্যাগ করিয়া কুম্ভীরাদির আক্রমণ হইতে মুক্তি লাভের ন্যায় এই সংসারে দারুণ কষ্ট হইতে মুক্ত হয়। সেই দেহত্যাগটী দুই প্রকারে ঘটিতে পারে। এক, আপনার অনিচ্ছায় নিজ কর্ম্ম-বশে; দ্বিতীয়, ভীষ্মাদির ন্যায় স্বেচ্ছাক্রমে। এ বিষয়ে দুটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। প্রথম, নদীকূলস্থ বৃক্ষ আপনার যে পতন হইবে, তাহা জানিতে পারে না, বন্যার প্রভাবে স্রোতোবেগে পতিত হইয়া নদীকূল পরিত্যাগ করিয়া দূরে নীত হয়। দ্বিতীয়, বৃক্ষস্থ পক্ষী যেমন ইচ্ছাক্রমে বৃক্ষ পরি-ত্যাগ করে।

প্রিয়েষু স্বেষু সুকৃতমপ্রিয়েষু চ দুষ্কৃতং।
বিসৃজ্য ধ্যানযোগেন ব্রহ্মাভ্যেতি সনাতনং ॥ ৭৯ ॥

ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি আপনার প্রিয় ব্যক্তিতে সুকৃত ও অপ্রিয় ব্যক্তিতে দুষ্কৃত সমর্পণ করিয়া ধ্যানযোগে ব্রহ্ম লাভ করে।

যদা ভাবেন ভবতি সর্ব্বভাবেষু নিস্পৃহঃ।
তদা সুখমবাপ্নোতি প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতং ॥ ৮০ ॥

যখন বিষয়-দোষ সুন্দররূপে বুঝিতে পারিয়া সকল বিষয়েই স্পৃহাশূন্য হয়, সেই সময়ে ইহলোকে সন্তোষসুখ ও পরলোকে নিত্য মোক্ষসুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অনেন বিধিনা সর্ব্বাংস্ত্যক্ত্বা সংগান্ শনৈঃ শনৈঃ।
সর্ব্বদ্বন্দ্ববিনির্ম্মুক্তোব্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠতে ॥ ৮১ ॥

উক্ত রূপে পুত্র কালত্র প্রভৃতিতে নির্ম্মম ও মানাপমানাদিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মে লীন হয়।

ধ্যানিকং সর্ব্বমেবৈতৎ যদেতদভিশব্দিতং।
ন হ্যনধ্যাত্মবিৎ কশ্চিৎ ক্রিয়াফলমুপাশ্নুতে ॥ ৮২ ॥

উপরে পুত্র কলত্র প্রভৃতিতে মমত্বত্যাগ ও মানাপমানাদি পরিত্যাগের যে কথা বলা হইল, তাহা সকলের হয় না। যে ব্যক্তির জীবাত্মাকে পরমাত্ম-রূপে জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহারই হয়, আর যাহার সে জ্ঞান হয় নাই, তাহার হয় না।

পূর্ব্বে ব্রহ্মধ্যানের কথা বলা হইয়াছে, এক্ষণে বেদজপাদির কথা বলা হইতেছে।

অধিযজ্ঞং ব্রহ্ম জপেদাধিদৈবিকমেব চ।
আধ্যাত্মিকঞ্চ সততং বেদান্তাভিহিতঞ্চ যৎ ॥ ৮৩ ॥

যজ্ঞ, বেদ, দেবতা, জীবাত্মাকে অধিকার করিয়া ব্রহ্মপ্রতিপাদক যে কথা বলা হইয়াছে এবং বেদান্তে যে কিছু ব্রহ্ম সংক্রান্ত কথা কথিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বদা জপ করিবে।

ইদং শরণমজ্ঞানামিদমেব বিজানতাং।
ইদমন্বিচ্ছতাং স্বর্গমিদমানন্ত্যমিচ্ছতাং ॥ ৮৪ ॥

যে ব্যক্তি বেদার্থ না জানে, এই বেদরূপ ব্রহ্ম জপই তাহার গতি। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, অর্থ না জানিয়াও বেদের আবৃত্তিমাত্রে ফল হয়। আর, যাহারা বেদার্থ জানে, বেদপাঠ তাহারও গতি। এবং যাহারা স্বর্গ ও মোক্ষ ইচ্ছা করে, এই বেদ পাঠ তাহাদেরও গতি।

অনেন ক্রমযোগেন পরিব্রজতি যোদ্বিজঃ।
স বিধূয়েহ পাপ্যানম্পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ৮৫ ॥

যে ব্যক্তি উক্তরীতিতে পরিব্রজ্যাশ্রম আশ্রয় করে, সে ইহলোকে পাপ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।

এষ ধর্ম্মোঽনুশিষ্টোবোযতীনাং নিয়তাত্মনাং।
বেদসংন্যাসিকানান্তু কর্ম্মযোগন্নিবোধত ॥ ৮৬ ॥

সংযতাত্মা যতিদিগের এই ধর্ম্ম আপনাদিগকে বলা হইল। এক্ষণে যতিবিশেষের কর্ম্মযোগ বলা হইতেছে, তাহা শ্রবণ করুন। যতি চারি প্রকার কুটীচর, বহূদক, হংস আর পরমহংস। এক্ষণে কুটীচরকে যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহাই বলা হইতেছে।

ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থোযতিস্তথা।
এতে গৃহস্থপ্রভবাশ্চত্বারঃ পৃথগাশ্রমাঃ ॥ ৮৭ ॥

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও যতি এই পৃথক পৃথক চারিটী আশ্রমের গৃহস্থাশ্রমই মূল। গৃহস্থাশ্রম কিরূপে মূল তাহা ক্রমে ব্যক্ত হইতেছে।

সর্ব্বেঽপি ক্রমশস্ত্বেতে যথাশাস্ত্রং নিষেবিতাঃ।
যথোক্তকারিণং বিপ্রং নয়ন্তি পরমাঙ্গতিং ॥ ৮৮ ॥

ব্রাহ্মণ যদি শাস্ত্রানুসারে এই চারি আশ্রমের বিহিত অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে মোক্ষরূপ তাহার পরম গতি লাভ হয়। ক্রমান্বয়ে এই চারি আশ্রম পরে পরে ভোগ করিতে হইবে এরূপ নয়, ইহার অন্যতর যে কোন আশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে সদ্গতি লাভ হইতে পারে।

সর্ব্বেষামপি চৈতেষাং বেদস্মৃতিবিধানতঃ।
গৃহস্থ উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ স ত্রীনেতান্ বিভর্ত্তি হি ॥ ৮৯ ॥

মনুপ্রভৃতি মহর্ষিগণ এই চারি আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কারণ, গৃহস্থ ভিক্ষা দানাদি দ্বারা অপর তিন আশ্রমীকে প্রতিপালন করিয়া থাকে।

যথা নদীনদাঃ সর্ব্বে সাগরে যান্তি সংস্থিতিং।
তথৈবাশ্রমিণঃ সর্ব্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিং ॥ ৯০ ॥

যেমন সমুদায় নদ নদী প্রভৃতি শেষে সমুদ্রে গিয়া অবস্থিতি করে, তেমনি গৃহস্থ অপর তিন আশ্রমীর অবস্থিতির স্থান। অর্থাৎ গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়াই উহারা জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

চতুর্ভিরপি চৈবৈতৈর্নিত্যমাশ্রমিভির্দ্বিজৈঃ।
দশ লক্ষণকোধর্ম্মঃ সেবিতব্যঃ প্রযত্নতঃ॥ ৯১॥

এই চারি আশ্রমস্থ দ্বিজাতিগণ যত্নপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ দশটী ধর্ম্মের নিত্য সেবা করিবে।

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্ব্বিদ্যা সত্যমক্রোধোদশকং ধর্ম্মলক্ষণং॥ ৯২॥

সেই দশটী ধর্ম্ম এই—ধৃতি,অর্থাৎ সন্তোষ, অপরে অপকার করিলে প্রত্য-পকার না করার নাম ক্ষমা, সম্মুখে বিকারের হেতু উপস্থিত হইলেও মনের বিকার না হবার নাম দম, গোবিন্দরাজ বলেন শীতাতপাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণুতার নাম দম, অন্যায় করিয়া পরধন গ্রহণ না করাকে অস্তেয় কহে, শাস্ত্রানুসারে মৃত্তিকা ও জল দ্বারা দেহ শুদ্ধ করাকে শৌচ কহে, বিষয় হইতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের নিবারণের নাম ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধীশব্দে শাস্ত্রাদির তত্ত্বজ্ঞান এবং বিদ্যাশব্দে আত্মজ্ঞান, যথার্থ কথনের নাম সত্য, ক্রোধের হেতু উপস্থিত হইলেও ক্রোধের উদয় না হওয়াকে অক্রোধ কহে।

দশলক্ষণানি ধর্ম্মস্য যে বিপ্রাঃ সমধীয়তে।
অধীত্য চানুবর্ত্তন্তে তে যান্তি পরমাঙ্গতিং॥ ৯৩॥

যে সকল ব্রাহ্মণ এই দশবিধ ধর্ম্মের স্বরূপ অবগত হইয়া তদনুরূপ আচ-রণ করে, তাহাদেরই পরম গতি লাভ হয়।

দশলক্ষণকং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ সমাহিতঃ।
বেদান্তং বিধিবৎ শ্রুত্বা সংন্যসেদনৃণোদ্বিজঃ॥ ৯৪॥

দ্বিজাতিগণ সংযতমনে উক্ত দশবিধ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া উপনিষদা-দির প্রতিপাদ্য অর্থ শ্রবণ করিয়া এবং দেবাদি ঋণ পরিশোধ করিয়া সংন্যাস ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে।

সংন্যস্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কর্ম্মদোষানপানুদন্।
নিয়তোবেদমভ্যস্য পুত্রৈশ্বর্য্যে সুখং বসেৎ॥ ৯৫॥

গৃহস্থ-কর্ত্তব্য অগ্নি হোত্রাদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এবং প্রাণায়ামাদি দ্বারা ক্ষুদ্র-জীব-বধজনিত পাপের অপনোদন করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইয়া সর্ব্বদা বেদ অভ্যাস পূর্ব্বক পুত্রকৃত জীবিকা ভোগ করিয়া সুখে বাস করিবে। কুটীচর যতির পক্ষে এই ব্যবস্থা। কুটীচর যতি পুত্রগৃহে অবস্থান করিয়া পুত্রের কৃত জীবিকা অবলম্বন করিয়া সুখে কালাতিপাত করে।

এবং সংন্যস্য কর্ম্মাণি স্বকার্য্যপরমোঽস্পৃহঃ।
সংন্যাসেনাপহত্যৈনঃ প্রাপ্নোতি পরমাঙ্গতিং ॥ ৯৬ ॥

উক্ত প্রকারে গৃহস্থ-কর্ত্তব্য অগ্নিহোত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া আত্ম-সাক্ষাৎকাররূপ কার্য্যে নিরত ও স্বর্গাদিলাভেও নিস্পৃহ হইয়া প্রব্রজ্যা দ্বারা পাপ বিনাশপূর্ব্বক পরম গতি লাভ করিবে।

এষবোঽভিহিতোধর্ম্মোব্রাহ্মণস্য চতুর্ব্বিধঃ।
পুণ্যোঽক্ষয়ফলঃ প্রেত্য রাজ্ঞাং ধর্ম্মং নিবোধত ॥ ৯৭ ॥

ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচারি-গৃহস্থাদি-ভেদে এই চারিপ্রকার ধর্ম্ম আপনাদিগকে বলিলাম, এই পবিত্র ধর্ম্ম পরকালে অক্ষয়-ফলদায়ক হয়। এক্ষণে রাজধর্ম্ম কহিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন।

সাংখ্যদর্শন।

পঞ্চম অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সাংখ্য সূত্রকার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে স্বসিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিয়াছেন, পরমত খণ্ডন দ্বারা তাহা দৃঢ়ীভূত করিবার নিমিত্ত পঞ্চম অধ্যায়ের আরম্ভ করিতেছেন।

বিপক্ষের প্রথম আপত্তি এই, সূত্রকার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম সূত্রে অথ শব্দ দ্বারা যে মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন, তাহার কোন প্রয়োজন নাই। এই আপত্তির খণ্ডনার্থ বলা হইতেছে।

মঙ্গলাচরণং শিষ্টাচারাৎ ফলদর্শনাৎ শ্রুতিতশ্চেতি ॥ ১ ॥ সূ ॥

মঙ্গলাচরণং যৎ কৃতং তত্ত্রৈতৈঃ প্রমাণৈঃ কর্ত্তব্যতাসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। ইতি শব্দোহেত্বন্তরাকাঙ্ক্ষানিরাসার্থঃ ॥ ভা ॥

শিষ্ট ব্যক্তিদিগের রীতি আছে, তাঁহারা মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকেন, ইহার ফলও দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রুতিতেও ইহার বিধি আছে। এই সকল দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে, মঙ্গলাচরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

সাংখ্য সূত্রকার কহিয়াছেন, ঈশ্বরসিদ্ধি হয় না, পূর্ব্বপক্ষবাদী তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন, এ কথা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। কারণ,

ঈশ্বর কর্ম্মের ফল দান করেন। কর্ম্মের ফলদাতৃত্ব-হেতু ঈশ্বরসিদ্ধি হইতেছে, এই অভাসে সূত্রকার কহিতেছেন।

নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্ম্মণা তৎসিদ্ধেঃ ॥ ২ ॥ সূ ॥

ঈশ্বরাধিষ্ঠিতে কারণে কর্ম্মফলরূপপরিণামস্য নিষ্পত্তির্ন যুক্তা। আবশ্যকেন কর্ম্মণৈব ফলনিষ্পত্তিসম্ভবাদিত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

তুমি ঈশ্বরকে ফলনিষ্পত্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ, কিন্তু তোমার এ বাক্যটী যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না। কর্ম্মদ্বারাই ফলনিষ্পত্তি হয়। কর্ম্ম দ্বারাই যদি ফলনিষ্পত্তি হইল, সুতরাং ঈশ্বরসিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মিল।

ঈশ্বর যে ফলের দাতা নন পর পর সূত্র দ্বারা তাহা সপ্রমাণ করা হইতেছে।

স্বোপকারাদধিষ্ঠানং লোকবৎ ॥ ৩ ॥ সূ ॥

ঈশ্বরাধিষ্ঠাতৃত্বে স্বোপকারার্থমেব লোকবদধিষ্ঠানং স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, লোকে উপকারভাগী হইবে বলিয়া অপরকে কর্ম্ম করাইয়া তাহার বেতনাদিরূপ ফল দান করে, ঈশ্বরকে যদি সেইরূপ ফলদাতা বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বরের নিজের উপকার সম্বন্ধ ঘটিয়া উঠে।

ভাল ঈশ্বরেরই উপকার হয়, এই কথা বলিব তাহাতে ক্ষতি কি? এই আশঙ্কায় বলা হইতেছে।

লৌকিকেশ্বরবদিতরথা ॥ ৪ ॥ সূ ॥

ঈশ্বরস্যাপ্যুপকারস্বীকারে লৌকিকেশ্বরবদেব সোঽপি সংসারী স্যাৎ। অপূর্ণকামতয়া দুঃখাদিপ্রসঙ্গাদিত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

ঈশ্বরের উপকার স্বীকার করিলে তিনি লৌকিক ঈশ্বর ও সংসারী হইয়া পড়েন, সুতরাং সংসারী ব্যক্তির ন্যায় অভীষ্টবিষয়ে মনোরথ পূর্ণ না হইলে দুঃখ উপস্থিত হয়।

ভাল তিনি সংসারী হন হউন, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না হইলে দুঃখ হয় হউক, তাহাতে ক্ষতি কি? এই আভাসে সূত্রকার কহিতেছেন।

পারিভাষিকো বা ॥ ৫ ॥ সূ ॥

সংসারসত্ত্বেঽপি চেদীশ্বরস্তর্হি সর্গাদ্যুৎপন্নপুরুষে পরিভাষামাত্রমস্মাকমিব-দ্ভবতামপি স্যাৎ। সংসারিত্বাপ্রতিহতেচ্ছত্বযোর্ব্বিরোধাদিত্যৈশ্বর্য্যানুপপত্তেরিত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

ঈশ্বর যদি সংসারী হইলেন, সংসারী ব্যক্তির ন্যায় যদি তিনি ইচ্ছার ব্যাঘাত জন্মিলে দুঃখী হইলেন, তাহা হইলে সামান্য পুরুষে আর তাঁহাতে ইতরবিশেষ কি? নিত্য ঐশ্বর্য্য ও নিত্য সুখ ঈশ্বরের লক্ষণ, সংসারী ঈশ্বরে তাহার সম্ভাবনা নাই। যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে ঈশ্বর এই শব্দটী পারিভাষিক শব্দ মাত্র হইয়া উঠে।

ত্রিভঙ্গ মুখোপাধ্যায়।

ইনি রামনাথ তর্কপঞ্চাননের পুত্র। রামনাথ অতি সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার ষড় দর্শনে বিদ্যা ছিল, কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তির কথা দেশের সকলেই জানিতেন। তাঁহার তর্কশক্তি এমনি প্রখর ছিল, যে বিচার কালে বোধ হইত যেন দাবানল সঞ্চরণ করিতেছে। বরং যোধগণ ত্রিবিক্রমণস্থায়ী হইয়া অর্জ্জুনশর সহ্য করিতে পারিত,কিন্তু কোন পণ্ডিতই তাঁহার সম্মুখীন হইয়া এক ক্ষণও বিচার করিতে পারিত না। তিনি প্রতিনিয়ত ২০।২৫ জন ছাত্র লইয়া ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহা হইতে ছাত্রদিগের সর্ব্ব উপপত্তি হইত। তিনি যেমন পণ্ডিত, তেমনি সুজন, তেমনি বাক্‌পটু। তাঁহার কীর্ত্তি স্বল্প-কাল-মধ্যে দিগ্দিগন্তব্যাপিনী হইয়া উঠিল। তিনি সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অবাধে তাঁহার অধ্যাপনা-কার্য্য-সম্পাদন-নিমিত্ত ধনী ভূস্বামিগণ তাঁহাকে বিস্তর ভূমি দান করিলেন। এদিকে একপত্নী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহাতেও তাঁহার নানা আয়দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া উঠিল। তিনি ক্রমে বিপুল-বিভবশালী হইলেন।

ত্রিভঙ্গ রামনাথের একমাত্র পুত্র। তাহার বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত তিনি যত্ন ও পরিশ্রমের অণুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু ঊষর ভূমিতে উৎকৃষ্ট বীজ বপনের ন্যায় সমুদয় বিফল হইল। যে সকল ছাত্র তাঁহার পিতার নিকটে অধ্যয়ন করিত, তাহার মধ্যে এক গাঁজাখোর ছিল। সেই গাঁজাখোর সময়ে সময়ে অদূরবর্ত্তী এক গাঁজার আড্‌ডায় ত্রিভঙ্গকে লইয়া যাইত। রামনাথ তাহার কিছুই জানিতে পারিতেন না। ত্রিভঙ্গ সংসর্গ দোষে ক্রমে একজন পাকা গাঁজাখোর হইয়া উঠিল। ব্যাকরণ সাহিত্য অলঙ্কারাদি শাস্ত্রের অপেক্ষা গাঁজায় তাহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি জন্মিল। ইতিমধ্যে হঠাৎ তাহার পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, সে বাটীর সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা হইল।

সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াই তাহার মনে এই খেয়ালের উদয় হইল, পিতা সর্ব্বদা কহিতেন "সর্ব্বত্রাৎ জয়মন্বিচ্ছেৎ পুত্রাদেকাৎ পরাজয়ং" সকলের নিকটেই জয়ী হইবার ইচ্ছা করিবে, কেবল এক পুত্রের নিকটে পরাজয় কামনা করিবে। অতএব বাবাকে কিরূপে পরাজয় করি। তাঁহার অপেক্ষা অধিক বিদ্যা হয় নাই যে, তাঁহাকে হারাইয়া দিব। কি করি, কি উপায় করি, সর্ব্বদা এই চিন্তা। তাহার পিতার যে গাঁজাখোর ছাত্র, তাহাকে গাঁজায় দীক্ষিত করিয়াছিল, সে এখন তাহার দক্ষিণ হস্ত ও একমাত্র মন্ত্রী। তাহার সহিত মন্ত্রণা আরম্ভ হইল। শেষে একটী গাঁজার আড্ডা খোলা স্থির হইল। বাটীর সম্মুখে এক খানি আটচালা বাঁধা হইল। যেখানে যত গাঁজাখোর আছে, সকলের নিকটে সংবাদ গেল, ত্রিভঙ্গ মুখোপাধ্যায় গাঁজার সদাব্রত দিয়াছে। দলে দলে গাঁজাখোর আসিতে লাগিল। শেষে আর আটচালায় স্থান সমাবেশ হওয়া ভার হইল। দিবা রাত্রি আর বিশ্রাম নাই। পিতার যত ব্রহ্মোত্তর ভূমি ছিল, সব গেল, শেষে বিদায়ের ঘড়া পাড়্ পর্য্যন্ত টান পড়িল। এদিকে যে সে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। মনে মনে বড় আনন্দ, পিতাকে পরাজয় করিয়াছি। পিতা অনেক কাল পড়াইয়াছিলেন বটে; কিন্তু কখন এত পড়ো জুটাইতে পারেন নাই।

গাঁজাখোরেরা বিনা ব্যয়ে গাঁজা পাইত এবং সময়ে সময়ে ভাল মন্দ সামগ্রীও খাইতে পাইত, অতএব দুই চারিটা প্রশংসার কথা না বলিলে চলে কৈ? তাহারা সর্ব্বদা বলিত, ত্রিভঙ্গ বাবু! তোমার মত দাতা ভোক্তা পরোপকারী আর নাই। কে কোথা এমন গাঁজার সদাব্রত দিয়াছে। ঐ কথা শুনিয়া ত্রিভঙ্গের গাত্র উল্লাসিত হইয়া উঠিত।

কেবল যে পিতাকে জয় করিয়াছি, এই আনন্দে ত্রিভঙ্গ মগ্ন ছিল, এরূপ নয়, বয়স্যগণ সহ নানা বিষয়ের গল্প ও নানা প্রকার তর্কবিতর্ক করিয়া অসীম আনন্দ অনুভব করিত। এক দিন এক গাঁজাখোর কথা প্রসঙ্গে বলিল, নির্ব্বোধ কে? দ্বিতীয় গাঁজাখোর উত্তর করিল, আমিই ত পৃথিবীমধ্যে এক নির্ব্বোধ আছি। তৃতীয় গাঁজাখোর মুদ্রিত নয়নে মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিল, বাবা তুমি কিসে নির্ব্বোধ? এখনও তোমার দিব্য গোলাল গোলাল হাত পা দেখিতে পাইতেছি, রঙ ফিরে নাই, গায়ে শির উঠে নাই, চক্ষু পোড়া কড়ির মত হয় নাই, তবে তুমি কিসে নির্ব্বোধ? দ্বিতীয় গাঁজা-

খোর কাশিতে কাশিতে উত্তর করিল, বাবা! সব কথা জলায়ে বুঝিতে হয়; কথা শুনিলেই হয় না, আর বলিলেই হয় না। আমি যদি নির্ব্বোধ না হইব, তবে তোমাদের এই ছেঁদা আটচালার মধ্যে বদ্ধ হয়ে থাকব কেন? এতক্ষণ উড়িয়া গগনমণ্ডলে উঠিতাম, কত দেশ দেশান্তর দেখিতাম, এক বার এটা এক বার ওটা এক বার সেটার উপরে ছোঁ মারিয়া পড়িতাম, কত আমোদ করিতাম।

প্রশ্নকর্ত্তা প্রথম গাঁজাখোর পুনরায় বলিল, ভাল তুমি যেন এক জন নির্ব্বোধ, আর কে নির্ব্বোধ বল দেখি। দ্বিতীয় উত্তর দিল, যে ব্যক্তি পরের উপকার করিয়া মুখে সেই কথা বলে, সে এক জন নির্ব্বোধ। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণকার বোপদেব এক জন নির্ব্বোধের সরদার। আর কে পাকা নির্ব্বোধ জান, যে যৎকিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখিয়া ফরফর করিয়া বেড়ায়, পৃথিবীকে তৃণ জ্ঞান করে, আপনাকেই মস্ত মনে করে, সে এক জন। প্রশ্ন—ভাল আর কে? উত্তর—যে পরকে বাপ বলে এবং পরের ছেলেকে ছেলে বলে। বাবা! এরা কেবল নির্ব্বুদ্ধি নয়, বেহায়ারও হদ্দ। পরকে বাপ বলা কি সামান্য বেহায়ামী! আর এক গাঁজাখোর আর এক দিক হইতে বলিয়া উঠিল, বোপদেবের কথায় আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল। বোপদেব খুড়ো পৃথিবীতে জন্মে কুড়িটী বই উপসর্গ দেখতে পান নাই। কি আশ্চর্য্য! পৃথিবীর উপসর্গের কি কেহ সংখ্যা করতে পারে? এক একটা লোকের অন্ততঃ দুশটা উপসর্গ আছে। সব কি ভেঙ্গে বলবো? অপর গাঁজাখোর নাকি সুরে দূর হইতে বলিয়া উঠিল, বাবা! তোমার নাড়ীজ্ঞানটা ত টন্‌টনে বোপদেবের ও উপসর্গ যে সংস্কৃত ব্যাকরণের উপসর্গ। যে উপসর্গের কথা তুলিয়াছিল, সে বলিল, সংস্কৃত ব্যাকরণের কি আরউপসর্গ নাই? শব্দের ও ধাতুর বিভক্তিগুলি কি সামান্য উপসর্গ?

ত্রিভঙ্গ এতক্ষণ চুপ করিয়া নিস্তব্ধভাবে শুনিতেছিল, আর যেন কি চিন্তা করিতেছিল। হঠাৎ সে উচ্চৈঃ স্বরে বলিয়া উঠিল, আমার মত কেহ নির্ব্বোধ আছে কি না বল দেখি। নিবিড় জঙ্গলপূর্ণ নিভৃত স্থানে ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে ঢেলা পড়িলে বিদেশী পথিকেরা যেমন চমকিয়া উঠে, সভাশুদ্ধ গাঁজাখোর তেমনি শিহরিয়া উঠিল। সকলে একবাক্যে কহিতে লাগিল, সে কি ত্রিভঙ্গ বাবু! কেন এমন কথা বল্লে। তোমার মত সুবুদ্ধি কে আছে?

তুমি যে ব্যয় করছ, তাহার শত গুণ পুণ্য সঞ্চয় করছ। যে একগুণ ব্যয় করে শত গুণ লাভ করে, সে যদি বোকা, তবে শেয়ানা কে? তোমার হতে কত লোকের পশুজন্ম ঘুচে গেল। তোমা হতে পৃথিবীর যত উপকার হোচ্চে এত কি আর কাহার হতে হয়?

ত্রিভঙ্গ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া চিন্তিতভাবে উত্তর করিল, তোমরা আমার সন্তোষের নিমিত্ত যে যাহা বল, কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, যারা নেশা করে, তাদের মত নির্ব্বোধ আর নাই। দেখ, আমার পিতার কত মান সম্ভ্রম কত ঐশ্বর্য্য, আমি এমনি অধম, সমুদায় নষ্ট করিলাম, আমার সমুদায় বিষয় বিভব গেছে বল্লেই হয়, আর দুদিন পরে আমাকে অন্নের নিমিত্ত লালায়িত হতে হবে। ইহার পর ত্রিভঙ্গের যেন কণ্ঠরোধ হইল, তাহার মুখ হইতে বাক্য নিঃসৃত হইল না। সে নিস্তব্ধ হইল। সমুদ্রে যেমন তরঙ্গের পর তরঙ্গ উত্থিত হয়, তেমনি গাঁজাখোর দলে তর্কের পর তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, কেন যে ত্রিভঙ্গের এরূপ মতিচ্ছন্ন হইল, কেহ স্থির করিতে পারিল না। এক জন প্রাচীন গাঁজাখোর বলিল, আজ একটা বিঘ্ন ঘটেছে, আজ এ বিষয়ের এই পর্য্যন্ত থাক, অন্য প্রসঙ্গ চলুক।

ত্রিভঙ্গের গাঁজাখুরী সভায় রামনাথ তর্কপঞ্চাননের অনেকগুলি গাঁজাখোর ছাত্র ছিল। যেব্যক্তি ত্রিভঙ্গকে গাঁজায় হাতে খড়ি দেয়, সে আর কয়জন ছাত্রকেও গাঁজায় দীক্ষিত করিয়াছিল। তাহাদিগের ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল, তাহারা বুদ্ধিমানও বটে; কিন্তু তীক্ষ্ণ অস্ত্র পাকশালায় রাখিলে যেমন তাহাতে কালী ঝুল পড়ে, গাঁজা খাইয়া তাহাদের বুদ্ধিও তেমনি মলিন হইয়াছিল, কিন্তু সংস্কৃতে অনুরাগ এককালে বিলুপ্ত হয় নাই। তাহারা সংস্কৃত কবিতাগুলি লইয়া সর্ব্বদা আমোদ করিত। এক জন বলিল, ভাই! তোমরা বল দেখি;

কবিতারসমাধুর্য্যং কবির্ব্বেত্তি ন তৎকবিঃ।
ভবানীভ্রূকুটীভঙ্গং ভবোবেত্তি ন ভূধরঃ॥

ইহার ত অর্থ এই, এক জন কবির কৃত কবিতার রস ও মাধুর্য্য অপর কবিই বুঝিতে পারেন, কিন্তু রচয়িতা স্বয়ং তাহা বুঝিতে পারেন না। মহাদেবই ভবানীর ভ্রূকুটীভঙ্গ বুঝিতে পারেন, হিমালয় বুঝিতে পারেন না।

এ কবিতাটা কেমন কেমন লাগিতেছে, রসিক ও ভাবুক না হইলে কি কখন কবি হইতে পারে? আমি ইহার একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

নপুংসকমিতি জ্ঞাত্বা প্রিয়ায়ৈ প্রেষিতং মনঃ।
মনস্তত্রৈব রমতে বয়ং পানিনিনা হতাঃ॥

মনকে নপুংসক জানিয়া প্রিয়ার নিকটে পাঠাইয়া দিলাম। মন সেই খানে রমণ করিতে লাগিল, পাণিনি আমাদিগকে ঠকাইয়াছেন।

কবির কেমন ভাবুকতা ও রসিকতা দেখ, পাণিনি মনঃশব্দটীকে ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কবি এই সূত্র পাইয়া কহিতেছেন, আমি কোন পুরুষকে দূত করিয়া প্রিয়ার নিকটে পাঠাইলাম না। কারণ, পুংদূতকে স্ত্রীলোকের নিকটে প্রেরণ করা নীতিনিষিদ্ধ, তাহাতে বিপরীত ফল ফলিবার শঙ্কা আছে। যদি বল, স্ত্রীলোককে দূতী করিয়া পাঠাইলাম না কেন? না পাঠাইবার কারণ এই, স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে শীঘ্র সখ্য হয়, পাছে সখ্য হইয়া কথায় কথায় দূতী আমার কথা ভুলিয়া যায়, এই ভয়ে স্ত্রীলোককেও পাঠাইলাম না। পাণিনি বলিয়াছেন মন নপুংসক, তাহাকে পাঠাইলে কোন অনিষ্ট নাই, আমিও শীঘ্র সংবাদ পাইব, এই ভাবিয়া তাহাকে দূত করিয়া পাঠাইলাম, কিন্তু সেও সেখানে রমণ করিতে লাগিল! দেখ কেমন অনুরাগ বর্ণন করা হইয়াছে। কবি নিজে রসজ্ঞ ও ভাবুক না হইলে কি এরূপ হয়?

বৈজ্ঞানিক কৌতুক।

একটী বোতল হইতে নানা প্রকার দ্রব দ্রব্য বাহির করিবার কৌশল।

পাঠক দেখিয়া থাকিবেন, কখন কখন ইন্দ্রজাল-ব্যবসায়ী সাহেবেরা অত্যাশ্চর্য্য কৌতুক দর্শাইয়া দর্শকদিগের নয়ন ও মন বিমোহিত করে। একটী বোতল হইতে দুগ্ধ, জল, সেরি, শেম্পেন, পোর্ট প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য বাহির করিয়া থাকে। হোসেন্ খাঁর নিকটও একবার আমরা এই কৌতুক দেখিয়াছিলাম। পূর্ব্বাহ্ন উপযুক্ত আয়োজন করিয়া না রাখিলে এই কৌতুক দেখাইবার কোন উপায় নাই।

একটী পুরু ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বোতলে হিরাকস, প্রোটোসল্‌ফেট্ ও পার্সল্‌ফেট্ এবং বিশুদ্ধ গন্ধক দ্রাবক একত্র মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। এই সমস্ত দ্রব্যের মিলনে জল ধূসরবর্ণ হইয়া পড়ে, অতএব কৌতুক দেখাইবার সময় কদাচ উহা স্বচ্ছ বোতলে রাখিবে না। কারণ বোতলের দ্রব বর্ণবিশিষ্ট দেখিলে দর্শকদিগের অশ্রদ্ধা জন্মিবে।

কেবল জলে ঐ কয়েক দ্রব্য মিশ্রিত করিলেই অভীষ্টসিদ্ধি হয় না। যে পাত্রে কাম্য দ্রব ঢালিতে হইবে পূর্ব্বাহ্ণে তাহাতেও দ্রব্য-বিশেষ মিশ্রিত করিয়া রাখা চাই। (১) জল দেখাইবার পাত্র শূন্য রাখিবে। (২) দুগ্ধ দেখাইবার পাত্রে ক্লোরাইড অব ক্যালসিয়ম রাখিবে। (৩) পোর্ট দেখাইবার পত্রে সল্‌ফোসাএনাইড অব পোটাসিয়ম দ্রব মাখাইয়া রাখিবে। (৪) শেম্পেন দেখাইবার পাত্রে, বাইকার্ব্বোনেট অব সোডা রাখিবে। এই সমস্ত দ্রব্য গ্লাসের ভিতর দুই অঙ্গুলি স্থান ব্যাপিয়া চতুঃপার্শ্বে উত্তমরূপে লাগাইবে। তলদেশে কিঞ্চিন্মাত্র বর্ণ দ্রব্য পতিত না থাকে, এমন সতর্ক হইবে। এক এক প্রকারের গ্লাস তিন চারিটী প্রস্তুত রাখিবে; কারণ এক দ্রব্য অধিকবার দেখিতে চাহিলে অনায়াসে দেখাইতে পারা যাইবে। এই কৌতুক কদাচ দিবসে দেখাইবে না। রাত্রিকালে টেবলের উপর গ্লাস রাখিয়া উহা দেখাইবে। শূন্য গ্লাসে পূর্ব্বে শীতল জল রাখিলে কেহ দেখিতে পাইবে না। জল স্বচ্ছ, রাত্রিতে দৃষ্টিগোচর হয় না। পরে অন্যান্য গ্লাসে পূর্ব্বপ্রস্তুত বোতলের দ্রব ঢালিয়া যথাক্রমে উপরের লিখিত দ্রব্যগুলি দেখাইবে; দর্শকেরা তদ্দৃষ্টে বিস্ময়াপন্ন হইবেন।

পাদপূরণ।

প্রশ্ন।—কবিভূষণ! করুণরসে পূরণ কর,—" মার মার মার "।

উত্তর:—হর-নেত্রানলে দগ্ধ হইলে মদন,
গৌরীর নিকটে রতি করিছে রোদন,—
হা দেবি! জগত-মাতা ত্রিলোক তারিণি!
রতিরে করিলে এবে চির-অভাগিনী?
সামান্য জীবের হিত যদি কেহ করে,
শোক তাপ দূরে যায়, সুখ পায় পরে।
মা তুমি জগত-কর্ত্রী,—তব হিত করি,
রতির কপাল পোড়া! দুঃখে পুড়ে মরি?
বুঝিলাম ভাগ্য-দোষ, বিধাতা বিমুখ।
কাজ নাই প্রাণে আর, বাঁচনে কি সুখ?
শঙ্করের কোপানলে মারাগেছে মার,
দাসীরে জননি! তুই—" মার মার মার "।

কল্পদ্রুম।

মহাভারত ও রামায়ণের পৌর্ব্বাপর্য্য-সম্বন্ধে

সন্দেহ-নিরসন।

সখি গো! সে মধুর ধ্বনি করা হবে না,
আর সে কুহুধ্বনি করা হবে না।
শ্রীপতি বিহনে, শ্রীমতীর প্রাণে, কুহুরব সবে না।
বৃন্দাবনের বন ম্রিয়মাণ সব, নাই শুকসারী নাই অলির রব,
এখন শবপ্রায় সব দেখে চিন্তে পারবে না।
কৃষ্ণখেদে কেঁদে নয়ন রেঙেছে, শোকেতে কাতর কণ্ঠ ভেঙেছে,
সুখের বৃন্দাবনে আর সুখ কই।
যার কপাল ভাঙা যোড়া কি আছে তার করযুগল বই?
সদা কৃতাঞ্জলি, হয়ে বলি, বনমালী আর ব্রজে কি আসবে না?

আমি পূর্ব্বে মহাভারত ও রামায়ণের পৌর্ব্বাপর্য্য-নির্ণয়ে যত্নশীল হইয়া বিবিধ সারবান প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক মহাভারতকেই অপেক্ষাকৃত প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছিলাম। তদ্দৃষ্টে শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র সরকার মহাশয় আমার মতের প্রতিবাদ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আমিও যথাসম্ভব তাঁহার প্রদর্শিত আপত্তির খণ্ডন করিয়াছি। কল্পদ্রুম পাঠকের তাহা অবিদিত নাই। আমার প্রতিবাদপত্র পাঠে যাদব বাবু লিখিয়াছেন, আমি তাঁহাকে উপহাস ও তুচ্ছ তাচ্ছীল্য করিয়াছি। আমি নিজে ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও অল্পবিদ্য হইলেও জ্ঞানসত্ত্বে বুদ্ধিমান ও বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিকে উপহাস করি না। সে প্রকার নির্ঘৃণ কার্য্য আমার প্রবৃত্তির বিপরীত। আমি যাদব বাবুকে যথেষ্ট পূজা ও সম্মান করিয়াই থাকি, তাঁহার বিদ্যানুরাগিতা দেখিয়া আমি যার পর নাই মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি যত্নপূর্ব্বক আমার মতের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, সে ত ভালই হইয়াছে। তাহাতে

কাহারও ক্ষোভ বা অসন্তোষ জন্মিবার কারণ নাই; আমিই বা কি নিমিত্ত ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হইব? আমি ভুজবলে কিম্বা অলীক বাগ্বিতণ্ডার দ্বারা জন-সমাজে নিজ অভিমত কোন নূতন মত প্রবল করিতে অভিলাষ করি না। সত্যানুসন্ধিৎসার বশানুবর্ত্তী হইয়াই আমি এই অভিনব মত প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু ইহা যে সর্ব্বতোভাবে অভ্রান্ত হইবে এমন কথন সম্ভবিতে পারে না। সত্য সত্য মহাভারত রামায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ হইলেও এখন তাহা সমীচীনরূপে সপ্রমাণ করিবার কোন উপায় নাই। যাহা হউক, এ বিষয়ের যত আন্দোলন হয় ততই ভাল। একটী বিষয়ের পুনঃ পুনঃ আলোচনা দ্বারা প্রকৃত তত্ত্বে সত্যের জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইতে পারে। আমি যাদব বাবুর সঙ্গে শাস্ত্রালাপ করিতে ভাল বাসি; কিন্তু রক্তকুণ্ডনয়নে মুখখানা ভার ভার করিয়া রুক্ষ প্রকৃতিতে বিচার করিতে কেমন বিষবৎ জ্ঞান হয়। সুহৃদ্ভাবে একাসনে বসিব, স্নেহেতে ছাঁকিয়া রসেতে মাখিয়া হাসিতে হাসিতে কথাগুলি বলিব; বিচারও চলিবে, সৌহার্দ্দ-নিস্সৃষ্ট প্রেমধারায় উভয়ের মন গলিতেও থাকিবে। কেমন তাহাই ভাল লাগে না? কিন্তু বন্ধুর সঙ্গে বাক্যালাপ ও রসকৌতুক করিতে গিয়া সুশীলতাগুণের বিচ্যুতি হয়, আমার তেমন ইচ্ছা নহে। যদি স্যাৎ আমার পূর্ব্বপ্রস্তাবের কোন স্থলে যথোচিত সৌজন্যের ও শিষ্টাচারিতার অভাব হইয়া থাকে, সেটী আমার চিত্তপ্রবৃত্তির দোষ নহে। আমি রসবিদ্যায় সুদীক্ষিত নহি, বোধ করি সে কারণ ত্রুটি হইয়াছে। যাহা হউক, আমি যাদব বাবুকে কথন তুচ্ছতাচ্ছীল্য করি না; তাঁহার যথাযোগ্য সম্মানই করিয়া থাকি। তিনি আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

বিবেচনা করি, প্রতিবাদী মহাশয়ের সঙ্গে শাস্ত্রালাপ করিতে গিয়া আমার প্রকৃতিবৈলক্ষণ্য বা স্বরবিকৃতি ঘটে নাই। পাঠকগণ! কল্পদ্রুম ত পাঠ করিয়াছেন, আপনারা বলেন কি, যাদব বাবুর এ প্রকার অভি-যোগের কারণ আছে? তাঁহার প্রতি আমার যেরূপ অনুরক্তি জন্মিয়াছে, তদীয় অন্তঃকরণে তেমন স্নেহভাবের সঞ্চার হয় নাই। আমি চির প্রসিদ্ধ মতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছি, তজ্জন্য তিনি কিছু বিরক্ত হইয়াছেন। আন্তরিক স্নেহ থাকিলে সকলি সুখময় বোধ হয়। যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই দিকেই প্রীতিধারা বিগলিত হইতেছে; সেই দিকেই সুখোৎ-সবের আবর্ত্ত উঠিতেছে। সকল বিষয়েরই অপূর্ব্ব শোভা সৌষ্ঠব, অপূর্ব্ব

শ্রী-ছাঁদ। নিজের আমোদে স্থাবরজঙ্গমকেও আমোদিত দেখায়। চন্দ্র সূর্য্য তারকায় মধু ক্ষরিতে থাকে, মারুতে মধু বহিতে থাকে। সকলেই যেন সুখের উৎসবে মাতিয়াছে। কিন্তু আন্তরিক স্নেহ অন্তর্হিত হইলে আর সে ভাবটুকু থাকে না,—তখন শ্যামায়মান স্তিমিত নিশীথ সময়ের গম্ভীর ভাব। দেখিলে ভয়ের উদ্রেক হয়।

কৃষ্ণবিহীন কুঞ্জের শোভা ছিল না। নীলনিদিগ্ধ তেমন তমাল বন, তাহা ম্লান হইয়া গিয়াছিল। শুক সারীর মুখে বুলি ছিল না; কোকিল নীরব; আবার কখন যদি মধুর স্বরে একটী রাগালাপ করিত, রাধিকার কর্ণে তাহা যেন বিষ ঢালিয়া দিত। যাদব বাবুর অন্তঃকরণ হইতে স্নেহ অন্তর্ধান করিয়াছে, সুতরাং তাঁহার প্রকৃতি কিছু বিরস হইয়াছে। আমার প্রস্তাবের সকলি শ্রীহীন দেখাইতেছে। তাঁহার নিরানন্দ প্রকৃতি দেখিয়া কুহুরব করিতে ত ইচ্ছা হয় না; আবার জাতীয় স্বভাবে যদি করি, অমনি তাঁহার কর্ণে বিষবর্ষণ। সখে! যদি আপনার হৃদয়ে স্নেহভাবের উদয় হয়, তবেই সাধের নিকুঞ্জ বেড়িয়া ডাকিতে বলিবেন, নচেৎ মধুকণ্ঠের কণ্ঠ হইতে কুহুধ্বনি আসিবে না।

এইবার আমাদের কৃষ্ণবিরহের দুঃখালাপ। প্রতিবাদী মহাশয় গত প্রস্তাবের উপসংহারে লিখিয়াছেন,—

"পাঠক! এই বারে বোধ হয় রঙ্গলাল বাবুর সমুদায় আপত্তি খণ্ডিত হইয়াছে, এবং বাল্মীকি যে বেদব্যাসের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক, তৎপক্ষে আর সন্দেহের কারণ নাই। রঙ্গলাল বাবু যতই তর্ক করুন না কেন, সত্যের জয় সর্ব্বত্র। আমরা তাঁহারই প্রদর্শিত প্রমাণের দ্বারা তাঁহার মত খণ্ডন করিয়াছি, ইহার অপেক্ষা শ্লাঘার বিষয় আর কি আছে?"

মহাভারত ও রামায়ণের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় করিতে গিয়া যাদব বাবু যে, বিচারে জয় লাভ করিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। মহর্ষি বাল্মীকি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক,—এটী চির প্রথিত বাক্য। পুরুষানুক্রমে সকল হিন্দুই এ মতের সমর্থন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু দুঃখের কথা সিদ্ধান্তপথে উপস্থিত হইয়া প্রতিবাদী মহাশয় স্বীয় মনোরথ পূর্ণ করিতে পারেন নাই। তিনি যে সমস্ত যুক্তি ও আপত্তির উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার কতকগুলি ভ্রমপ্রমাদগ্রস্ত, অবশিষ্টগুলি আমারই মতের অনুকূল। পাঠক! জিজ্ঞাসা করিবেন,—সে কেমন? তবে প্রথমে তাঁহার ভ্রমের

কথাই বলি শ্রবণ করুন। বোধ করি যাদব বাবু পাঠদশায় বাল্মীকি প্রণীত সংস্কৃত রামায়ণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ; তৎপরে আর উহা পাঠ করিয়া দেখেন নাই। বহু বিস্তীর্ণ গ্রন্থ বারম্বার আলোচনা না করিলে যাবতীয় বৃত্তান্ত আয়ত্ত হয় না। প্রতিবাদী মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"বাল্মীকি গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে নিজের পূর্ব্বাবস্থা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ দস্যু ছিলেন ; পরে ব্রহ্মা ও নারদের কৃপায় জ্ঞান লাভ করেন।"

রামায়ণে বাল্মীকির দস্যুবৃত্তির নাম প্রসঙ্গও নাই। নারদ ও ব্রহ্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার বহুকাল পূর্ব্বেই তিনি জনসমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ভরদ্বাজাদি অনেকগুলি শিষ্য তাঁহার নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন। দেবর্ষি নারদ ও ব্রহ্মা তাঁহাকে জ্ঞান শিক্ষা দেন নাই, সংক্ষেপে কেবল রামোপাখ্যানটী বর্ণন করিয়াছিলেন। ফলতঃ মহর্ষি বাল্মীকি স্বপ্রণীত পুস্তকে নিজের পূর্ব্বাবস্থার কিছুই প্রকাশ করেন নাই। (বালকাণ্ড ১, ২, ৩ অধ্যায় দেখ,)

যাদব বাবু রামায়ণের যাবতীয় বৃত্তান্ত যে এককালে বিস্মৃত হইয়াছেন, তাহা আরও কতকগুলি বাক্যে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। আমার দ্বিতীয় প্রস্তাবে (প্রতিবাদের প্রতিবাদে) লিখিত হইয়াছিল, বেদব্যাস সুগ্রীব হস্তে তারাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাল্মীকি বিধবা ভ্রাতৃবধূকে দেবর হস্তে অর্পণ করিতে পারেন নাই। এতদ্দর্শনে যাদব বাবু লিখিয়াছেন,—

> "লেখক না জানিয়া শুনিয়া কিরূপে একটী অযথা বৃত্তান্ত লিখিয়া তদ্দ্বারা স্বাভিমত সমর্থনের চেষ্টা করিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ইহা কি শিক্ষিত লোকের পক্ষে লজ্জা ও উপহাসের কারণ নহে ? মহর্ষি বাল্মীকি কেবল বিধবা ভ্রাতৃবধূ তারাকে সুগ্রীব হস্তে সমর্পণ করিয়া সন্তুষ্ট হন নাই,—তিনি রাবণ বধের পর তদীয় মহিষী মন্দোদরীকেও বিভীষণ হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। সে কথা এতদ্দেশের মুটে মজুর পর্য্যন্ত অবগত আছে।

কিন্তু রঙ্গলাল বাবু বিজ্ঞ লোক হইয়া এই সংবাদটা
রাখেন না বড়ই দুঃখের বিষয়।"

বটে ত। রাবণ বধের পর বিভীষণের সঙ্গে বিধবা মন্দোদরীর যে প্রণয় সঙ্ঘটন হইয়াছিল, তাহা এতদ্দেশীয় কেবল মুটে মজুরেরাই ত জানে। তাহারা বটতলার মুদ্রাঙ্কিত কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ দোকানী পসারীর মুখে শুনিয়াছে, এমন কথা বলিবে না ত আর কে বলিবে? যাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান আছে, যিনি মূল রামায়ণ পাঠ করিয়াছেন, তিনি কি কখন এমন কথা বলিতে পারেন? মন্দোদরীর বিবাহে অজ্ঞ মুটে মজুরেরা মেলানির ভার বহন করুক, কিন্তু আমি ত সে উৎসবে হলুধ্বনি দিতে পারিব না। আদ্যোপান্ত রামায়ণ পাঠ করিয়া আমি কিরূপে বাল্মীকির নির্ম্মল (১) চরিত্র পাপাচরণ দোষে কলুষিত করিব!

এক্ষণে বালিপত্নী তারার কথা উল্লিখিত হইতেছে। বিজ্ঞ পাঠক! তদ্বৃত্তান্তের বিচার করিয়া দেখুন। বিধবা তারা যথার্থই সুগ্রীবে উপগতা হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি আমি লিখিয়াছিলাম, বাল্মীকি ভ্রাতৃবধূ তারাকে দেবর হস্তে সমর্পণ করিতে পারেন নাই। ভ্রমবশতঃ অথবা চাতুরী করিয়া লোককে প্রতারণা করিতে আমি এমন কথা লিখি নাই। শাস্ত্রীয় প্রমাণ দৃষ্টে অনেক বিচারের পর তদ্রূপ মত প্রকাশিত হইয়াছিল। আজি আমার অবলম্বিত যুক্তিগুলি এখানে বিবৃত হইতেছে, সকলে অনায়াসেই তদ্বাক্যের উপযোগিতা বুঝিতে পারিবেন।

তারা সুগ্রীবাগ্রজ বালীর বিধবা পত্নী। অঙ্গদ তারার গর্ভজাত বালীর ঔরস পুত্র। পুত্রসত্ত্বে শাস্ত্রে বিধবা রমণীর নিয়োগধর্ম্মের ব্যবস্থা নাই। মনু লিখিয়াছেন;—

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি যোষিতাং ধর্ম্মমাপদি। ৯। ৫৬।

অতঃপর পুত্রাভাবে স্ত্রীলোকদের যাহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম আমি তাহা বলিব।

ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য ভার্য্যা যা গুরুপত্ন্যনুজস্য সা।
যবীয়সস্তু যা ভার্য্যা স্নুষা জ্যেষ্ঠস্য সা স্মৃতা। ৫৭
জ্যেষ্ঠো যবীয়সো ভার্য্যাং যবীয়ান্ বাগ্রজস্ত্রিয়ম্।
পতিতৌ ভবতো গত্বা নিযুক্তাবপ্যনাপদি। ৮

---

(১) পাঠক! যুদ্ধকাণ্ডের ১১০ অধ্যায় হইতে ১২৩ অধ্যায় পর্য্যন্ত মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করুন; দেখিবেন বিভীষণের সঙ্গে মন্দোদরীর বিবাহ সঙ্ঘটন হয় নাই।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যা কনিষ্ঠ ভ্রাতার পক্ষে গুরুপত্নী স্বরূপা।
আর কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী জ্যেষ্ঠের পক্ষে পুত্রবধূর তুল্য।
মুনিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। জ্যেষ্ঠই হউন আর
কনিষ্ঠই হউন, পুত্র থাকিতে নিয়োগ ধর্ম্মানুসারেও
ইতরেতর ভার্য্যাতে উপগতা হইলে পতিত হইতে হয়।

পাঠক! দেখুন, রামচন্দ্র আর্য্যকুলতিলক হইয়া কখন কি মনুক্ত বিধি উল্লঙ্ঘন করিতে পারেন? আবার বানরেরাও মনুকে যে সম্মান করিত না, তাহাও নহে। সুগ্রীব-রাম প্রসঙ্গে মনুর মতকে আদর করা হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবার কিছুই আবশ্যকতা নাই। এই পরিণয়ে বাল্মীকি কিম্বা রামচন্দ্রের সম্মতি আছে কি না, তাহারই বিচার করিয়া দেখা উচিত। সকলে দেখিলেন এই বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত নহে। বিশেষতঃ যাঁহারা বেদনধর্ম্মে ব্রতী হইতেন, তাঁহারা বাগ্‌যত হইয়া ঘৃতাক্ত কলেবরে নির্জ্জনে নিশিতে একমাত্র সন্তান উৎপাদন করিতেন, ইহাও মনুর ব্যবস্থা।

বিধবায়াং নিযুক্তস্তু ঘৃতাক্তো বাগ্‌যতো নিশি।
একমুৎপাদয়েৎ পুত্রং ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চন। ৯। ৬০

অধিকন্তু, কপিরাজ বালী মৃত্যুকালে সানুনয় বাক্যে রামচন্দ্রের নিকট এই ভিক্ষা করিলেন—

মদ্দোষকৃতদোষাং তাং যথা তারাং তপস্বিনীং।
সুগ্রীবো নাবমন্যেত তথাবস্থাতুমর্হসি। ৪। ১৮। ৫৭

দেখিবেন, সুগ্রীব যেন আমার দোষে তপস্বিনী তারাকে দোষী করিয়া তাহার অবমাননা না করে।

পূর্ব্বে বালী, সুগ্রীবের পত্নী রুমাকে অপহরণ করিয়াছিল এবং তাহাকেও যৎপরোনাস্তি কষ্ট দিয়াছিল। সেই ভয়ে বানররাজ রামকে সতর্ক করিল; পাছে সুগ্রীব তারাতে উপগত হইয়া তাহার ধর্ম্ম নষ্ট করে, বালীর সে আশঙ্কাও হইয়াছিল। সুগ্রীব তারাকে গ্রহণ করিবে, কপিরাজের সে ইচ্ছা ছিল না। তজ্জন্য এখানে তপস্বিনী তারা বলা হইয়াছে। (২) কারণ

---

(২) মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥ মনু। ৫। ১৬০

শাস্ত্রে উক্ত আছে, পতির মৃত্যুর পর সাধ্বী স্ত্রী তপস্বিনী হইলে পুত্র না থাকিলেও তিনি স্বর্গ লাভ করেন।

এক্ষণে পাঠক দেখুন, ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি ও মুমূর্ষু ভক্তের সানুনয় অনুরোধ এই উভয় রক্ষা করিতে হইলে রামচন্দ্র এই বিবাহে ব্যবস্থা দিতে পারেন না। কিন্তু ভক্তিপরায়ণ হিন্দু টীকাকারেরা রাঘবানুগত সুগ্রীব ও তারার দোষাপনয়নের নিমিত্ত একটী কবিতার কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা দ্বারা এই বিবাহে রামের সম্মতি দেখাইয়া থাকেন। সে শ্লোকটী এই—

প্রীতিং পরাং প্রাপ্স্যসি তাং তথৈব পুত্রশ্চ তে প্রাপ্স্যতি যৌবরাজ্যং।

৪। ২৪। ৪৪।

টীকা—বালী পরাং প্রীতিং ত্বৎসম্বন্ধজাং প্রাপ্স্যতি মৎসংকল্পাৎ। কিঞ্চ ভবত্যপি বালিসম্বন্ধজাং প্রীতিং সুগ্রীবসম্বন্ধাৎ প্রাপ্স্যসি। তে পুত্রো যৌবরাজ্যং প্র্যাপ্স্যতি চ। তেনাহমপি শাপং প্রাপ্স্যাম্যেবেতি।

অর্থাৎ—আমার আজ্ঞায় স্বর্গীয় বালী তোমার সহবাস জনিত প্রীতিলাভ করিবে। তুমিও সুগ্রীব সহবাসে বালী সহবাস জনিত প্রীতিলাভ করিবে। তোমার পুত্র অঙ্গদ যৌবরাজ্য পাইবে। আর আমি তোমার শাপের ফল ভোগ করিব।

নিতান্ত কষ্টকল্পনাতেও শ্লোকটীর এ প্রকার তাৎপর্য্য উপলব্ধি হয় না। যাঁহারা এ স্থলের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত জ্ঞাত নহেন, উদ্ধৃত শ্লোকার্দ্ধের এ প্রকার ব্যাখ্যা তাঁহারা কিছুতেই করিবেন না, তাঁহারা সরল পথই অবলম্বন করিবেন। বাস্তবিক এই শ্লোকার্দ্ধের সঙ্গত ও সরল ব্যাখ্যা গ্রহণ করাই বিধেয়। পাঠক! দেখুন,—

প্রীতিং	পরাং	প্রাপ্স্যসি	তাং	তথা	এব	পুত্রঃ	চ
প্রীতি	পরম	পাইবে	সেই		রূপ	পুত্র	ও

তে	প্রাপ্স্যতি	যৌবরাজ্যং।
তোমার	পাইবে	যৌবরাজ্য।

হে তারা! তুমি পূর্ব্বের ন্যায় প্রীতিলাভ করিবে এবং তোমার পুত্র অঙ্গদও যৌবরাজ্য পাইবে।

এই ব্যাখ্যা দ্বারা শ্লোকধৃত সমস্ত শব্দের অর্থাকাঙ্ক্ষা মিটিতেছে, কোন শব্দ ব্যর্থ যাইতেছে না। তারা পতিশোকে কাতরা হইয়া স্বামীর চিতা-

নলে প্রাণত্যাগ করিতে যাইতেছিল। রামচন্দ্র এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন যে, বিধাতার নির্ব্বন্ধ কেহ উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না। তুমি প্রাণত্যাগ করিও না। পতিশোকে এখন কাতর হইয়াছ, কিন্তু হৃদয়ের এ শোকাগ্নি শীঘ্র নির্ব্বাণ হইবে। তুমি শীঘ্রই শান্তি লাভ করিবে। আর তুমি রাজ্যচ্যুতও হইবে না, তোমার সন্তান অঙ্গদ যৌবরাজ্য প্রাপ্ত হইবে। গ্রন্থকারের ইহাই অভিপ্রেত তাহাতে সন্দেহ নাই। রামভক্তদিগের কষ্টকল্পিত অর্থ আমাদের ভাল লাগিল না।

পাঠক! এখন দেখুন, তারার পুনর্ব্বিবাহে বাল্মীকি কিম্বা রামচন্দ্রের সম্মতি ছিল না। সুগ্রীব পানাসক্ত মদবিহ্বলচিত্তে তারা সতীর ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছিল। সেটা অরণ্য পশুর পিশাচাচরণ,—সাধুসম্মত নহে। সুগ্রীব রাজভোগে সুরাপানে কেবল ধর্ম্ম কর্ম্ম বিস্মৃত হইয়াছিল এমন নয়,—পরম হিতৈবী রামচন্দ্রকেও বিস্মৃত হইয়াছিল। অতএব সে যে সতীর সতীত্বগুণে কলঙ্কের আরোপ করিবে, ইহা বিচিত্র নহে (৩)।

---

(৩) মদ্যপানে এবং যৌবনাঢ্য অঙ্গনাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সুগ্রীবের কি অবস্থা ঘটিয়াছিল, দেখুন তারা লক্ষ্মণকে বলিতেছে,—

তজ্জাপি জানামি তথা বিষহ্যং বলং নরশ্রেষ্ঠ! শরীরজস্য।
জানামি যস্মিংশ্চ জনে চ বদ্ধং কামেন সুগ্রীবমসক্তমদ্য ॥ ৫৪ ॥
ন কামতন্ত্রে তব বুদ্ধিরস্তি ত্বং বৈ যথা মন্যুবশং প্রপন্নঃ।
ন দেশকালৌ হি যথার্থধর্ম্মাববেক্ষতে কামরতির্ম্মনুষ্যঃ ॥ ৫৫ ॥
তং কামবৃত্তং মম সন্নিকৃষ্টং কামাভিযোগাচ্চ বিমুক্তলজ্জং।
ক্ষমস্ব তাবৎ পরবীরহন্তস্তদ্ভ্রাতরং বানরবংশনাথং ॥ ৫৬ ॥
মহর্ষয়োধর্ম্মতপোভিরামাঃ কামানুকামাঃ প্রতিবদ্ধমোহাঃ।

ইত্যাদি ৪। ৩৩ অধ্যায়।

হে নর-শ্রেষ্ঠ! শরীরজ কন্দর্পের যে অসহ্য বল, তাহা আমি জানি। সুগ্রীব কামবশে যে এই সকল স্ত্রীজনে আসক্ত হইয়াছেন, তাহা আমি জানি। কামপরায়ণ ব্যক্তির কি অবস্থা ঘটে, তাহা আপনার বুদ্ধির অগোচর; তজ্জন্যই আপনি কোপ করিতেছেন। কামপরতন্ত্র ব্যক্তির দেশ, কাল, ধর্ম্ম, অর্থ প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি থাকে না। অতএব এই কামপ্রবৃত্ত, কামবশে নির্লজ্জ বানররাজকে ক্ষমা করুন। ধর্ম্ম নিরত তপঃপরায়ণ মহর্ষিরাও কামাসক্ত ও মোহান্ধ হন।

পাঠক! দেখুন এরূপ চরিত্রের সুগ্রীব যে তারার সতীত্ব নষ্ট করিবে না, তাহা কখন সম্ভবিতে পারে না।

যাদব বাবুর আর একটী ভ্রম এই, তিনি বলেন, অনেক স্থলে উত্তর বাক্যে প্রশ্নের অনুবৃত্তি করিতে হয়। অতএব বাল্মীকি জিজ্ঞাসা করিলেন,—

কোন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্য্যবান্ ?

সম্প্রতি ভূতলে কে বিলক্ষণ গুণবান্ ও বীর্য্যবান ?

আমি লিখিয়াছিলাম, রামরাবণের যুদ্ধের বহুকাল পরে বাল্মীকি রামায়ণ গ্রন্থ রচনা করেন। যাদব বাবু তাই বলিতেছেন,—"সম্প্রতি শব্দে যে যুগান্তর বুঝায় আমরা তাহা জানি না।" এই প্রশ্নে নারদ উত্তর করিলেন,—

ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো রামোনাম জনৈঃ শ্রুতঃ।

যাদব বাবুর আপত্তির তাৎপর্য্য এই, বাল্মীকি জিজ্ঞাসা করিলেন,— পৃথিবীতে সম্প্রতি কে গুণবান্ ব্যক্তি আছেন? নারদ তদুত্তরে কালের অনুবৃত্তি না করিয়া উত্তর দিলেন—ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভূত লোকবিখ্যাত রামই পৃথিবীতে সম্প্রতি গুণবান্ ব্যক্তি আছেন।

রামায়ণের উপক্রমণিকার ক্রিয়াপদগুলি এবং অন্যান্য স্থলের বিশেষ্য ও বিশেষণবিশেষের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে তিনি অনর্থক এ আপত্তিটীর উল্লেখ করিতেন না। যাহা হউক, তাঁহার সন্দেহ দূরীভূত করা আবশ্যক।

রামজন্মপরিগ্রহের বহু পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছে, সাধারণে ইহা ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত বাল্মীকি বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তদীয় অভীষ্টসিদ্ধি হয় নাই। ক্রিয়াপদ প্রয়োগের সময় তিনি বিস্তর গোল করিয়া ফেলিয়াছেন। কোথাও ভবিষ্যৎ, কোথাও বর্ত্তমান, আবার কোথাও ভূতকাল প্রযুক্ত হইয়াছে। আমার উদ্ধৃত যে শ্লোকার্দ্ধ দ্বারা যাদব বাবু স্বীয় মত সমর্থন করিতে গিয়াছেন, তাহাতে (জনৈঃ শ্রুতঃ) ভূতকাল প্রযুক্ত হইয়াছে। বাল্মীকি জিজ্ঞাসিলেন,—"সম্প্রতি কে আছেন?" কিন্তু নারদ কালের অনুবৃত্তি করিলেন না। তিনি বলিলেন,—রাম নামে একজন রাজা ছিলেন, এইরূপ সর্ব্বত্র প্রথিত আছে। আর একটী দৃষ্টান্ত দেখুন। নারদ বলিলেন,—

স জগাম বনং বীরঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্। ১। ১। ২৪

তিনি প্রতিজ্ঞা পালন করিতে বনগমন
করিয়াছিলেন। (ভূতকাল)

নলে প্রাণত্যাগ করিতে যাইতেছিল। রামচন্দ্র এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন যে, বিধাতার নির্ব্বন্ধ কেহ উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না। তুমি প্রাণত্যাগ করিও না। পতিশোকে এখন কাতর হইয়াছ, কিন্তু হৃদয়ের এ শোকাগ্নি শীঘ্র নির্ব্বাণ হইবে। তুমি শীঘ্রই শান্তি লাভ করিবে। আর তুমি রাজ্যচ্যুতও হইবে না, তোমার সন্তান অঙ্গদ যৌবরাজ্য প্রাপ্ত হইবে। গ্রন্থকারের ইহাই অভিপ্রেত তাহাতে সন্দেহ নাই। রামভক্তদিগের কষ্টকল্পিত অর্থ আমাদের ভাল লাগিল না।

পাঠক! এখন দেখুন, তারার পুনর্ব্বিবাহে বাল্মীকি কিম্বা রামচন্দ্রের সম্মতি ছিল না। সুগ্রীব পানাসক্ত মদবিহ্বলচিত্তে তারা সতীর ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছিল। সেটী অরণ্য পশুর পিশাচাচরণ,—সাধুসম্মত নহে। সুগ্রীব রাজভোগে সুরাপানে কেবল ধর্ম্ম কর্ম্ম বিস্মৃত হইয়াছিল এমন নয়,—পরম হিতৈষী রামচন্দ্রকেও বিস্মৃত হইয়াছিল। অতএব সে যে সতীর সতীত্বগুণে কলঙ্কের আরোপ করিবে, ইহা বিচিত্র নহে (৩)।

---

(৩) মদ্যপানে এবং যৌবনাঢ্য অঙ্গনাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সুগ্রীবের কি অবস্থা ঘটিয়াছিল, দেখুন তারা লক্ষ্মণকে বলিতেছে,—

তচ্চাপি জানামি তথা বিষহ্যং বলং নরশ্রেষ্ঠ ! শরীরজস্য।
জানামি যস্মিংশ্চ জনে চ বদ্ধং কামেন সুগ্রীবমসক্তমদ্য ॥ ৫৪ ॥
ন কামতন্ত্রে তব বুদ্ধিরস্তি ত্বং বৈ যথা মন্যুবশং প্রপন্নঃ।
ন দেশকালৌ হি যথার্থধর্ম্মাববেক্ষতে কামরতির্মনুষ্যঃ ॥ ৫৫ ॥
তং কামবৃত্তং মম সন্নিকৃষ্টং কামাভিযোগাচ্চ বিমুক্তলজ্জং।
ক্ষমস্ব তাবৎ পরবীরহন্তস্তু াতরং বানরবংশনাথং ॥ ৫৬ ॥
মহর্ষয়োধর্ম্মতপোভিরামাঃ কামানুকামাঃ প্রতিবদ্ধমোহাঃ।

ইত্যাদি ৪। ৩৩ অধ্যায়।

হে নর-শ্রেষ্ঠ! শরীরজ কন্দর্পের যে অসহ্য বল, তাহা আমি জানি। সুগ্রীব কামবশে যে এই সকল স্ত্রীজনে আসক্ত হইয়াছেন, তাহা আমি জানি। কামপরায়ণ ব্যক্তির কি অবস্থা ঘটে, তাহা আপনার বুদ্ধির অগোচর; তজ্জন্যই আপনি কোপ করিতেছেন। কামপরতন্ত্র ব্যক্তির দেশ, কাল, ধর্ম্ম, অর্থ প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি থাকে না। অতএব এই কামপ্রবৃত্ত, কামবশে নির্লজ্জ বানররাজকে ক্ষমা করুন। ধর্ম্ম নিরত তপঃপরায়ণ মহর্ষিরাও কামাসক্ত ও মোহান্ধ হন।

পাঠক! দেখুন এরূপ চরিত্রের সুগ্রীব যে তারার সতীত্ব নষ্ট করিবে না, তাহা কখন সম্ভবিতে পারে না।

যাদব বাবুর আর একটী ভ্রম এই, তিনি বলেন, অনেক স্থলে উত্তর বাক্যে প্রশ্নের অনুবৃত্তি করিতে হয়। অতএব বাল্মীকি জিজ্ঞাসা করিলেন,—

কোন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্য্যবান্?

সম্প্রতি ভূতলে কে বিলক্ষণ গুণবান্ ও বীর্য্যবান?

আমি লিখিয়াছিলাম, রামরাবণের যুদ্ধের বহুকাল পরে বাল্মীকি রামায়ণ গ্রন্থ রচনা করেন। যাদব বাবু তাই বলিতেছেন,—"সম্প্রতি শব্দে যে যুগান্তর বুঝায় আমরা তাহা জানি না।" এই প্রশ্নে নারদ উত্তর করিলেন,—

ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো রামোনাম জনৈঃ শ্রুতঃ।

যাদব বাবুর আপত্তির তাৎপর্য্য এই, বাল্মীকি জিজ্ঞাসা করিলেন,—পৃথিবীতে সম্প্রতি কে গুণবান্ ব্যক্তি আছেন? নারদ তদুত্তরে কালের অনুবৃত্তি না করিয়া উত্তর দিলেন—ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভূত লোকবিখ্যাত রামই পৃথিবীতে সম্প্রতি গুণবান্ ব্যক্তি আছেন।

রামায়ণের উপক্রমণিকার ক্রিয়াপদগুলি এবং অন্যান্য স্থলের বিশেষ্য ও বিশেষণবিশেষের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে তিনি অনর্থক এ আপত্তিটীর উল্লেখ করিতেন না। যাহা হউক, তাঁহার সন্দেহ দূরীভূত করা আবশ্যক।

রামজন্মপরিগ্রহের বহু পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছে, সাধারণ্যে ইহা ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত বাল্মীকি বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তদীয় অভীষ্টসিদ্ধি হয় নাই। ক্রিয়াপদ প্রয়োগের সময় তিনি বিস্তর গোল করিয়া ফেলিয়াছেন। কোথাও ভবিষ্যৎ, কোথাও বর্ত্তমান, আবার কোথাও ভূতকাল প্রযুক্ত হইয়াছে। আমার উদ্ধৃত যে শ্লোকার্দ্ধ দ্বারা যাদব বাবু স্বীয় মত সমর্থন করিতে গিয়াছেন, তাহাতে (জনৈঃ শ্রুতঃ) ভূতকাল প্রযুক্ত হইয়াছে। বাল্মীকি জিজ্ঞাসিলেন,—"সম্প্রতি কে আছেন?" কিন্তু নারদ কালের অনুবৃত্তি করিলেন না। তিনি বলিলেন,—রাম নামে একজন রাজা ছিলেন, এইরূপ সর্ব্বত্র প্রথিত আছে। আর একটী দৃষ্টান্ত দেখুন। নারদ বলিলেন,—

স জগাম বনং বীরঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্। ১।১।২৪

তিনি প্রতিজ্ঞা পালন করিতে বনগমন করিয়াছিলেন। (ভূতকাল)

দেবর্ষি নারদ বাল্মীকির সমীপে আদ্যোপান্ত রামোপাখ্যানটী অতীত কালেই বর্ণন করিয়াছেন।

রামের জন্মপরিগ্রহের পূর্ব্বে যে, রামায়ণ সঙ্কলিত হয় নাই, তাহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত আমি বালকাণ্ডের এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছিলাম—

চিরনির্বৃত্তমপ্যেতৎ প্রত্যক্ষমিব দর্শিতম্।

অনেক দিনের ঘটনা এখন যেন প্রত্যক্ষবৎ বোধ হইতেছে।

যাদব বাবু তদৃষ্টে বলিতেছেন—"অনেক দিনের ঘটনা হইলেই যে যুগান্তরের ঘটনা হইবে, ইহা ত কখনই শুনি নাই। ++++কুশীলবের গান শুনিয়া মুনিরা ঐরূপ বলিলেন। কুশীলব কে? +++তবে তর্কে এমন ছেলেম কেন?"

রামের জন্মপরিগ্রহের পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হয় নাই, ইহাই সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত আমি উক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। এ স্থলে আমি ত "যুগান্তর" চাই না। যাদব বাবু বলুন না,—"কল্য উক্ত ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে"—তাহাতেই আমার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। আমি অতীত কাল চাই।

প্রতিবাদী মহাশয় আমার তর্কে ছেলেম দেখিয়াছেন, কিন্তু তাহার কারণ বুঝিতে পারেন নাই। যাদব বাবু কি জানেন না,—ছেলে মানুষের সঙ্গে ছেলেম না করিলে শিশুরা তিলার্দ্ধকালও বয়োবৃদ্ধের সহবাস করিত না? ছেলের সঙ্গে না ছেলে সাজিলে কাজ হয় না। পাঠক! বুঝিয়াছেন যাদব বাবু আমার তর্কে কি ছেলেম দেখিয়াছেন? সকলেই জানেন কুশীলব রামের পুত্র। অতএব বাল্মীকির নিকট যদি রামের পুত্র বর্ত্তমান থাকিলেন, তবে রামায়ণবৃত্তান্ত বাল্মীকির বহু পূর্ব্বে কিরূপে ঘটিল? আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—রাম পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে রামায় রচিত হয় নাই, ইহাই সপ্রমাণ করিতে উক্ত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। বাল্মীকি রামচন্দ্রের সমকালীন লোক, তাহা প্রতিপাদন করিবার বিস্তর প্রমাণ আছে। আবার তদ্বিরুদ্ধেও ভূরি প্রমাণ দর্শাইতে পারা যায়। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। আমরা ইতিবেত্তার সমুচিত সত্যানু সন্ধিৎসু স্বচ্ছ চক্ষে সমুদায় বৃত্তান্ত দৃষ্টি করিব।

যাদববাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—কুশীলব কে? কই ষট্‌কাণ্ড রামায়ণের মধ্যে বাল্মীকি ত তাঁহাদের কোন পরিচয় দেন নাই। রামায়ণের উত্তর কাণ্ড

মহর্ষি বাল্মীকির রচিত নহে, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। কেবল বিদেশীয় পণ্ডিত এবং নব্য সম্প্রদায়ের হিন্দুগণ এই মত সমর্থন করেন, এমন নহে; এতদ্দেশীয় প্রাচীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন। ইতি-পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রনাথ দত্ত এতদ্বিষয়ক একটী উৎকৃষ্ট প্রস্তাব ক্রমক্রমে লিখিয়াছিলেন। রাজেন্দ্র বাবু যে সমস্ত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদতি-রিক্ত আরও বিশিষ্ট বিশিষ্ট বিস্তর কারণ দর্শাইতে পারা যায়।

যাদব বাবু স্বয়ং পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন যে, পাণ্ডবেরা মাতৃদোষাপনয়নের উদ্দেশ্যে পঞ্চভ্রাতায় দ্রৌপদীর পানি গ্রহণ করেন। প্রতিবাদী মহাশয় "মাতৃদোষাপনয়ন" এই বাক্য যখনি মুখাগ্রে আনিয়াছেন, তখনি কুন্তীর দোষ স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু পাণ্ডুপত্নী কুন্তী কি দোষ করিয়াছিলেন? তিনি পঞ্চস্বামীতে উপগতা হইয়াছিলেন, এই দোষ নয়? যাদব বাবু যদি হাবা সাজিতে ইচ্ছা করেন, এবং স্বীয় মুখে কুন্তীর দোষ ব্যক্ত করিয়া আবার যদি সাধের হাবা সাজিয়া তাহার অপলাপ করেন,—করুন। কিন্তু আমরা তাঁহার মুখ ফুটাইতে পারিব। মনু লিখিতেছেন,—

অপত্যলোভাদ্যা তু স্ত্রী ভর্ত্তারমতিবর্ত্ততে।
সেহ নিন্দামবাপ্নোতি পতিলোকাচ্চ হীয়তে। ৫। ১৬১

যে স্ত্রী পুত্রকামনায় স্বীয় পতিকে অতিক্রম করিয়া পুরুষান্তরে উপগতা হয়, ইহ লোকে সে নিন্দাভাজন হইয়া থাকে এবং পরকালে সেই পুত্রদ্বারা স্বর্গে পতিসংসর্গ লাভ করিতে পারে না।

মনুর সময়েই ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করা নিতান্ত গর্হিত কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। পাণ্ডুর সময় এ কুপ্রথা প্রায় আর ছিল না, কিন্তু তখনও মনুষ্যের রুচি সর্ব্বতোভাবে মার্জ্জিত হয় নাই, তজ্জন্য কেহ কেহ ঐ প্রথার সমাদর করিতেন।

আমাদের বর্ত্তমান মত, বিশ্বাস এবং সামাজিক নিয়মানুসারে, স্ত্রীলোক এক কালে দুই বা ততোধিক পুরুষকে সম্ভোগ করিলে তাহাকে ব্যভিচারিণী বলা যায়। সে পক্ষে বিচার করুন, দ্রৌপদী তবে অসতী নয় ত কি? আবার কেবল আধুনিক মতানুসারেই বা কেন? মনু বলিয়াছেন,—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী কনিষ্ঠ ভ্রাতার পক্ষে গুরুপত্নী স্বরূপ এবং কনিষ্ঠের স্ত্রী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পক্ষে পুত্রবধূর তুল্য। দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবেরই স্ত্রী, অতএব যুধিষ্ঠিরেরও স্ত্রী। যুধিষ্ঠির পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে সর্ব্ব জেষ্ঠ, সুতরাং ধর্ম্মপুত্রের কনিষ্ঠ ভীমাদির

পক্ষে দ্রৌপদী গুরুপত্নী স্বরূপ। তবে বলুন দেখি, ভীমাদি কি দ্রৌপদীকে সম্ভোগ করিতে পারেন? পুনশ্চ, ভীমাদি যুধিষ্ঠিরের কনিষ্ঠ। দ্রৌপদী, ভীমাদির স্ত্রী; সুতরাং তিনি যুধিষ্ঠিরের পুত্রবধূ স্বরূপ। তবে বলুন দেখি, যুধিষ্ঠির বা কি রূপে দ্রৌপদীর সহবাস করিতে পারেন? পাণ্ডবেরা কি মাতার ভ্রমাত্মক বাক্যে ধর্ম্মে পতিত হন নাই? সত্যবাদী যুধিষ্ঠির কার্য্যগতির হেতুবশতঃ বিরাটগৃহে কঙ্ক এই কৃত্রিম নামে নিজ পরিচয় দিয়াছেন। জননীরও অনুমতি শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং সাধুবিগর্হিত বলিয়া পালন না করিলে ধর্ম্মে প্রত্যবায় ঘটিত না। কিন্তু তৎকালে মনুষ্যের রুচি পরিমার্জিত হয় নাই। সে কারণ যুধিষ্ঠির জেদ করিয়া দ্রৌপদীকে পঞ্চজনে বিবাহ করিতে ব্যবস্থা দিলেন। এটী নিতান্ত অসভ্যাবস্থার লক্ষণ।

যাদব বাবু আপত্তি করিয়াছেন,—

"যদি একাধিক পাত্রে উদ্বাহিত হইলে স্ত্রীলোক অসতী হয়, তবে একাধিক স্ত্রীর পাণিপীড়ন করিলে পুরুষেরা লম্পট হইবে না কেন? পুরুষের বেলায় বুঝি দোষ নাই,—পুরুষ পরশমণি!!!" যাদব বাবুকে এমন কথা কে বলিয়াছে যে, পুরুষ এককালে বহু স্ত্রীর পাণিপীড়ন করিলে যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত কামাচারী,—লম্পট বলিয়া গণ্য হয় না? আপস্তম্ব স্বীয় ধর্ম্মসূত্রে লিখিয়াছেন—

ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ব্বীত। ২। ৫। ১২

স্ত্রীর দ্বারা ধর্ম্ম ও পুত্র লাভ সম্পন্ন হইলে আর অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবে না। এ সম্বন্ধে মনু এবং বৃহস্পতিরও নিষেধ আছে।

এই গেল পূর্ব্বকালের কথা। অধুনাতন সভ্যজাতির মধ্যে পুরুষের একাধিক বনিতা নাই। বঙ্গদেশে যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহপ্রথা অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি তাহাও সুশিক্ষিত সভ্য ব্যক্তিগণ রহিত করিবার নিমিত্ত যত্ন করিতেছেন।

যাদব বাবু এই সমস্ত অসার আপত্তি কেন উত্থাপন করিয়াছেন, বলিতে পারি না। এই সকল আপত্তিখণ্ডনের তর্ক দ্বারা কল্পদ্রুমের বিফল উদরাধ্মান ঘটিতেছে।

প্রতিবাদী মহাশয় বহু যত্নে দ্রৌপদীর সতীত্ব রক্ষা করিয়া মহাভারত হইতেই স্ত্রীলোকের একমাত্র পতিপরায়ণতার দৃষ্টান্ত দ্বারা মহাভারতের নবীনত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। করুন,—সেটী আমারই সুবিধা। যেমন

বৃক্ষের মধ্যস্থিত বহুসংখ্যক পরিধিদর্শনে বৃক্ষের প্রাচীনত্ব নিশ্চিত হয়; অর্থাৎ করাত দ্বারা বৃহৎ বৃক্ষের গুঁড়ি ছেদন করিলে মসৃণ ছিন্ন প্রদেশে যতগুলি পরিধি দৃষ্ট হইবে, বৃক্ষের বয়ঃক্রম তত বৎসর,—বৃক্ষটী তত প্রাচীন। মহাভারতের কাণ্ডখানি ঠিক তদ্রূপ। এই বৃহৎ বৃক্ষের মধ্যস্থল ব্যবচ্ছেদ করুন; দেখিবেন, একখানি পুস্তকে পরস্পর এত বিরোধী মতের সমাবেশ আর কুত্রাপি নাই। কখন কোন স্থানে এক নারীর বহু পতি ব্যবস্থাপিত হইতেছে; ঋষিগণ সেই মতের পূজা করিতেছেন; তাহাকে সনাতন ধর্ম্ম বলিতেছেন। আবার দুপৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখুন আর সে ভাব নাই,—একমাত্র পতিপরায়ণতা ধর্ম্ম প্রবল করিবার নিমিত্ত সকলেই ব্যস্ত। ইহার আর কিছুই তাৎপর্য্য নহে; মহাভারত অতীব প্রাচীন পুস্তক। আর্য্যসমাজে যখন যে মত প্রবল হইয়াছিল, তৎকালে তাহাই উহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। নানা সময়ে নানা মুনি ঐ পুস্তকে নানা মত সঙ্কলন করিয়া রাখিয়াছেন। তজ্জন্য উহার আকার বৃহৎ, উহার মত-পরম্পরা পরস্পরের বিরোধী, এবং উহার ভাষা নানা ধরণের। এই সমস্ত বলবত্তর কারণ দ্বারা ভারত গ্রন্থের প্রাচীনত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে।

অতঃপর যাদব বাবু তুলিকা হস্তে অর্দ্ধোন্মীলিত নয়নে নিপুণ চিত্রকরের ন্যায় দূর হইতে এক দৃষ্টে চিত্রের অঙ্গরাগ দেখিতেছেন। তিনি চিত্রপট দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। সেই চিত্র দর্শনের আনন্দ অপার, একা তাহা হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলেন না। তজ্জন্য তাঁহার প্রাণাধিক সুহৃদকে কিঞ্চিৎ উপভোগ করাইবার জন্যই ইঙ্গিত করিয়া ডাকিলেন,—

"কই—রঙ্গলাল বাবু কোথায়? আপনার "পাঁজি পুঁথি" খুলে নিয়ে এখন একবার আসুন দেখি স্বয়ম্বর পর্ব্বের বিচার করি।"

যাদব বাবু! এই যে আমি। আজ্ঞা করুন ভাই! আপনার কি নিয়োগের অনুষ্ঠান করিতে হইবে? এই যে আমি "পাঁজি পুঁথি" আনিয়াছি; দেখিতেছেন না?—এই আমার হস্তে "লর্ড মেকলে" প্রণীত মহাকবি মিল্টনের জীবন চরিত রহিয়াছে। অর্জ্জুন শরাসন হস্তে রাধাচক্রের ভিতর দিয়া মৎস্যের চক্ষু বিঁধিতেছেন, এখানে রামচন্দ্র একটী পুরাতন ধনুক ভাঙ্গিতেছেন—এই দুটী চিত্রের কোনটী ভাল ও প্রাচীন, তাই কি বলিতে হইবে? তবে বলি,—শুনুন, আমাকে রাধাচক্রের চিত্র ব্যাপারটী বড় ভাল

লাগিতেছে। কারণ, সেটী আদি কবি বেদব্যাসের অকৃত্রিম তুলিকার বর্ণ-বিন্যাস।

বাল্মীকি ইচ্ছাপূর্ব্বক রামায়ণকে কাব্যাকারে প্রকাশ করিতে যত্ন পাইয়াছিলেন, তজ্জন্য সর্ব্বাংশে তিনি শ্রেষ্ঠ কবি। কিন্তু মহাভারতকারদিগের উদ্দেশ্য অন্যপ্রকার। তাঁহারা ঐতিহাসিক বৃত্তান্তই যত্নপূর্ব্বক সঙ্কলন করিয়াছেন। প্রত্যুত, আদি কবিদিগের চিত্রগুলি অতি মনোহর। এস্থলে সেই অপ্রাসঙ্গিক বিচারের প্রয়োজন নাই। লর্ড মেকলে প্রণীত মহাকবি মিল্টনের জীবনচরিতে ইহার উৎকৃষ্ট বিচার আছে। পাঠকগণ! তদ্দর্শনে আপনাদের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবেন। মহাভারতের যে যে স্থলে কবিত্ব আছে, তাহা উৎকৃষ্ট হইবারই কথা।

ইহা সর্ব্বত্রই প্রথিত আছে, আদি কবিদিগের ভাবচাতুরী ও স্বভাবের চিত্র অতি চমৎকার; কিন্তু তাঁহাদের ছন্দোবন্ধ, শব্দবিন্যাস এবং রচনার ছটা পরিষ্কৃত ও পরিমার্জ্জিত নহে। কবিকঙ্কণের কমলে কামিনী একটী উৎকৃষ্ট চিত্র। ভারতচন্দ্র রায় মানসিংহে দাগে দাগে তুলী টানিতে গিয়াছেন; এক প্রকার বেশ রঙও ফলাইয়াছেন—মন্দ নয়। কিন্তু তেমন চিত্রটী হয় নাই। আবার মধুসূদন দত্ত মেঘনাদবধে উহার অনুকরণ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু রঙ ঢালিয়া চিত্রটাকে ছপ্‌কে দিয়াছেন। পাঠক! দেখুন, মুকুন্দরামের চিত্র ভাল; কিন্তু ভারতচন্দ্র রায় ও মধুসূদন দত্তের রচনা ও শব্দবিন্যাস উৎকৃষ্ট।

প্রতিবাদী মহাশয় মহাভারতে যুদ্ধের কৌশল অধিক দেখিয়াছেন, কিন্তু রামায়ণে তাদৃশ কৌশলাদি দেখিতে পান নাই। রামচন্দ্রের সৈন্য সামন্ত কিছুই ছিল না। কতকগুলা বনের বানর লইয়া তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথাপি বীরদিগের স্পর্দ্ধা ও বাক্যালাপের বিচার করুন, কোন্ পুস্তক খানি সভ্যাবস্থার বলিয়া প্রতিপন্ন হয়;—দেখুন। মহাভারতের বর্ণনা সকলি অলৌকিক; কবির কল্পনাতে ভিন্ন সেই সমস্ত বর্ণিত ব্যাপার কখন মনুষ্যের চক্ষুর গোচর হইতে পারে না। যুধিষ্ঠিরের সভা দেখুন, এ দিকে দশরথ রাজার সভা ও নগর দেখুন। ব্যাস কখন উৎকৃষ্ট সভা দেখেন নাই, সুতরাং যুধিষ্ঠিরের গৃহ লোকাতীত সৌন্দর্য্যে সুসজ্জিত। কিন্তু বাল্মীকি সম্ভবমত উপযুক্ত রাজসভারই বর্ণন করিয়াছেন। মহাভারতে বিশ্বামিত্রের ধ্যানভঙ্গ ব্যাপার—স্বর্গ হইতে অপ্সরা আসিল। এখানে রামায়ণে যোগপরা-

য়ণ জিতেন্দ্রিয় ঋষ্যশৃঙ্গকে বশীভূত করিতে হইবে। বৃহৎ নৌকার উপর কৃত্রিম উদ্যান করিয়া বারবনিতারা মুনির নিকট গমন করিল। এইরূপ রামায়ণে কেবল সভ্যতার উন্নতি দৃষ্ট হয়।

আলোচ্য পুস্তক দুই খানির রচনা সম্বন্ধে যাদব বাবু বলেন যে "স্থানভেদে রচনার অনেক বৈলক্ষণ্য ঘটে। মহাভারত এবং রামায়ণে সে কারণ বর্ত্তমান আছে কি না, তাহা কে বলিতে পারে? তদ্ভিন্ন বেদব্যাসের রচনা জটিল হইবার আরও কারণ আছে। ব্যাস মহাভারত বলিতেছেন, গণনায়ক তাহা লিখিতেছেন। গণেশের প্রতিজ্ঞা,—ক্ষণকালও তাঁহার কলম বন্ধ হইবে না; ব্যাসের প্রতিজ্ঞা,—গণপতি তদ্রচিত শ্লোকের মর্ম্মার্থ জ্ঞাত না হইয়া লিখিতে পাইবেন না। সুতরাং মহাভারতের রচনা কঠিন হইয়া পড়িল। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণের আখ্যান শিশুর দ্বারা প্রচার করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন; কূটার্থ ও কঠিন ভাষা বালকের হৃদয়ঙ্গম হইবে না বলিয়া তিনি সরল ভাষায় রামায়ণ রচনা করিলেন।"

এই কি ঐতিহাসিক তত্ত্ব নির্ণয়ের প্রথা? আমরা প্রথম আপত্তিটী সঙ্গত জ্ঞান করি; কিন্তু লিখিত ভাষার আপত্তিটী সঙ্গত নহে। স্থানভেদে লিখিত ভাষার প্রায় কোন বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। অপর দুটী আপত্তি নিতান্ত অসার।

বেদব্যাস ও গণেশের বৃত্তান্ত যাহা মহাভারতে সঙ্কলিত হইয়াছে, সেটী কাল্পনিক ভূমিকা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু এতদ্দ্বারা মহাভারতের প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। ব্রাহ্মণদের বিদ্যাক্ষেত্রে এই প্রথম অভ্যুদয়। তৎকালে সচরাচর সুলেখক দৃষ্টিগোচর হইত না, তজ্জন্য ব্যাস সাতিশয় চিন্তিত হইলেন। মনে মনে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, কোথায় সুলেখক পাইবেন, প্রতিনিয়ত তাহারই অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাল্মীকির অসুবিধা অন্যপ্রকার। তিনি কোথায় সুগায়ক পাইবেন, তাহাই ভাবিতেছিলেন। কবি রামায়ণ কাব্য পূর্ব্বেই পরিসমাপ্ত করেন। গ্রন্থ রচনা করিবার সময় তিনি জানিতেন না যে, বালক যুবা অথবা বৃদ্ধ ইহাদের মধ্যে কে তদ্রচিত কাব্যের গায়ক হইবে। আবার কুশীলব যখন রামায়ণ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন, তৎকালে তাঁহারা বেদপরায়ণ সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী হইয়াছিলেন। সুশিক্ষিত বালকের মুখে (৪) কঠিন শব্দ উচ্চারিত না হইবার কারণ নাই।

---

(৪) স তু মেধাবিনৌ দৃষ্ট্বা বেদেষু পরিনিষ্ঠিতৌ।
বেদোপবৃংহণার্থায় তাবগ্রাহয়ত প্রভুঃ। বালকাণ্ড। ৪। ৬

যাদব বাবু আর এক স্থানে লিখিয়াছেন,—আমরা সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ ঋষি-দিগের কথা না রঙ্গলাল বাবু যাহা বলেন, তাহাই বেদমন্ত্রস্বরূপ বিশ্বাস করিব ?

তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী ঋষিদিগের বাক্যের সম্মান করুন; আমার বাক্য বেদমন্ত্রস্বরূপ জ্ঞান করিতে বলি না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তিনি ঋষিদিগের প্রলাপবাক্যও কি অম্লান বদনে বিশ্বাস করিবেন? প্রতিবাদী মহাশয় ঋষিবাক্য মানিয়া একটী কথার সমাধান করিয়া দিউন, তবে তাঁহাকে যুক্তিপথ অবলম্বন করিতে বলিব না। বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশে তৃতীয় অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়—

তস্মাৎ সত্যব্রতঃ। যোঽসৌ ত্রিশঙ্কুসংজ্ঞামবাপ, চণ্ডালতামুপগতশ্চ। দ্বাদশবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যাং বিশ্বামিত্রকলত্রাপত্যপোষণার্থং চণ্ডালপ্রতিগ্রহ-পরিহরণায় চ জাহ্নবীতীরে ন্যগ্রোধে মৃগমাংসমনুদিনং ববন্ধ। ১৩।

তাঁহার পুত্র সত্যব্রত। তিনি ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত হন। তিনি চাণ্ডা-লত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দ্বাদশ বর্ষ অনাবৃষ্টি হইলে তিনি বিশ্বামিত্রের অপত্যকলত্রাদির ভরণ পোষণের নিমিত্ত গঙ্গাতীরস্থিত বটবৃক্ষে প্রত্যহ মৃগ-মাংস বাঁধিয়া রাখিতেন। তাহাতে বিশ্বামিত্র অশুদ্ধ প্রতিগ্রহ বলিয়া জানিতে পারিতেন না।

সকলেই জানেন ভগীরথ মর্ত্ত্যে গঙ্গা আনয়ন করেন। পাঠক! সেই ভগীরথ ত্রিশঙ্কুর দ্বাদশ পুরুষ পরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাদব বাবু ঋষিবাক্য মানিয়া তবে বলিয়া দিউন,—ত্রিশঙ্কু ভাগীরথীর তীর কোথায় পাইলেন? প্রতিবাদী মহাশয় বিচার করিতে করিতে একটী সেকেলে কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন। মনুর নাসিকা হইতে ইক্ষ্বাকু উৎপন্ন হইলেন, মান্ধাতা পুরুষের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত বাক্য ঋষিদিগের পুস্তকে আছে, সেই পর্য্যন্ত ভাল; তৎপ্রতি আমাদের আর দৃষ্টিপাত করিয়া কাজ নাই। সর্ব্বলোকনমস্কৃত স্বয়ং ব্রহ্মাও প্রলাপ বাক্য বলিলে আমরা তাহার আদর করিব না, কিন্তু বালকেও যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিলে আমরা তাহার পূজা করিব।

প্রতিবাদী মহাশয় লিখিয়াছেন,—আমার প্রতিবাদ পত্রের কোন স্থানেই লিখিত হয় নাই যে, (৫) বাল্মীকি দেবর্ষি নারদের মুখে রামের বৃত্তান্ত শুনিয়া তাহা কাব্যাকারে প্রকাশ করেন নাই।

(৫) অনেক মহাভারতেই বাল্মীকির নাম দৃষ্ট হয়, তাহা যাদব বাবুর অঙ্গুলি নির্দ্দেশে

এ কথা সত্য। যাদব বাবু স্পষ্টাক্ষরে নারদের নামোল্লেখ করেন নাই। কিন্তু মাঘ মাসে রামায়ণ ও মহাভারত শীর্ষক যে প্রস্তাব লিখিত হইয়াছিল, তাহাতে আমি এইরূপ নির্দ্দেশ করি,—ব্যাস স্বীয় কাব্যে চন্দ্রবংশোদ্ভব রাজাদের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবার কিছুকাল পরে বাল্মীকি রামের ইতিহাস দেবর্ষি নারদের মুখে শুনিলেন এবং তাহা ভাব রস ও ছন্দে সুশোভিত করিয়া জনসমাজে প্রকাশিত করিলেন।

যাদব বাবু এই বাক্যের প্রতিবাদ করিয়া লেখেন,—

"ভারত যুদ্ধের বহু পূর্ব্বে রামায়ণবর্ণিত অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছিল, কিন্তু লেখকাভাবে বর্ণিত হয় নাই। পরে শত কি সহস্র বৎসরান্তরে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ ঘটনা হইল। কিন্তু কি লিখিবেন? তখন অতি বৃদ্ধ প্রপিতা-মহের আমলে কি ঘটনা হইয়াছিল, তাহাই খুঁজিয়া খুঁজিয়া রামায়ণগ্রন্থ সংগ্রহ করিলেন! লেখকের কি চিন্তাশক্তি! বলিহারি যাই!!"

এতদ্দর্শনে আমার এই অনুমান হইল, যাদব বাবু রামায়ণের আখ্যানটী বাল্মীকির স্বকপোলকল্পিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাহেন। তিনি মহা-ভারত দৃষ্টে কিম্বা নারদের মুখে শ্রবণ করিয়া উহা সঙ্কলন করেন নাই। যাহা হউক, যাদব বাবুর বাক্যের যদি সেরূপ তাৎপর্য্য না হয়, তবে তদীয় আপ-ত্তির মর্ম্মগ্রহে আমি সমর্থ হই নাই। আমার ভ্রম হইয়াছিল।

প্রতিবাদের প্রতিবাদ এই শীর্ষক প্রস্তাবে আমি লিখিয়াছিলাম যে, বাল্মীকির নায় উত্তর কালে কেহ কৃত্রিম করিয়া মহাভারতে সন্নিবেশিত করি-য়াছেন। তদ্দৃষ্টে প্রতিবাদী মহাশয় এই আপত্তি করেন যে,—

"সর্ব্বত্র প্রচারিত গ্রন্থে সাহস পূর্ব্বক কখনই কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। বিশেষতঃ হিন্দু সমাজে মহাভারত একখানি ধর্ম্মশাস্ত্র, হিন্দুরা মহা-ভারতকে বেদতুল্য মান্য করেন; অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রে অভিনব বিষয় সন্নিবে-শিত করিতে কখনই কেহ সাহস করিতে পারে নাই। তবে প্রচারকগণ কর্ত্তৃক উহাতে যে ভূমিকা সন্নিবেশিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা মূল গ্রন্থের ক্ষতি বৃদ্ধি হয় নাই।"

যাদব বাবু স্বীকার করিয়াছেন যে, আদ্যোপান্ত মহাভারতখানি ব্যাসের

আমি জ্ঞাত হই নাই। আমার লিখিত প্রথম প্রস্তাবেই আমি তদ্বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার সেই টীকা একটী স্বতন্ত্র পত্রে লিখিত ছিল। বোধ হয়, তজ্জন্য সম্পাদক মহা-শয়ের অনবধানতায় তাহা আমার প্রস্তাবে প্রকাশিত হয় নাই।

তার কৃষ্ণের নাম করিয়া ফেলিলেন। নারায়ণ রাম অবতারে এবং কৃষ্ণাবতারে দলিতাঞ্জন-স্নিগ্ধ-শ্যাম মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। আমরা এস্থলে কৃষ্ণ শব্দে গোলকবাসী হিরণ্ময় বপু বিষ্ণুকে অনুমান করিতে পারি না। বিশেষতঃ অন্যান্য অবতারের নাম সাহচর্য্য বশতঃ এতদ্দ্বারা নন্দের নন্দন কৃষ্ণকেই বুঝিতে হইবে। অতএব স্পষ্টই সপ্রমাণ হইতেছে, বাল্মীকি কৃষ্ণাবতারের পর রামায়ণ কাব্য প্রণয়ন করেন।

ভৃগুবংশের ধারার উল্লেখে যথার্থই আমার ভ্রম হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে প্রকৃত প্রস্তাবের কিছুই ক্ষতি হয় নাই। যাদব বাবু লিখিয়াছেন—

"চ্যবনপুত্র প্রমতি উত্তর কালে বাল্মীকি নামে অভিহিত হইয়াছিলেন কি না, তাহা আমরা এ পর্য্যন্ত স্থির করিতে পারি নাই, রামায়ণে তাঁহার পূর্ব্ব নাম রত্নাকর বলিয়া উক্ত হইয়াছে,—কিন্তু এই নামটী তাঁহার দস্যু-বৃত্তির জন্য প্রসিদ্ধ।"

কোষাদিতে বাল্মীকি নামের অপর পর্য্যায় প্রাচেতস, বাল্মীক, কবি-জ্যেষ্ঠ, কুশীলব, বল্মীক, কবি, আদ্য কবি এবং ঋক্ষ এই কয়েকটী দৃষ্ট হয়। কোথাও প্রমতি নামের উল্লেখ নাই। রামায়ণে তাঁহার রত্নাকর নাম কিম্বা দস্যুবৃত্তির কথা কিছুই লিখিত হয় নাই। ভবভূতি এক স্থানে বাল্মীকির প্রাচেতস নাম গ্রহণ করিয়াছেন। যথা—

যদা তাবদন্যোঽপি মুনয়স্তমেব হি পুরাণব্রহ্মবাদিনং প্রাচেতসমৃষিং ইত্যাদি। (উত্তর চরিত)

বাল্মীকি, ব্রহ্মার পুত্র প্রচেতার সন্তান নহেন। কারণ, তিনি ভৃগুকুলোদ্ভব, ইহা পুরাণে ব্যক্ত রহিয়াছে। "রাবণান্তকরো রাজা রঘূণাং বংশবর্দ্ধনঃ বাল্মীকির্যস্য চরিতং চক্রে ভার্গবসত্তমঃ।" (মৎস্য পুরাণ।) অতএব বোধ হইতেছে, তিনি ভৃগুকুলোদ্ভব কোন প্রচেতার সন্তান হইবেন। ব্রহ্মা হইতে বাল্মীকি পর্য্যন্ত পুরুষপরম্পরায় নাম নিশ্চিত করা কঠিন হইল। এতদ্দ্বারা স্থির হইতেছে, তিনি আর্ষকালের অনেক পরে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। কালিদাস সে দিনের প্রসিদ্ধ কবি; কিন্তু অনেক অনুসন্ধানেও তাঁহার পিতামাতার নাম স্থির করা যায় নাই। অতএব কাহারও পিতৃপুরুষের নাম নিশ্চিত করিতে না পারিলে তিনি যে প্রাচীন লোক হইবেন, এমন কোন কথা নাই। বরং আর্ষকালীন ঋষিদিগের বংশবিবরণ উপলব্ধ হয়। বাল্মীকি আর্ষকালীন লোক হইলে তাঁহার বিস্তর পরিচয় পাওয়া যাইত।

প্রতিবাদী মহাশয় লিখিয়াছেন,—রঙ্গলাল বাবু বলেন, কুরুপাণ্ডবদিগের বৃত্তান্ত ব্যাসের রচিত নহে। আর, ভারতবংশের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া গ্রন্থের নাম মহাভারত হয় নাই।

আমি কখন এমন নির্দ্দেশ করি নাই। আমার প্রস্তাবে লিখিত আছে,—ভারত সংহিতায় বেদাদি শাস্ত্রের সারাংশ সংকলিত হইয়াছে (ভারঃ বেদাদি শাস্ত্রেভ্যোপি সারাংশঃ অস্ত্যাস্য ত) সে কারণ উহার নাম মহাভারত। আবার পরবর্ত্তী ঋষিরা যখন উহাতে ভারতবংশাখ্যান বর্ণনা করিলেন তখন তৎকারণেও ঐ গ্রন্থের নাম মহাভারত রাখিলেন। এই মাত্র আমার প্রস্তাবে কথিত হইয়াছে।

তৎপরে যাদব বাবু লিখিয়াছেন,—বিজ্ঞ লেখক আরও বলেন পূর্ব্বকালে মনুষ্যেরা দীর্ঘজীবী ছিল না,—উহা যুগবিশেষের প্রশংসাবাদ মাত্র। কিন্তু শাস্ত্রকারগণ বলেন, কালক্রমে মনুষ্যের পরমায়ু ও শক্তি উভয়ের হ্রাস হইতেছে।

আমি এক কথা জিজ্ঞাসা করি, যাদব বাবু কাহাকে পূর্ব্বকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাহেন এবং মনুষ্য কত বৎসর জীবিত থাকিলে তাহাকে দীর্ঘজীবী বলিবেন? আমি ত কই অশাস্ত্রীয় বাক্যে মনুষ্যের আয়ুষ্কাল নির্দ্ধারিত করি নাই? শ্রুতির মতে মনুষ্যের একশত বর্ষ পরমায়ুঃ। মতান্তরে "শতং বর্ষাণি বিংশত্যা নিশাভিঃ পঞ্চভিঃ সহ। পরমায়ুরিদং প্রোক্তং নরাণাং করিণামিহ।" মনুষ্য এবং হস্তীর পরমায়ু একশত বিংশতি বৎসর পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রি। এই নিয়ম অসঙ্গত নহে; ইহা অদ্যাপি দৃষ্ট হইতেছে। ঋগ্বেদের অনেকগুলি ঋকে উল্লেখ আছে, ঋষিগণ শত বৎসর পরমায়ু লাভের নিমিত্ত দেবতাগণের আরাধনা করিতেছেন। সত্য যুগে সকলেরই আচার ব্যবহার যে নির্ম্মল ছিল, এমন নহে। তৎকালে সকলেই যে দীর্ঘজীবী ছিলেন, তাহাও নয়। মনু লিখিতেছেন,—

এবং যথোক্তং বিপ্রাণাং স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠতাম্।
কথং মৃত্যুঃ প্রভবতি বেদশাস্ত্রবিদাং প্রভো। ৫। ২

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে প্রভো বেদশাস্ত্রপারগ, শাস্ত্রবিহিত স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণদিগের কি কারণে অকাল মৃত্যু ঘটিতেছে।

ঋষিদিগের বাক্য শ্রবণে ভৃগু উত্তর করিলেন,—

অনভ্যাসেন বেদানামাচারস্য চ বর্জ্জনাৎ।

আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্ব্বিপ্রান্ জিঘাংসতি।
লশুনং গৃঞ্জনঞ্চৈব পলাণ্ডুং কবকানি চ।
অভক্ষ্যাণি দ্বিজাতীনামমেধ্যপ্রভবানি চ। ইত্যাদি ৫। ৪। ৫

ব্রাহ্মণেরা আর বেদাভ্যাস করেন না; তাঁহারা আচারভ্রষ্ট হইয়াছেন; তাঁহাদের আলস্য এবং অন্ন-দোষ ঘটিয়াছে। তজ্জন্য তাঁহারা অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হইতেছেন। লশুন, গৃঞ্জন, পলাণ্ডু, ছত্রক (কোরক), বিষ্ঠা-জাত দ্রব্য এই সমস্ত ব্রাহ্মণদিগের অভক্ষ্য, তাঁহারা এই সমস্ত সামগ্রী ভক্ষণ করিতেছেন। ইত্যাদি।

যদি শাস্ত্রের বাক্য মান্য করেন, তবে দেখুন, "সত্যযুগে পুণ্যং পূর্ণং পাপং নাস্তি। গ্রহাংশোব্রাহ্মণঃ মজ্জাগতাঃ প্রাণাঃ ইচ্ছা মৃত্যুঃ লক্ষবর্ষং পরমায়ুঃ" ইত্যাদি লোক প্রসিদ্ধ বাক্যের মুণ্ডপাত হইতেছে। যাদব বাবু ঋষি-বাক্যের সমাদর করিয়া কি প্রকারে বিবাদ ভঞ্জন করিবেন, করুন।

সুবিজ্ঞ পাঠক মহাশয়গণ এক্ষণে বিচার করিয়া দেখুন, প্রতিবাদী মহাশয় যে সমস্ত আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন, একে একে তৎসমুদয় খণ্ডিত হইল। কিন্তু আমি আপনাদের চিত্তে যে সন্দেহের স্ফুলিঙ্গটী নিক্ষেপ করিয়াছি, তাহা ত প্রধূমিত হইতে লাগিল। সে সন্দেহানল নির্ব্বাণ হয় কিসে? কই,—যাদব বাবু আমার প্রস্তাবিত বিষয়ের প্রতিকূলে ত কোন আপত্তি দর্শাইতে পারেন নাই। তবে কি প্রকারে আমার মত খণ্ডিত হইল?

পাঠকগণ! বিচার করিয়া দেখুন, যে প্রাচীনতত্ত্ব বিস্মৃতির কুক্ষিগত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার উদ্ধার করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। তথাপি আমার সমস্ত প্রস্তাব পাঠে আপনাদের কি সন্দেহ হইতেছে না? মহাভারতকে রামায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত যতই কেন বহুবিধ কারণ দর্শিত হউক, কিন্তু তদ্দ্বারা এককালে মনের মালিন্য কিছুতেই দূরীভূত হইবে না। চিরকালের সংস্কার হৃদয়ে গাঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়া থাকে।

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।

দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।

বরুণ। একশত বৎসর পূর্ব্বে ঐ সপ্তগ্রামে ওলন্দাজদিগের একটী বাগান-বাটী ছিল। গ্রীষ্মকালে সেই বাগানে তাহারা ভোজনান্তে বিশ্রামসুখ অনুভব

করিত। ১৫৬৬ অব্দে যখন ঐ স্থান একটী বিখ্যাত বাণিজ্যের স্থান হইল তখন প্লিনিদিগের দ্বারা অনেক বাণিজ্যদ্রব্য আমদানী রপ্তানী হইত। সপ্তগ্রামে রোমকেরাও বাণিজ্য করিতে আসিত। তাহারা উহাকে গ্যাঙ্গেস রিজিয়া বলিয়া ডাকিত। বঙ্গদেশের রাজারা অধিকাংশ সময় ঐ নগরেই অতিবাহিত করিতেন। ইউরোপীয়েরাও প্রথমে এদেশে আসিয়া চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন। এক্ষণে সপ্তগ্রামে আর কিছুই নাই, কালের পরিবর্ত্তনে সপ্তগ্রাম এক্ষণে একটী সামান্য জঙ্গলপূর্ণ পল্লিগ্রামের আকার ধারণ করিয়াছে এবং শৃগাল কুক্কুর প্রভৃতির আবাস-ভূমি হইয়াছে। অদ্যাপি ঐ স্থানে পুষ্করিণী ও কূপাদি খনন করিবার সময় নৌকার মাস্তল ও ভগ্ন তক্তা প্রভৃতি পাওয়া যায়।

দেবগণ গল্প করিতে করিতে অপরাহ্ণে চুঁচুড়ায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা বারিকের নিকটে উপস্থিত হইলে উপ চীৎকার করিয়া কহিল "বরুণ কাকা! দেখাযাচ্চে ওগুলো কি?

চুঁচুড়া।

বরুণ। দেবরাজ, সম্মুখে দেখ চুঁচুড়ার বারিক। পূর্ব্বে এই বারিকে অসংখ্য গোরা থাকিত। এক্ষণে নর্ম্মালস্কুল বসিতেছে।

নারা। এ নগর নির্ম্মাণ করে কে?

বরুণ। ১৬৭৫ খ্রীঃ অব্দে ওলন্দাজেরা বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া এই নগর নির্ম্মাণ করে। ১৬৮৭ সালে তাহাদের কর্তৃক এখানে একটী দুর্গ নির্ম্মিত হয়। উহারা এই নগরে প্রায় একশত বৎসরের উপর রাজ্য করিয়াছিল। ১৮২৬ অব্দে ইংরাজদিগের নিকট হইতে সুমাত্রাদ্বীপ লইয়া এই নগর পরিবর্ত্তন করে। হুগলি ও চুঁচুড়া পরস্পর এরূপ ভাবে সংলগ্ন, যে উভয় স্থানকে এক নগর বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

এই সময় দেবগণ দেখেন "হুমাহুম" শব্দ করিতে করিতে চারি জন বাহক একখানি শিবিকা বহন করিয়া আনিতেছে। শিবিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর দুইজন বাহক ছুটিয়া আসিতেছে। পাল্কিখানি দেবগণের নিকট উপস্থিত হইলে শিবিকা-মধ্যস্থ বাবু চীৎকার করিয়া কহিলেন—"মাজি পাল তুলে দে।" পশ্চাৎ ভাগের বাহক ছুটিয়া আসিয়া কহিল "হুজুর কি আজ্ঞা করছেন?

বাবু। পাল তুলে দে।

বাহক। আজ্ঞে, এত নৌকা নয়?

পাল্কিখানি চলিয়া যাইলে পিতামহ কহিলেন " বরুণ ও কি হলো?"

বরুণ। মাতাল মদ্যপানে মাতোয়ারা হইয়া ঐ প্রকার বলিতেছে।

ব্রহ্মা। শ্রীবিষ্ণু! মদ্যপান করিলে সপ্তদশ পুরুষ নরকস্থ হয় কুলাঙ্গারেরা কি এ জানে না?

বরুণ। জানে, কিন্তু তাহাতে ভয় করে না। আজ কাল মর্ত্ত্যে স্ত্রী, পুরুষ, মেয়ে, ছেলে, সকলেই মাতাল। এমন অনেকগুলো পুরুষ আছে যাঁহারা পুত্রগণকে বাল্যকাল হইতেই দুগ্ধে মদ মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইতে শেখায়, সে সব কথা যাক্, সন্ধ্যা প্রায় আগত, অতএব এই ব্যারিকের মধ্যে আশ্রয় লইলে ভাল হয় না?

দেবগণ এ কথায় সম্মত হইলে বরুণ ব্যারিকের মধ্যে একটী বাসা স্থির করিলেন এবং কয়েকজনে সে রাত্রি সেই বাসাতে অতিবাহিত করিয়া প্রাতে আবার নগর ভ্রমণে বাহির হইলেন। বরুণ কহিলেন " পিতামহ, সম্মুখে দেখুন পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের বাসা।

দেবতারা এখান হইতে ডফের স্কুল, ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ারের আফিস দেখিয়া এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন একটী বাবু মাতাল হইয়া টলিতে টলিতে রাস্তা দিয়া যাইতেছে।

ইন্দ্র। বরুণ! এ বাবুটীও কি মাতাল?

বরুণ। এই বাবুর বিষয় তোমাকে শোনান উচিত। ইহার মাতা অল্প বয়সে বিধবা হন। তাঁহার ভগ্নীপতি একজন বড় লোক। ঐ দুরাত্মা বিধবা শালির রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার গর্ভে এই পুত্র উৎপাদন করে। মিন্সের একান্ত ইচ্ছা ছিল সমস্ত বিষয় বিভব পুত্রদিগকে না দিয়া ইহাকেই দিয়া যাইবে; কিন্তু পুত্রেরা এই সমাচার জ্ঞাত হইয়া পিতাকে—

ইন্দ্র। আরে ছি! ছি! পৃথিবীতে আর বাচ বিচার নাই!

উপ। বরুন কাকা! কি বল্লে আবার বল না? আমি বাড়ী গিয়ে গল্প করবো।

এখান হইতে একস্থানে যাইয়া দেবগণ দেখেন একটী বাবু সাজ গোজ করিয়া ব্যাগ হস্তে লইয়া কোথায় যাইতেছেন। একটী প্রাচীনা স্ত্রীলোক কহিতেছেন " যত টাকা ব্যাগে দিয়া জামাইকে আস্তে চাস; নইলে বড় কলঙ্ক হবে, লোকের কাছে মুখ দেখান যাইবে না। "

তাঁহারা চলিয়া যাইলে পিতামহ কহিলেন "ওরা বল্লে—নইলে বড় কলঙ্ক হবে, লোকের কাছে মুখ দেখান যাইবে না। বরুণ! কলঙ্ক হবে কেন?"

বরুণ। আজ্ঞে, আপনাকে কিছুই গোপন করিবার যো নাই। হয়েছে কি জানেন—ঐ বাড়ীর একটা কন্যার কুলীনে বিবাহ হয়। জামাই রাগ করিয়া গিয়া প্রায় ৪।৫ বৎসর আসেন নাই। এক্ষণে মেয়েটীর গর্ভাবস্থা। অতএব এই সময় জামাইকে টাকা দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া আনিয়া তৎপরদিন গর্ভ প্রচার করিলে তত দোষ হইতেছে না।

নারা। ভাল যদ্যপি কেহ দিন গণে দেখে ধরে ফেলে?

বরুণ। তখন ছেলেটা সাতাসে কি আটাসে বাতা হউক একটা বল্লেই হ'লো।

ব্রহ্মা। শ্রীবিষ্ণু! য়্যাঁ! আজ কাল বুঝি এইরূপ করে কলঙ্কের হাত এড়ান হয়!

বরুণ। এরা তবু ভদ্র! অনেক স্থলে নষ্ট করিয়া ফেলে।

দেবগণ অনেকক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইয়া বেলা আন্দাজ সওয়া দশটার সময় কলেজ কম্পাউণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক দৃষ্টে বাড়ীটীর প্রতি চাহিতে লাগিলেন। বরুণ কহিলেন ইহারই নাম হুগলি কলেজ। কলেজের উপরে ইহার প্রিন্সিপাল বা কর্ত্তা সাহেবের বাসা। ওদিকে দেখুন রসায়ন বিদ্যালয়। ঐ বিদ্যালয়ে রসায়ন শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয়। গৃহ মধ্যে শিক্ষোপযোগী অনেক যন্ত্র তন্ত্র আছে।

ইন্দ্র। এই বাড়ীটী বড় চমৎকার।

বরুণ। এই বাড়ীটী প্রাণকৃষ্ণ হালদার নামক একজন জমীদারের বৈঠকখানা ছিল। ঐ প্রাণকৃষ্ণ হালদার নোট জাল করা অপরাধে দ্বীপান্তরিত হন। ইনি মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া কিছু কাল জীবিত ছিলেন। মনুষ্যের যতদূর সুখভোগ করা সম্ভব তাহা এই প্রাণকৃষ্ণ করিয়াছিলেন। আবার মনুষ্যের যতদূর দুঃখভোগ করা সম্ভব তাহাও প্রাণকৃষ্ণের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। যে প্রাণকৃষ্ণ সুখের দশায় পক্ষিরাজ সদৃশ ঘোটক সংযুক্ত গাড়ি ঘুড়ি হাঁকাইতেন; সেই প্রাণকৃষ্ণ দুঃখের দশায় ছ্যাক্‌ড়া গাড়ি ভাড়া করিতে যাইলে গাড়োয়ানেরা অম্লানবদনে বলিয়াছিল—"বাপের জন্মে কি গাড়ি চেপেছ।" যে প্রাণকৃষ্ণ রাস্তায় টাকা ছড়াইয়া

তাহার উপর দিয়া ভ্রমণ করিতেন; সেই প্রাণকৃষ্ণ দুঃখের অবস্থায় এক পয়সার আফিং ক্রয় করিয়া মূল্য দিতে না পারায় দোকানদার-গৃহিণী হাত হইতে আফিং কাড়িয়া লইতেও কসুর করে নাই।

ব্রহ্মা। দেখ ভাই! মনুষ্যের অবস্থা চির দিন কখন এক ভাবে যায় না। বোধ হয় প্রাণকৃষ্ণ বেচালে চলাতেই বে-চাল হইয়া পড়িয়াছিলেন। যাহা হউক আমার মানুষেরা প্রাণকৃষ্ণ হইতে অনেক উপদেশ পাইতে পারেন।

উপ। বরুণ কাকা! এ কলেজে এত নেড়ে কেন?

ইন্দ্র। সত্যি বরুণ! এ কলেজে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা এত বেশী কেন?

বরুণ। ইমামবাড়ার প্রাচীরে আমি যে মহম্মদ মহসীনের দানপত্র পাঠ করিয়াছি, তাহাতে লিখিত আছে—তাঁহার সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের জন্য দুই জন করিয়া মাতয়ালি নিযুক্ত থাকিবে। ঐ লিখনানুরূপ কার্য্য চলিতেছিল; তৎপরে ১৮১৮ অব্দে বোর্ড অব রেবিনিউ মাতয়ালিদিগের হস্ত হইতে কার্য্যভার কাড়িয়া লইয়া অপরের হস্তে অর্পণ করেন। মাতয়ালিরা এই কারণে বোর্ডের নামে নালিশ করিলে জজের বিচারে বোর্ডেরই জয় লাভ হইল। মাতয়ালিরা প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করিলেন সেখানেও কোন ফল হইল না। এই মকদ্দমা ক্রমান্বয়ে সাত বৎসর চলিয়াছিল। ঐ সাত বৎসরের পর হিসাব করিয়া দেখা হইল মহসীনের সম্পত্তির মুনফার টাকা হইতে সমস্ত খরচ পত্র বাদ প্রায় সাত লক্ষ টাকা জমিয়াছে। বোর্ড ঐ টাকা হইতে একটী মাদ্রাসা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করেন। এই বিষয়ের তর্ক বিতর্ক হইতে প্রায় তিন বৎসর অতীত হয় এবং সমস্ত টাকার সুদে আসলে আট লক্ষ কয়েক সহস্র টাকা জমে। অনেক বিবেচনার পর গবর্ণমেণ্ট হইতে একটী কলেজ স্থাপনের অনুমতি হয় তদনুসারে ১৮৩৬ অব্দের ১ লা আগষ্ট হুগলি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। ৬৫,৯৬৪ টাকা এই কলেজের ব্যয় জন্য দান স্থির হয়। তদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট উক্ত মহম্মদ মহসীনের দানের টাকা হইতে একটী অতিথিশালা ও একটী চিকিৎসালয়ও স্থাপিত করিয়াছেন। এই সমস্ত টাকা মাতয়ালিদিগের ও ভাজিয়ার ব্যয়ের টাকা হইতে সংগৃহীত। গবর্ণমেণ্ট মহসীনের টাকায় আর একটী মহৎ কার্য্য সংসাধিত করিয়াছেন, অর্থাৎ কলেজে মুসলমান ছাত্র-

দিগের বেতন এক টাকার বেশী লওয়া হইবে না। তদ্ভিন্ন প্রায় এক শত আন্দাজ ছাত্রকে আহার দেওয়া ও উৎকৃষ্ট ছাত্রদিগকে বৃত্তি দেওয়াও হইবে, এই সমস্ত কারণেই এখানে মুসলমান ছাত্র বেশী দেখিতেছ।

ব্রহ্মা। সাধু সাধু! যতকাল হুগলি কলেজ থাকিবে মহম্মদ মহসীনের নাম কেহ বিস্মৃত হইবে না। বরুণ! আমার বাঙ্গালীদিগের মধ্যে যদি কেহ নিঃসন্তান থাকেন, এইরূপ অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপনা করিতে যত্ন করেন না কেন?

বরুণ। তাঁহারা বলেন—সৎকর্ম্ম করা অপেক্ষা পিতৃপুরুষগণের নাম রক্ষার্থ পোষ্য পুত্র গ্রহণ করা উচিত, এবং এই জন্য অনেকে মৃত্যুকালে একটা একটার অভাবে তিনটা ও কখন কখন সাতটা পোষ্য পুত্র লইবার অনুমতি করিয়া যান।

ইন্দ্র। সে ছেলেরা করে কি?

বরুণ। তাহারা বয়স হইলেই মদ, গাঁজা ও বেশ্যার বিষয় উড়ায়। মাতা গর্ভধারিণী নহেন, তবে তাঁহার স্বামীর বিষয় এই জন্য ২।৪ টাকা মাসহারা দিয়া চাকরাণীর মত খাটাইয়া লন। ভগ্নীরাও কিছু সহোদরা নহে; সুতরাং তাহাদের বাপের বাড়ী থাকা ঘুচে যায়। মা কাঁদেন আর বলেন—"ওরে ঝকমারি করে কেন পোষ্যপুত্র লয়েছিলাম রে বাবা!"

ব্রহ্মা। বরুণ! মহম্মদ মহসীন কে এবং কি উপায়েই বা তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হন, তদ্বিষয় আমাকে বল।

বরুণ। আগা মতাহার নামক একজন ধনী মুসলমান এই হুগলি নগরে বাস করিতেন। তাঁহার পরিবারের সহিত তাদৃশ সদ্ভাব না থাকায় মৃত্যুকালে সমস্ত বিষয় একমাত্র কন্যা মন্নুজান খানমকে অর্পণ করিয়া যান। স্বামীর এইরূপ আচরণে মতাহার-পত্নী অসন্তুষ্টা হইয়া হুগলি নিবাসী হাজি ফয়জুল্লা নামক এক ব্যক্তিকে বিবাহ করেন। এই দম্পতী হইতেই ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ মহসীনের জন্ম হয়। মন্নুজান খানম মির্জা সালা উদ্দীন মহম্মদ নামক এক ব্যক্তির পাণিগ্রহণ করেন। হুগলি নগরে মির্জা-সালের হাট নামক হাটটী ইহাঁরই স্থাপিত। মন্নুজান খানম কিছুদিন পরে বিধবা হইলে আর দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলেন না। ইহাঁর সন্তান সন্ততিও ছিল না; সুতরাং সমস্ত বিষয় বৈপিতৃক ভ্রাতা মহম্মদ মহসীনকে দান করিলেন। মহম্মদ মহসীন বিবাহ-প্রথার নিতান্ত বিরোধী ছিলেন। তিনি জীবিতকালে

ফকিরী অবস্থায় বাস করিয়া যাবতীয় অর্থ দান ধ্যানে ব্যয় করিতেন এবং মৃত্যুকালেও ঐ উদ্দেশে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। ১৮১২ অব্দের নবেম্বর মাসে ইনি কলেবর পরিত্যাগ করেন।

নারা। বরুণ! কলেজের ওদিকের গাছে একটী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট একজন সাহেব দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছেন। ঐ পণ্ডিতটী কে?

বরুণ। উহাঁর নাম রামগতি ন্যায়রত্ন। উনি এই কলেজের সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক।

ব্রহ্মা। বরুণ, ইহাঁর বিষয় আমাকে সংক্ষেপে বল।

বরুণ। ইনি ১৭৫৩ শকে পাণ্ডুয়ার সন্নিকটস্থ ইলছোবা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৺ হলধর চূড়ামণি। প্রথমে উনি কোন অধ্যাপকের নিকট কিছু কাল ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়া সংস্কৃত কালেজে যাইয়া ভর্ত্তি হন এবং তথায় ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, স্মৃতি, সাংখ্য,ন্যায় ও যৎসামান্য ইংরাজি শিক্ষা করিয়া ১৮৫৪ অব্দে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন এবং মাসিক ৫০ টাকা বেতনে হুগলি নর্ম্মাল স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ইনি সংস্কৃত কলেজ হইতে ন্যায়রত্ন উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৬২ অব্দে ইনি একশত টাকা বেতনে বর্দ্ধমান গুরু-ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন এবং ১৮৬৫ অব্দে ১৫০ টাকা বেতনে বহরমপুর কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপকের পদে বদলি হইয়া যান এক্ষণে ইনি হুগলি কলেজের প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত আছেন। ইনি অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাস ইংরাজী হইতে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করেন। তদ্ভিন্ন ইহাঁর প্রণীত অনেক গুলি পুস্তক আছে। যথা—বস্তু-বিচার, বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথমভাগ, রোমবতী (উপন্যাস) শিশুপাঠ, এবং বাঙ্গালা ব্যাকরণ, ঋজু ব্যাখ্যা, দময়ন্তী, মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ, বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। এই শেষোক্ত গ্রন্থখানি ইহাঁর প্রধান কীর্ত্তি স্বরূপ। এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রচার করিয়াছেন।

দেবগণ কলেজ হইতে বহির্গত হইয়া এক দিকে চলিলেন। যাইতে যাইতে এক স্থানে উপস্থিত হইলে উপ কহিল "বরুণ কাকা, বরুণ কাকা, ওটা কি?"

বরুণ। দেবরাজ! সম্মুখে দেখ—ওলন্দাজদিগের গির্জ্জা। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে

গবর্ণমেণ্টের সমস্ত ব্যয়ে এই গির্জ্জাটী নির্ম্মিত হয়। ওলন্দাজদিগের কীর্ত্তির মধ্যে এই গির্জ্জাটী মাত্র অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

এখান হইতে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া বরুণ কহিলেন "এই স্থানে ওলন্দাজদিগের দুর্গের বারিক ছিল। ঐ বারিকটীর ১৮২৭ অব্দে ধ্বংস হইয়াছে। এই বারিকের উত্তর দিকে আরমেনিয়দিগের গির্জ্জা। ঐ গির্জ্জার সন্নিকটে ওলন্দাজদিগের গোরস্থান আছে।

এখান হইতে এক স্থানে যাইয়া তাঁহারা দেখেন লোকে লোকারণ্য। এক ব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়া "ভেউ ভেউ" শব্দে রোদন করিতেছে। পিতামহ তাঁহার ক্রন্দনে দুঃখিত হইয়া নিকটে যাইয়া কহিলেন "বাপু! তোমার কি হইয়াছে?" ব্রাহ্মণ কহিল "মহাশয়" আমি নিতান্ত দুঃখী ব্রাহ্মণ। দু-দশটী মন্ত্রশিষ্য থাকায় কোন প্রকারে কায় ক্লেশে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করি। আমার একটী ১২। ১৩ বৎসরের অবিবাহিতা কন্যা ছিল। মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম মেয়ে বেচে যথেষ্ট টাকা লাভ করিব। অতএব আর ২। ১ বৎসর রাখিয়া যদি বিবাহ দিই ৭। ৮ শত টাকা মূল্য পাইতে পারিব। ঐ লোভে মেয়েটীর বিবাহ দিতে বিলম্ব করিতেছি, এমন সময় আমার কাছে মন্ত্র লইব বলিয়া একটী শিষ্যের পুত্র আসিল এবং ১০। ১৫ টাকা দিয়া প্রণাম করিল। আমি তাহাকে নিজের পুত্রের ন্যায় যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম। এখন হয়েছে কি জানেন—বদমায়েস, পাষণ্ড, জুয়াচোর বেল্লিক বেটা গোপনে গোপনে আমার মেয়ের সঙ্গে সদ্ভাব করে,গত রাত্রিতে আমার মেয়েটীকে ভুলাইয়া লইয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছে। বলিয়া ব্রাহ্মণ গালে মুখে চড়াইতে লাগিল।

পিতামহ এই কথা শুনিয়া অবাক্। মুখে আর বাক্য নাই, এক দিকে দ্রুতপদে চলিলেন। দেবগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া কহিলেন "ঠাকুর দা কোথায় যান?"

ব্রহ্মা। ভাই! যে স্থানে পিতা পয়সার লোভে কন্যা বিক্রয় করে এবং যেখানে শিষ্য গুরুকন্যা হরণ করে, সে স্থানে এক তিলার্দ্ধ থাকা মহাপাপ। আমি এই মুহূর্ত্তে চুঁচুড়া পরিত্যাগ করিলাম।

দেবগণ পিতামহের কথায় অগত্যা ষ্টেষণ অভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে বরুণ কহিলেন "১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বাউটন নামক একজন ইংরাজ ডাক্তার নবাব সুলতান সুজার অন্তঃপুরস্থ কোন কামিনীর পীড়া আরোগ্য

করিলে সুজা ইংরাজদিগকে হুগলি নগরে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার আজ্ঞা দেন। তদনুসারে ১৬৪০ অব্দে ইংরাজেরা এখানে একটী কুঠি নির্ম্মাণ করেন। কলিকাতা সংস্থাপক জব চার্ণক সাহেব ঐ কুঠির গবর্ণর ছিলেন। ১৬৮৬ অব্দে ইংরাজদিগের সহিত নবাব-সৈন্যের বিবাদ হওয়ায় ইংরাজেরা হুগলি নগর তোপে উড়াইয়া দিয়া প্রস্থান করেন। ১৭৪২ অব্দে পর্ত্তুগীজেরা এই নগর ধ্বংস করে। ১৭৫৭ অব্দে পুনরায় ইংরাজদিগের দ্বারা হুগলি বাঙ্গালার মধ্যে একটী প্রধান বাণিজ্যের স্থান হয়। ১৭৫৮ অব্দে ইংরাজেরা পুনরায় ইহাতে গোলা বর্ষণ করেন। এখানকার মিসি বড় বিখ্যাত। হুগলির লোকের চরিত্র সাধারণতঃ মন্দ নহে। এখানকার ঘুঁটে-বাজারে অনেক সুবর্ণবণিক বাস করে। সোণারবেণের মেয়েদের চরিত্র—ঐ যা টিকিট দিবার ঘণ্টা দিয়াছে। ঠাকুর দা চলে আসুন।

দেবগণ তাড়াতাড়ি ষ্টেষণে যাইয়া চন্দননগরের টিকিট লইয়া প্লাটফরমে যাইয়া দেখেন দূরে হস্তির শুড়ের ন্যায় ধূম দেখা দিতেছে। দেখিতে না দেখিতে ট্রেণ নক্ষত্র বেগে ছুটিয়া আসিয়া ষ্টেষণে উপস্থিত হইল। দেবতারা দ্রুত গিয়া ট্রেণে উঠিলেন। ট্রেণ যাত্রীদিগকে উঠাইয়া লইয়া আবার দৌড়াইতে আরম্ভ করিল এবং অনতিবিলম্বে চন্দননগর ষ্টেষণে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবগণ গেটে টিকিট দিয়া বাহিরে আসিলে ব্রহ্মা কহিলেন "কি মজার কলই করেছে! এই কোথায় ছিলাম আবার ১০। ৫ মিনিটের মধ্যে কোথায় এলাম !!

চন্দননগর।

দেবগণ এক খানি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিয়া নগরাভিমুখে চলিলেন। তাঁহারা নগরের শোভা সন্দর্শনে এত মুগ্ধ হইলেন যে, গাড়োয়ানদিগকে কোন স্থানে থামাইতে বলিতে ভুলিয়া যাইলেন। গাড়োয়ানও বিনা বাক্য ব্যয়ে একেবারে তালডাঙ্গার ফটকের নিকট হাজির করিয়া কহিল "বাবু নামিয়া ভাড়া দিন।"

ব্রহ্মা। বরুণ! এ কোন স্থানে আনিয়া নামিয়ে দিলে?

বরুণ। এই স্থানের নাম তালডাঙ্গার ফটক। এই তালডাঙ্গার ফটক হইতেই ফরাসী রাজ্য আরম্ভ হইয়াছে। এ নগরে ফরাসী গবর্ণমেণ্টেরই আধিপত্য বেশী। ইহা ফরাসী রাজ্য বলিয়া নগরটীর অপর নাম ফরাসডাঙ্গা। ফরাসডাঙ্গা কলিকাতা হইতে ২১ মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থানের চতুর্দ্দিকে

ইংরাজ রাজ্য, মধ্যস্থলে গঙ্গার পশ্চিম কূলে বিন্দুমাত্র চন্দননগর বিরাজ করিতেছে। ১৬৭৩ খৃঃ অব্দে ফরাসিরা এই নগর নির্ম্মাণ করে। এই নগরের একাংশ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত। ফরাসী চন্দননগরে প্রায় এক লক্ষ ২৫ হাজার লোকের বাস।

কিছু দূরে যাইয়া উপ চীৎকার করিয়া কহিল "বরুণ কাকা ও কি! কতকগুলো লোক কাঠের মধ্যে পা ঢুকিয়ে দিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে কেন?"

বরুণ। চুপ কর! চুপ কর! গোল কর্‌লে তুরম ঠোকাবে।

নারা। বরুণ! তুরুম ঠোকাবে কি?

বরুণ। একখণ্ড কাষ্ঠের ফুটার মধ্যে পা প্রবেশ করাইয়া দিয়া আর এক খণ্ড ফুটা কাষ্ঠ তদুপরি রাখিয়া খিল আঁটিয়া চিৎ করিয়া ফেলিয়া রাখার নাম তরুম। যে গৃহে ঐ কাণ্ড হইতেছে উহার নাম কোতোয়ালি। ইংরাজ রাজ্যে কোন ব্যক্তি দোষ করিলে হাজতে দেয়। ফরাসী রাজ্যে কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নামে নালিশ করিলে অগ্রেই তুরুম ঠোকায়। তৎপরে বিচারে দোষী হইলে সাজা ও নির্দ্দোষ হইলে মুক্তিলাভ করে; ফলতঃ অভিযোগ হইলেই অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষীই হউক আর নির্দ্দোষই হউক অগ্রে তুরুম ঠুকিতে হয়।

এখান হইতে কিছু দূর যাইয়া দেবগণ দেখেন একখানি ভাঙ্গা ঘরের মধ্যে ১০। ১৫ জন লোক বসিয়া আছে। তাহাদের অষ্ট অঙ্গের শিরাগুলি দেখা যাইতেছে, প্রত্যেকের চক্ষু যেন ঠিকরাইয়া পড়িবার উদ্যোগ করিতেছে। সকলেরই সম্মুখে এক একটী কলসীর কানার উপর এক একটী ডাবা হুঁকা। হুঁকাগুলির নলচের মাথার দিক অর্দ্ধেক আন্দাজ কাটা। তদুপরি এক একটী ভাঙ্গা কল্কের বাঁট। হুঁকায় এক একটী এক হাত দেড় হাত আন্দাজ নল লাগান। প্রত্যেকে ধূমপান করিতেছে, এক একবার শোলা চুলিতেছে। কখন কখন পরস্পরে সোহাগ করিয়া নলের মধ্য দিয়া উজান ফুৎকার দিয়া পরস্পরকে গুলি মারিতেছে এবং সকলে নানারূপ গল্প করিতেছে।

একজন কহিল একটা ঢোড়া সাপ বড় আফিং খেত। কিন্তু আফিং খাইলেই দুগ্ধের প্রয়োজন। তজ্জন্য সে প্রত্যহ রজনীতে এক গো-শালায় প্রবেশ করিয়া গাবিন গোরুর পশ্চাৎ ভাগের পদ দুই খানি নিজ ল্যাজের

ধারা ছাঁদিয়া স্তন্যপান করিত। কিছু দিন পরে গোরুটা মরিয়া যাইল। তখন দুগ্ধ অভাবে সাপটা পেট ফেঁপে মারা যায় আর কি। সে গর্ত্ত হইতে মুখ বাহির করিয়া চোঁয়া ঢেকুর তুলিতেছে এমন সময় দেখে এক গোয়ালিনী তাহার গর্ত্তের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। গোয়ালিনী তখন অন্তঃসত্বা এজন্য স্তনে বেশ দুগ্ধ ছিল। সাপটা গোয়ালিনীকে দেখিয়া আস্তে আস্তে গর্ত্তের বাহির হইয়া সাঁৎ করিয়া ল্যাজ দিয়া তাহার পা ছাঁদিয়া ফেলিল; এবং স্তনে মুখ দিয়া চপ্ চপ্ শব্দে দুদ খাইতে লাগিল। গোয়ালিনী আউ মাউ খাউ শব্দে মূর্চ্ছা গেল।

আর একজন কহিল " গুয়োটার সাপ এর চেয়ে গুলি খেতে শিখ্লে না কেন ? " ওরে, সেদিন এইখান দিয়া একটা রাজা গিইছিল দেখেছিলি ? তার নাম সিং। তৎশ্রবণে একজন কহিল " ভাই সিং নাম হইল কেন ? " অপর কহিল " ঐ রাজার মাথায় বাল্যকালে দুইটী সিং বাহির হয়। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সেই সিং দুইটী কাটিয়া লইয়া এসিয়াটিক মিউজিয়মে রাখিয়া দিয়া উহার নাম দিয়াছেন সিং। „

ব্রহ্মা। বরুণ এ জন্তুরা কারা ?

বরুণ। গুলির আড্ডার গুলিখোর।

এই সময় গুলিখোরেরা গান ধরিলঃ—

> গুলি ছাড়ি কেমনে, বিনা মরণে।
> সেয়াকুলের কাঁটা যেন জড়িয়ে ধরেছে বসনে॥
> একবার মনে করি তোড় যোড় ফেলে দিয়ে,
> বসে থাকি বোবা হয়ে, (কিন্তু) তায় ভাবি স্বপনে॥

হায় ! হায় ! দেখ ভাই, সম্প্রতি চন্দন নগরের এক বেটা তাঁতি স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ করে নটে শাকের তলায় গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। একজন কহিল সত্যি নাকি ? অপর কহিল আমি কি মিথ্যা কথা কহিতেছি। মাগী, মিন্সের সঙ্গে বিবাদ করে যেমন জল আন্তে গিয়াছে, মিন্সে অগ্নি নলি থেকে এক থাই সূতা নিয়ে শাকের ক্ষেতের কাছে ছুটে গিয়ে নিজের গলার সঙ্গে আর নটে গাছের সঙ্গে বেঁধে চুপ করে বসে আছে। একজন কহিল " কেউ ছাড়িয়ে দিলে না ? "

বক্তা। তাঁতি-বৌ জল নিয়ে এসে দেখে সর্ব্বনাশ। স্বামী গলায় দড়ি দিয়া জিহ্বা বাহির করে বসে আছে। তখন মাগী তাড়াতাড়ি কাঁকের

কলসী কেলে মিন্সের পিঠে ক্যাৎ ক্যাৎ শব্দে লাথি মারিতে লাগিল। মিন্সে অনেকগুলো লাথি খেয়ে বল্লে "লাথিই মার, আর যাই মার, কর্ত্তা মরে গেছে।"

একজন কহিল, বেটা তাঁতি ফরাসী রাজ্য বলে বেঁচে গেলেন। ইংরাজ রাজ্য হলে বাছাকে গুরকি ভাঙ্গাতো। বাবা আত্মহত্যা কর্‌তে যাওয়া নয়।

ব্রহ্মা। বরুণ! তুমি বল্লে এই জানোয়ারেরা গুলির আড্ডার গুলি-খোর। কিন্তু আমি ত কিছু বুঝ্‌তে পারিলাম না।

বরুণ। আজ্ঞে, আপনার সৃষ্ট আফিং মর্ত্ত্যে দুই মূর্ত্তিতে ব্যবহার হয়। এক মূর্ত্তি কাঁচা অপর মূর্ত্তি পাকা। কাঁচার নাম আফিং, পাকার নাম গুলি। সেই গুলি যাহারা খায়, তাহাকে গুলিখোর কহে।

ইন্দ্র। গুলিখোর দিগের সরঞ্জাম ত বেস্।

বরুণ। ঐ সমস্ত সরঞ্জামের আবার ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। ঐ যে কলসীর কাণার উপর ডাবা হুকা আছে, ঐ হুকা এবং নলটার নাম তোড় যোড় এবং ঐ ভাঙ্গা কল্কের নাম মেরু।

এই সময় একজন গুলিখোরকে ছিটা অন্বেষণ করিতে দেখিয়া নারায়ণ কহিলেন "লোকটা কি অমূল্য দ্রব্য হারাইয়াছে।"

বরুণ। অমূল্য দ্রব্য চারি কড়া আন্দাজ মূল্যের একটী গুলি। গুলি-খোরেরা সর্ব্বস্ব দিতে পারে; কিন্তু প্রাণ ধরে একটী ছিটা কাহাকেও দিতে পারে না।

নারা। ছিটা তৈয়ের করে কেমন করে?

বরুণ। পেয়ারার পাতা কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া প্রথমে ভাজনা খোলায় ভাজিতে হয়। তৎপরে একটা পাত্রে জল দিয়া আফিং গুলিয়া সেই জল অগ্নির উত্তাপে ফুটিলে সেই সমস্ত ভাজা পেয়ারার পাতা ফেলিয়া দিয়া বেশ করিয়া নাড়িয়া মুড়কিমাখা করিতে হয়। তৎপরে নামাইয়া সেই গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে পাকাইলেই ছিটা প্রস্তুত হইল।

উপ। রাজা কাকা! রাজা কাকা! একটা গুলিখোর গুলি টেনে আধ খানা কলা মুখে দিয়ে কোৎ করে গিলে ফেল্লে!!

বরুণ। কলাই উহাদের উপাদেয় চাট। গুলির ধুম পেটে প্রবেশ করিলে নেশা হয়; কিন্তু কর্কশ দ্রব্য চিবাইতে হইলে ধুম বাহির হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। এজন্য গুলি টানিয়া কলা চটকাইয়া সেই কলা অতি সতর্কতার

সহিত মুখে দিয়া গিলিতে পারিলে কলা সহিত ধূম পেটের মধ্যে প্রবেশ করে। গুলিখোরেরা পাকা কলা এত ভাল বাসে যে, ষ্টেশনে যদি কোন যাত্রী কলা লইয়া আসে, ঐ সামান্য দ্রব্য চাহিলে পায়, কিন্তু চুরি করিবার চেষ্টা দেখে। চাটনীর অভাবে ইহারা সময়ে সময়ে শোলা জলে ভিজাইয়া চুসিয়া থাকে। গুলিখোরের অনেকগুলি চিহ্ন আছে। যথাঃ—প্রায়ই চক্ষু বুজিয়া থাকে, নেশা ছুটিবার আশঙ্কায় সহজে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখে না। গোল মালে বড় বিরক্ত হয়, কেহ কথা কহিলে "আস্তে আস্তে" বলিয়া নিষেধ করে। যখন ইহারা চলিয়া যায়, পায়ের গোড়ালি উচু হইয়া থাকে। যে রাস্তায় সচরাচর যাতায়াত করে, একটী ঢেলা থাকিতে দেয় না। পাছে হোঁচোট লাগিয়া নেশা ছুটিয়া যায়। যে গৃহে শয়ন করিয়া থাকে, ঐ গৃহের কোন স্থানে ছাতা কিম্বা ব্যাগ টাঙ্গাইয়া রাখিতে দেয় না, পাছে লাফায়ে এসে ঘাড়ে পড়ে। দুগ্ধে এত লোভ হয় যে, শিশু সন্তানের রাত্রিতে খাওয়াইবার দুগ্ধ ঢাকা থাকিলে চুরি করিয়া খাইয়া থাকে। গুলি টানিয়া যে রাস্তা দিয়া বাটী আইসে, ঐ রাস্তার দুই পার্শ্বে দড়া পাকাইবার ভঙ্গিতে যদি দুই জন দাঁড়াইয়া থাকা যায়, প্রাণান্তে সোজা হইয়া আসিবে না, পাছে দড়ি গলায় লাগিয়া মারা পড়ে; এই শঙ্কায় হেট হইয়া আইসে। ইহাদের নজর অতি ক্ষুদ্র হয়। গুলিখোরেরা মাতালকে বড় ভয় করে। মাতাল দেখিলে সে রাস্তায় প্রাণান্তেও অগ্রসর হয় না। এই চন্দননগরে গুলিখোরের সংখ্যা বড় বেশী।

এখান হইতে দেবগণ এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন, কতকগুলি লোক আপনার কাণ আপনি মলিতেছে। কেহ বা সাত বার উঠা বসা করিতেছে। কাহারও বা কাণ ধরিয়া ঘোড় দৌড় করান হইতেছে।

ইন্দ্র। বরুণ! এখানে কি হইতেছে?

বরুণ। পণ্ডিতের কাছে দোষীদিগের বিচার হইতেছে। ফরাসডাঙ্গার ফরাসীদিগের এক জন দুই শত টাকা বেতনের বিচারক আছেন, তাহাকে পণ্ডিত কহে। উঁহার নিকট সামান্য সামান্য দোষের বিচার হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত দোষের সাজা নিজের কাণ নিজে মলা, উঠা বসা করা এবং কাণ ধরিয়া ঘোড় দৌড় করান।

এখান হইতে তাঁহারা এক স্থানে উপস্থিত হইলেন, নারায়ণ কহিলেন বরুণ! সম্মুখে ঐ বাড়ীটী কি?

বরুণ। ফরাসীদিগের গবর্ণমেণ্টহাউস। এই গবর্ণমেণ্টহাউসের দ্বারে এক জন মাত্র পাহারা আছে। এখানকার গবর্ণর পণ্ডিচারীর গবর্ণরের অধীন। এখানকার গবর্ণর পাঁচ শত টাকা বেতন পাইয়া থাকেন। এখানকার মধ্যে যাঁহারা বড় সাহেব, তাঁহাদিগের প্রাসাদ দ্বারে কেরোসিন তৈলের আলো জ্বলে।

এই সময় দেবগণ দেখিলেন "জয় রাধাকৃষ্ণ" বলিয়া এক দল বৈষ্ণব রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইল। পিতামহ জহৃষ্টে কহিলেন "বরুণ! এ ত বৃন্দাবন নয়, এখানে এত রাধা কৃষ্ণের দল কেন?"

বরুণ। উহারা প্রকৃত বৈষ্ণব নহে। ইংরাজ রাজ্যের ফেরারি আসামীরা গুরুতর অপরাধ করিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে এখানে পলাইয়া আসিয়া বৈষ্ণব বেশে বাস করিয়া থাকে। পিতামহ ওদিকে দেখুন ফরাসী জেল।

সকলে জেলখানার নিকট উপস্থিত হইলে উপ চীৎকার করিয়া কহিল "কর্ত্তা জেঠা চেয়ে দেখ! মিন্সেগুলোর পেছন দিকে এক এক গাছি লম্বা লম্বা ছেকল ঝুলান। ছেকলগুলোর মাথায় আবার এক একটা গোল গোল লোহা লাগান। উহা উহারা অতি কষ্টে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

বরুণ। দেবরাজ! চেয়ে দেখ—দায়মালি কয়েদীরা ফরাসী জেলে কিরূপ দণ্ডভোগ করিতেছে। ঐ যে শৃঙ্খলাগ্র ভাগে লৌহের এক একটী গোলা দেখিতেছ, উহা যাহার যত বৎসর মেয়াদ থাকে, তাহাকে তদনুরূপ ভারি বহন করিতে দেওয়া হয়।

ব্রহ্মা। বরুণ! ওদিকে ও কি! একটী ক্ষুদ্র কাষ্ঠনির্ম্মিত কাটগড়ার মধ্যে এক জন দাঁড়াইয়া সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া চহিয়া আছে এবং উহার মস্তকের উপর এক গাছি দড়ি ঝুলিতেছে?

বরুণ। উহা হাফ ফাঁসীর স্থান। লোকের অর্দ্ধ প্রাণ দণ্ডের হুকুম হইলে এই স্থানে সাজা দেওয়া হয়।

ইন্দ্র। হাফ ফাঁসী কি?

বরুণ। অর্থাৎ সমস্ত দিন ঐ কাটগড়ার মধ্যে অতি সংকীর্ণ অবস্থায় দাঁড়াইয়া দোষীদিগকে সূর্য্যের দিকে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া থাকিতে হয়। সূর্য্য যখন যে দিকে ফিরিবেন দোষী ব্যক্তিকেও তখন সেই দিকে ফিরিতে হইবে। এইরূপে সূর্য্য অস্ত যাইলে সে ব্যক্তিকেও ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। এইরূপ দণ্ডকেই হাফ ফাঁসী বা অর্দ্ধ প্রাণ দণ্ড কহে। এই চন্দননগরে

অনেকগুলি থানা আছে। প্রত্যেক থানাই এক এক জন কোতোয়ালের অধীন। ঐ কোতোয়ালেরাই থানার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। এখানে নয়টা রাত্রির পর কাহাকেও রাস্তায় বাহির হইতে দেওয়া হয় না। বিবাহাদি উপলক্ষে কিম্বা কোন উৎসবাদি উপলক্ষে পাশ করিয়া লইতে হয়। বিনা পাশে রাস্তায় বাহির হইলে হুকুম ঠোকায়।

দেবগণ এখান হইতে যাইয়া একটা বাসা স্থির করিলেন এবং চারি জনে স্নান করিতে চলিলেন। উপ বাসায় থাকিয়া দ্রব্যাদি আগলাইতে লাগিল। তাঁহারা যাইতে যাইতে এক স্থানে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, পিতামহ! ফরাসীদিগের পুরাতন কেল্লার ধ্বংসাবশেষ দেখুন। এই কেল্লাটী নদীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

সকলে স্নান আহ্নিক সারিয়া বাসায় আসিয়া রন্ধনের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় এক গুলিখোর ব্রাহ্মণ আসিয়া কহিল "বাবা যদি চাট্টি খেতে দেও খাই।" পিতামহ স্বভাবতঃ অতিথি-সৎকার করিতে ভাল বাসেন; তিনি ব্রাহ্মণের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ কহিল "একটু তৈল দেন স্নান করিয়া আসি।" নারায়ণ তৎশ্রবণে তাহার সম্মুখে তেলের বাটী প্রদান করিলে ব্রাহ্মণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কহিল "হাতে দেও বাবা।" নারায়ণ তৎশ্রবণে হস্তে তৈল প্রদান করিলে ব্রাহ্মণ তৈল মাখিয়া স্নান করিতে যাইল।

নারা। বরুণ! ব্রাহ্মণকে তৈল মাখিতে দিলে হাতে দেও বাবা কহিল কেন?

বরুণ। চক্ষু খুলিয়া তৈল মাখিলে পাছে নেসা ছুটিয়া যায়, এই জন্যই হস্তে তৈল চাহিয়াছে।

আহারীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইল, কিন্তু ব্রাহ্মণ আর ফিরিল না। পিতামহ অতিথির জন্য অপেক্ষা করিয়া করিয়া শেষে দেবগণের উপরোধে তাহার জন্ন ব্যঞ্জনাদি রাখিয়া আহারে বসিলেন। আহার সমাপ্ত হইলে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর পুনরায় সকলে নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

এক স্থানে উপস্থিত হইয়া নারায়ণ কহিলেন, বরুণ! সম্মুখের এ সুন্দর বাড়ীটা কাহার?

বরুণ। কুরজং সাহেব নামক এক জন ইংরাজ জমীদারের। ইহাঁর বিলক্ষণ সঙ্গতি আছে।

এখান হইতে সকলে নদীর তীরে যাইলে বরুণ কহিলেন, পিতামহ! সম্মুখে ইটালি দেশীয় মিশনরিগণের চার্চ্চ দেখুন। চার্চ্চ দেখিয়া সকলে নদীর ঘাটের প্রতি চাহিয়া দেখেন, তাঁহাদের গুলিখোর অতিথি বসিয়া আছে।

ব্রহ্মা। বরুণ! চেয়ে দেখ চুপ করে বসে আছে, এপর্য্যন্ত জলে নামে নাই।

বরুণ। গুলিখোরেরা জলকে বাঘের ন্যায় ডরায়, উহাদের স্নান কি সহজে হয়?

এখান হইতে যাইয়া দেবগণ একটী কেল্লা দেখিলেন। কেল্লাটীতে সর্ব্বসমেত ৫০। ৬০ জন সিপাই আছে। কেল্লা দেখিয়া বাসায় আসিয়া দেখেন, তাঁহাদের গুলিখোর অতিথি বসিয়া আছে। তাঁহারা ব্রাহ্মণকে ভাত দিয়া বসিয়া গল্প করিতেছেন, এমন সময় ব্রাহ্মণ চীৎকার শব্দে কাঁদিয়া উঠিল। দেবগণ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে?"

ব্রাহ্মণ। এমন অতিথি সৎকার না করিলে নয়? আমার কত কষ্টের বাদসাহী পেট্টা বাবা কাঁচকলা খাইয়ে জন্মের মত খারাপ করে দিলে?

ব্রহ্মা। বরুণ! বলে কি?

বরুণ। মাছের ঝোলে কাঁচকলা ছিল, কাঁচকলা খাইলে গুলিখোরদের অত্যন্ত পেট খারাপ হয়। ব্রাহ্মণ ভ্রমবশতঃ কাঁচকলা খাইয়াছে, সেই জন্য কাঁদিতেছে।

ব্রহ্মা। উপ! ওর পাতে ঘি ঢেলে দে। বাবা খুব ঘি খাও, তোমার পেট সেরে যাবে। কাঁচকলায় যে পেট খারাপ করে, তা ত আমরা জানি নে, জান্‌লে মাছের ঝোলে কাঁচকলা দিতাম না।

ব্রাহ্মণ। হাজার ঘি খাই আমার এ বাদসাহী পেট শীঘ্র শোধরাইবে না।

বরুণ। গুলির পথ্যাপথ্য আমরা কি করে জানিব, এ বিষয়ের ত কোন পুস্তকাদি নাই।

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা আমি এক খান পুস্তক লিখ্‌বো। কি কষ্টেই বা লিখি, লিখ্‌তেও সাহস হয় না, যে সব সমালোচক মহাশয়েরা আছেন! বিশেষতঃ ২। ১ খান মাসিক পত্রকে আমার বড় ভয় করে, তাঁহারা পুস্তক হাতে পেলে এমনি সমালোচনা করিবেন, যেন আমাদের অপেক্ষা বেশী

গুলি টেনে দোষ গুণ বেশী জেনে নিয়েছেন। আমরা গুলি খাই বটে কিন্তু গুরু নিন্দা করি না, কিন্তু কর্ত্তাদের সে গুণটুকুও আছে।

সন্ধ্যা হইলে গুলিখোর চলিয়া যাইল। দেবতারাও সন্ধ্যা আহ্নিক সারিয়া একটু একটু জলযোগ করিলেন। তৎপরে সকলে শয়ন করিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। নারায়ণ কহিলেন, মর্ত্ত্যে আসিয়া আমি আছি ভাল। যত নূতন নূতন স্থানে যাইয়া লোকের আচার ব্যবহার দেখিতেছি, ততই আমার নূতন নূতন স্থান দর্শন করিতে ইচ্ছা হইতেছে। দেবরাজ কহিলেন, বলিতে কি আমিও এক প্রকার আছি ভাল। তবে জয়ন্ত ছেলে মানুষ বলিয়া রাজ-কার্য্য কিরূপ চলিতেছে না জানাতেই মনটা সময়ে সময়ে একটু চঞ্চল হয়। পিতামহ কহিলেন, আমার বাড়ীতে যদি একটী সাত বৎসরেরও ছেলে থাকিত, তোমরা আমাকে যত দিন মর্ত্ত্যে রাখিতে থাকিতাম। নানা কথায় দেবগণ রজনী অতিবাহিত করিলেন এবং প্রাতে উঠিয়া আবার নগর ভ্রমণে চলিলেন। বাসা হইতে কিছু দূরে যাইয়া দেখেন, এক স্থানে লোকে লোকা-রণ্য। এক ব্যক্তি চীৎকার শব্দে কহিতেছে "দোহাই ফরাসী গবর্ণমেণ্টের দোহাই ফরাসী গবর্ণমেণ্ট! প্রাণ যায় রক্ষা কর।" তাহার নিকটে এক যুবতী হেট মুখে দাঁড়াইয়া আছে। যে ব্যক্তি চীৎকার করিতেছে, তাহাকে পথের লোকে জুতা, ঝাটা যাহা সম্মুখে পাইতেছে তদ্দারা প্রহার করিতেছে। বিশেষতঃ এক বৃদ্ধ রাগভরে তাহাকে ঘন ঘন যষ্ঠির আঘাত করিতেছে। দেবরাজ ছুটিয়া গিয়া এক জনকে কহিলেন, মহাশয়! ব্যাপারখানা কি? সে ব্যক্তি কহিল হয়েছে কি জানেন—যে ব্যক্তিকে সকলে প্রহার করিতেছে উনি গুরু। যে বৃদ্ধ ঘন ঘন প্রহার করিতেছেন উনি শিষ্য। হেট মুখে দাঁড়াইয়া আছেন শিষ্যকন্যা। গুরু কয়েক দিবস হইল শিষ্য বাড়ী আসি-য়াছিলেন। ঐ কয়েক দিনের মধ্যে উনি শিষ্যের বিধবা কন্যাকে হাত করিয়া গত রজনীতে তাহাকে সঙ্গে লইয়া এখানে পলাইয়া আসিয়াছেন। মনে মনে বিশ্বাস আছে, ইংরাজ রাজ্যে পাপ করিয়া ফরাসী রাজ্যে আসিয়া নিষ্কৃতি পাইব।

ব্রহ্মা। যাঁ্যা! শ্রীবিষ্ণু! বরুণ, বল্লে কি? গুরু শিষ্যকন্যা, য়্যা!!

দেবগণ চহিয়া দেখেন পিতামহ নিকটে নাই। তিনি দ্রুতপদে এক দিকে ছুটিয়া যাইতেছেন। তখন দেবগণও অগত্যা পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া কহিলেন, ঠাকুর দা! কোথায় যান?

ব্রহ্মা। ভাই যে রাজ্যে গুরু, শিষ্য কন্যা হরণ করিয়া পলায়ে এসে নিষ্কৃতি পায়, সে রাজ্যে এক তিলার্দ্ধও থাকিতে নাই। থাকিলে মহাপাপ স্পর্শে; অতএব আমি এই মুহূর্ত্তেই চন্দন নগর পরিত্যাগ করিলাম।

তবে চলুন বলিয়া দেবগণও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তাঁহারা এক স্থানে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, দেবরাজ! ঐ যে স্ত্রীলোকটী মেছুড়েদিগের নিকট বসিয়া হাস্য পরিহাস করিতেছে, উহার অবস্থা শুনিবার উপযুক্ত। উহার পিতা একজন সম্ভ্রান্ত ও বিষয়ী লোক ছিলেন। তাঁহার পুত্র সন্তান না থাকায় মৃত্যু কালে সমস্ত বিষয় দুই বিধবা কন্যাকে সমান অংশে বিভাগ করিয়া দিয়া যান। উহাদের দুই ভগ্নীরই চরিত্র বড় মন্দ ছিল। তন্মধ্যে জেষ্ঠা গৃহে থাকিয়া উপপতি করে। ইনি বাটীর পুরাতন খানসামাকে লইয়া বাহির হইয়া যান এবং খানসামার বাটীতে তাহার স্ত্রীর সপত্নীর ন্যায় হইয়া বাস করিতে থাকেন। ক্রমে তথায় এক পুত্র দুই কন্যা প্রসব করা হয়। খানসামা কৌশলে ক্রমে ক্রমে বিষয়গুলি লইয়া এক্ষণে বাটী হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছে। আপাততঃ মেছুড়ে উপপতি করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে।

ব্রহ্মা। অরে ছি! ছি! শ্রীবিষ্ণু! বরুণ! তুই আমাকে কোথায় এনেছিস?

উপ। বরুণ কাকা! কি হইয়াছিল একবার বল না?

ষ্টেষণে যাইয়া সকলে দেখেন টিকিট দিবার বিলম্ব আছে। তখন পিতামহ কহিলেন বরুণ "নন্দননগরের অপরাপর বিষয় সংক্ষেপে বল?"

বরুণ। এই নগরটীতে অন্যূন এক লক্ষ চব্বিশ হাজার লোকের বাস। গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক আয় আড়াই লক্ষ টাকা। এই আয় ভূমি হইতেই আদায় হইয়া থাকে। এখানকার প্রজাদিগকে ভূমির কর ব্যতীত অপর কোন কর দিতে হয় না; কেবল কার্যক্ষম ব্যক্তিদিগকে মাসিক আট আনার হিসাবে কর দিতে হয়। ঐ কর দ্বারা বৎসর বৎসর ১৭।১৫ হাজার টাকা আদায় হইয়া থাকে এবং তাহাতেই মিউনিপালিটীর কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। এখানকার জমীর খাজনা অতি সামান্য, শত বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল, এক্ষণেও তাহাই আছে। জমীর মধ্যে অনেক জমী লাখেরাজ। এখানকার প্রজারা যেন রামরাজ্যে বাস করিতেছে। চন্দননগরে ফরাসীদিগের একজন গবর্ণর ভিন্ন একজন কালেক্টর ও একজন সব জজ আছেন। ইহাঁ-

দের বেতন অতি সামান্য। রাস্তাঘাটে ফরাসী ভাষায় লিখিত সাইনবোর্ড টাঙ্গান আছে। আদালতেও ফরাসীভাষা প্রচলিত। রজনীতে এখানকার রাস্তা কেরোসিন তৈলের লণ্ঠনের দ্বারা আলোকিত করা হয়। এ নগরে মুসলমান প্রায় নাই। অধিবাসিরা সাধারণতঃ অলস ও আমোদপ্রিয়। গুলির আড্ডা বিস্তর আছে। এখানে শিক্ষিত ভদ্র লোকের সংখ্যাও বিস্তর। ১৭৪০ অব্দে এখানে প্রায় চারি হাজার ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ছিল। সেই সময় কলিকাতায় কুটীর মাত্র দেখা যাইত। ফরাসী গবর্ণর ডিউপ্লে ইহার যাহা কিছু উন্নতি করিয়াছিলেন। তাঁহার পর আর কোন উন্নতি লক্ষিত হয় না। ঐ ডিউপ্লের এমন উচ্চ অভিলাষ ছিল যে,তিনি ভারতে নেপোলিয়নের ন্যায় কীর্ত্তি সংস্থাপন করিবেন ভাবিয়াছিলেন। এক্ষণে ইহাতে যাহা কিছু আছে, পূর্ব্বের সহিত তুলনা করিলে নাই বলিলেই হয়। ১৭০৪ অব্দে ইংরাজেরা এই নগর অধিকার করিয়া পুনরায় ফরাসীদিগকে প্রত্যর্পণ করেন এবং ১৭৫৭ অব্দে এডমিরেল ওয়াটসন সাহেব আর একবার এই নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন।

অদ্ভুত কাব্য-জগৎ।

As the inagination bodies forth.
The forms of things unknown, the Poets pen
Jurns them to shapes, and gives to airy nothing
A local habitation and a name.

মনুষ্যাবস্থার ক্রমোন্নতি কেমন অপরিদৃশ্যভাবে মৃদু মন্দ পদ সঞ্চরণ করিতেছে, সভ্যতার উন্মেষের আনুপূর্ব্বিক সামাজিক দশাপরিবর্ত্তন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ,তাহার প্রকৃত সন্ধান জ্ঞাত হইবে। কিন্তু দশাপরিবর্ত্তের প্রত্যেক সূক্ষ্ম প্রক্রম কার্য্যকালে কাহারও বোধগম্য হয় না। আমরা জানি ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিলেই বালিকার যৌবনকান্তি উজ্জৃম্ভিত হয়; ফলতঃ সে লাবণ্য বিকাশ প্রাপ্ত না হইলে তাহার প্রতিপদের স্ফুট উপক্রম কে দেখাইয়া দিতে পারে? মৃত্তিকায় বীজ বপন কর, উক্ত বীজ কখন অঙ্কুরিত হয়, দেখিতে পাও কি? উপচীয়মান বৃক্ষ কখন নবরঞ্জিত পল্লবদলে পরিশোভিত হয়, জানিতে পার কি? সতর্কনয়নে একাদিক্রমে দেখিতে থাক, চক্ষুর পলক ফেলিও না, বর্দ্ধিষ্যমাণ অঙ্কুরের সূক্ষ্ম বৃদ্ধি তোমার দৃষ্টি-

গোচর হইবে না। বাহ্য শ্রীবৃদ্ধি বল, মানসিক উৎকর্ষ বল, আমরা মনুষ্যের অবস্থা পরিবর্ত্তনও ঠিক তদ্রূপ দেখিতে পাই। কোন ধনাঢ্য জাতির ধনবলে যদি নির্ধন জাতি ঐশ্বর্য্যশালী হয়, কোন শিক্ষিত সভ্য জাতির উপদেশ-বলে যদি নিরক্ষর অসভ্য জাতি শিক্ষিত ও সভ্য হয়, সে স্থলে অবস্থান্তর-সংক্রমণ নির্দ্দেশ করা দুঃসাধ্য নহে। কিন্তু যেখানে স্বতঃ সিদ্ধ নিয়মের বশানুবর্ত্তী হইয়া সমাজের অবস্থা উন্নীত হয়, সে স্থলে উৎকর্ষের প্রক্রম অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় না। মনুষ্যের আদিম অবস্থা শ্রীসৌষ্ঠব-বিহীন একটী শুষ্ক বীজের মত; পরন্তু মানুষ যেখানে থাকুক, বীজোদ্ভিন্ন অঙ্কুরের ন্যায় অন্যান্য প্রাণিজগৎকে ভেদ করিয়া মস্তকোত্তোলন করিতেছে। এই ত সংসার চলিয়া আসিতেছে, মনুষ্যও ত পশুনির্ব্বিশেষে কালযাপন করিয়াছে,—কত স্থানে এখনও করিতেছে; কই—তাহার অপ্রতিহত উন্নতি-বেগ কে কোথায় রোধ করিতে পারিয়াছে? এই ত দুর্দ্দান্ত সিংহ ব্যাঘ্র ছিল,—এখনও আছে; এই ত মদমত্ত কুঞ্জর ছিল, এখনও আছে; কই—মানুষের উন্নতিপথের ত কেহই রোধ করিতে পারে নাই? আদিম অবস্থায় মনুষ্যবুদ্ধি কোমল, তাহার তীক্ষ্ণতা ছিল না; তবু প্ররূঢ় অঙ্কুরের ন্যায় সকল বাধা অতিক্রম করিয়া মস্তক উন্নত করিয়াছে। পরিশেষে পল্লবিত হইল, কুসুমিত হইল, ফলভরে অবনত হইল,—কিন্তু কে সেই উৎকর্ষের সূক্ষ্ম প্রক্রম বুঝিতে পারিল?

আছে,—আমাদিগের কিছু কিছু বৈশেষিক জ্ঞান আছে; সমগ্র বিষয়কে বিভক্ত করিলে আমাদের খণ্ডবুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। মনুষ্যের অবয়বজ্ঞান আমাদের সামান্য বুদ্ধির ফল; বিশেষ বুদ্ধিতে আমরা স্থূলকল্পে বালক, যুবা, প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধ এ পর্য্যন্ত চিনিতে পারি। কিন্তু সূক্ষ্ম প্রক্রম ধরিয়া বিচার কর কবে বালক বালকত্ব অতিক্রম করিয়া যৌবন পদবীতে পদার্পণ করে,—বলিয়া দাও দেখি? তাহার কিছু পরিস্ফুট নিদর্শন দেখাইতে পার?—কিছুতেই নয়, এ সূক্ষ্ম সিদ্ধান্তোন্নয়ন করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। কেবল কতকগুলি লক্ষণসমাহারের দ্বারা সামান্য জ্ঞানের উপর আমাদের বিশেষ জ্ঞান জন্মে; তদতিরিক্ত আর সূক্ষ্ম মীমাংসা করিবার ক্ষমতা নাই। অদ্যকার প্রস্তাবে মনুষ্যের বাহ্য বিষয়ের বিবরণ উল্লিখিত হইতেছে না; আমরা বিত্তবৃত্তির ফলভূত সাহিত্য জগতের কথা বলিতেছি। প্রতিভাশালী আর্য্যদিগের সাহিত্য ক্ষেত্রের প্রক্রম নিশ্চিত করা অনায়াসসাধ্য নহে; স্থূলকল্পে

তাহাতে কেবল কতকগুলি বিশেষ জ্ঞান উপলব্ধি হয়। ব্রাহ্মণদিগের সাহিত্যক্ষেত্রের দশাবর্ত্তন পর্য্যালোচনা করিলে দৃষ্ট হয় যে উহা,—সহজবুদ্ধি, কূটবুদ্ধি, ভক্তি এবং ব্যসন, প্রধানতঃ এই চারি পাদে বিভক্ত। সরলচিত্ত আদিম আর্য্যপুরুষেরা ভূমিষ্ঠ হইয়া নয়ন উন্মীলন করিলেন; প্রকৃতিজননী চতুর্দ্দিকে ক্রীড়নক হস্তে মধুর মধুর হাসিতেছেন,—প্রাণাধিক সন্তানদিগকে কাঁদিতে দিবেন না। দিনমণির প্রকাশে নূতন প্রভাত, সহসা দশ দিক্ আলোকিত হইয়া উঠিল। আবার কিয়ৎকাল পরেই তারকামালায় উপখচিত নীলপট্টপরিবৃত স্তিমিত শর্ব্বরী, দশ দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন। তখন যুগপৎ হর্ষভয়ে মনুষ্যহৃদয় কিরূপ বিচলিত হইয়াছিল, প্রকৃতি দেবি! তুমি ত ছিলে, বলিয়া দাও? কড়্ কড়্ বজ্রনিনাদ, চড়্ চড়্ শিলাবর্ষণ, তড়্ তড়্ বৃষ্টিপাত! আবার তখনি বিচিত্রবর্ণফলিত বাঁকা আকারের, গগনের এ দিক হইতে ও দিকে কে কি ঢালিয়া দিল! মানবহৃদয় বিস্ময়বিমুগ্ধ আতঙ্কে স্তম্ভিত।

স্বভাব নীরব। সেই চণ্ডবাত্যাবিক্ষুব্ধ তুমুল ব্যাপার কে বা দেখাইল?—কে বা লুকাইল? আর কিছুই নাই এখন আকাশ নির্ম্মল। অলক্ত-নিষ্ঠ্যূত লঘু মেঘের কোলে ও কে হাসিল?—আবার সেই দিনমণি! মানব-হৃদয় আহ্লাদে গলিয়া গেল।

সম্পদে কেহ কাহারও আশ্রয় লয় না; বিপত্তিকালেই ত্রাণকর্ত্তা চাই। আর্য্যেরা ভয়ে বিহ্বল, প্রথমে দৃশ্যমান বিশ্বব্যাপারকে ডাকিলেন। আবার শত্রুর উপদ্রব, অন্নজলের কষ্ট; সম্মুখে যাহা কিছু অদ্ভুত, যাহা কিছু প্রতাপান্বিত,—মুক্ত কণ্ঠে করুণস্বরে তাহাকেই ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহারা কখন সূর্য্যকে, কখন চন্দ্রকে, কখন বরুণকে, বিপদ উদ্ধারের নিমিত্ত আহ্বান করিতেছেন। এটা তাঁহাদের সরল হৃদয়ের অকৃত্রিম স্বাভাবিক বুদ্ধির কথা, এই খানেই কাব্যের সূত্রপাত। বৈদিক ঋষিদিগের কি কি কাব্য ছিল, এখন তাহা নিশ্চিত করিবার কোন উপায় নাই।

ঋজুমতি শিশুরা যদৃচ্ছা ক্রীড়াপরতন্ত্র হইয়া থাকে। তাহাতে উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রত্যাশা থাকুক বা না থাকুক, ইষ্টলাভের আশঙ্কা করে। তাহারা সরলপ্রকৃতি; তাহাদের অল্পেই সুখ, অল্পেই দুঃখ; অল্পেই হৃদয় বিস্ময়ে উৎফুল্ল হয়। কিন্তু জ্ঞানের উন্মেষ হইলে অলীক আমোদে আর তৃপ্তি জন্মে না; তখন স্বতই মনের অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে। সূর্য্যের

অনেক স্তবস্তুতি করিলে, সূর্য্যকে আহ্বান করিলে, নিকটে আসিবার নিমিত্ত অনেক সাধিলে। যাবৎ জ্ঞানের উদ্রেক না হয়, সূর্য্য নিকটে আসুন আর নাই আসুন, কেবল স্তবপাঠেই মনস্তুষ্টি সাধিত হয়। কিন্তু বুদ্ধি উদ্রিক্ত হইলে মনুষ্য তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া উঠে; তখন নানাপ্রকার সন্দিগ্ধ প্রশ্ন হৃদয়ে উদিত হয়। সূর্য্য কে? তাহাকে স্তবস্তুতি করিলে কি হইবে? তুমি ডাকিলে কই,—তিনি ত তোমার আশা পূর্ণ করিলেন না? এই সমস্ত কূট তর্ক স্বভাবতই উত্থিত হয়। কিন্তু তৎসমুদায় দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের সিদ্ধান্ত কে করে?—মীমাংসা। সুতরাং বেদান্ত ন্যায়াদি দর্শন শাস্ত্রের সৃষ্টি হইল। কণ্, প্রস্কন্ন, সিন্ধুদ্বীপ প্রভৃতি ঋষিগণ গ্রহাদির উপাসনা করিয়া গিয়াছেন। দার্শনিকদিগের চক্ষু প্রস্ফুটিত হইল; আর তাঁহাদের চিত্ত বাহ্য জগতে বদ্ধ থাকিতে পারিল না। সুতরাং বেদত্রয়সঙ্কলনের অব্যবহিত পরেই মহর্ষি বেদব্যাসের হস্তে কাব্য পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইল; বেদান্তসূত্রেরও অঙ্কুর উদ্গত হইয়া পড়িল। বেদান্ত সূত্র অতিশয় জটিল এবং দুর্ব্বোধ, তাহাতে অনায়াসে কাহারও দন্তস্ফুট হয় না। সে কারণ বোধ হয়, বেদত্রয়ের অব্যবহিত পরেই বেদান্তসূত্র সঙ্কলিত হইয়াছে। মহর্ষি দ্বৈপায়ন কবিতার অঙ্গে প্রথমে তুলিকা সংযোগ করিয়াছিলেন; কিন্তু অলীক আমোদে তাঁহার তৃপ্তি জন্মিল না,—তিনি তার্কিক হইয়া পড়িলেন। দুর্ভেদ্য বেদান্তসূত্র সঙ্কলনেই তাঁহার অধিক আসক্তি জন্মিল। পরিশেষে সেই কুটিল শাস্ত্রের লতাপ্রতানে দার্শনিক ঋষিগণ জড়িত হইয়া পড়েন। অক্ষপাদ, গোতম, জৈমিনি, কণাদ প্রভৃতি দার্শনিকেরা তর্ক-শাস্ত্রের সৃষ্টি করেন। তাঁহাদের অনিকৃষ্ট মেধাক্ষেত্রের ফল আজ সভ্য সমাজ পরম উপাদেয় বলিয়া আদর করিতেছেন।

ঋষিগণ কূটার্থ তর্কের অনুশীলন করিতে করিতে ক্রমে দুর্ব্বোধ মীমাংসায় গিয়া অবতীর্ণ হইলেন; অনেকে নাস্তিক হইয়া পড়িলেন। অনেকে আবার “অচিন্ত্য অব্যক্ত” এই বাক্যের ভাবগ্রহে সমর্থ হইলেন না। সুতরাং ভক্তিকে সাধনের প্রধান পথ বলিয়া মানিলেন; তখন এক একখানি পুরাণের সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। ঋষিদিগের ভাবস্রোতঃ প্রাবৃট্ কালের নদীর ন্যায় মনকে প্লাবিত করিয়া তুলিল।

হৃদয়ে ভক্তি প্রবেশ করিলে চিত্তচাঞ্চল্য উৎসারিত হয়; অতএব ঋষিগণ কিছু কিছু নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন। নিশ্চিন্ততা আলস্যের প্রসূতি।

মনুষ্য আবার অলস হইলেই ব্যসনাসক্ত হয়। সুতরাং ব্যসনের ফল স্বরূপ কাব্যাদি প্রণয়নে স্পৃহা জন্মে। ঋষিগণ সাত্বিক সংসারের লোক, অসৎ কাব্যের অনুশীলন না করিয়া ভক্তিরসপরিপূরিত সৎ কাব্যই রচনা করিতে লাগিলেন। সমাজতত্ত্ববিৎ সুধীগণ স্থির করিয়াছেন, গ্রাসাচ্ছাদনের ক্লেশ না থাকিলেই মানুষ অলস হয়, অলস হইলেই কায়নিক আমোদ সংগীত কাব্যরচনা এবং সূক্ষ্ম-দর্শন-তত্ত্বোদ্ভেদে প্রবৃত্তি জন্মে (১)। বাস্তবিক এ নির্দ্দেশ যুক্তিযুক্ত, সন্দেহ নাই। ভারতভূমি বহুদকা এবং প্রচুরশস্য-শালিনী। সুব্যবস্থা থাকিলে এখানে কাহারও অন্ন বস্ত্রের কষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। তজ্জন্যই ভারতবাসীরা অপরিসীম প্রতিভাশালী এবং চিন্তাশীল; তজ্জন্যই এখানে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট দর্শন শাস্ত্র এবং কাব্যাদির সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে পিশাচ দৈত্য রাক্ষস প্রভৃতি অনার্য্য জাতির ঘোরতর উৎপাত ছিল; ক্রমে তাহারা উৎসাদিত হইল; তপোবন বিঘ্নশূন্য হইয়া আসিল; ঋষিগণ নিরুদ্বেগে নীবার ফল মূল উপভোগ করিতে লাগিলেন। রামায়ণের সুশ্রাব্য সুললিত তানে ভারতবাসীর হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। আদি কবির চিত্রে অকৃত্রিম তুলিকার দ্বারা বর্ণ ফলান; তাহাতে প্রকৃতিছবি যেন নাচিয়া নাচিয়া আপনার অবিকল প্রতিবিম্ব দেখাইতেছেন; অন্তর্নিহিত ভাবছটা যেন ফাটিয়া পড়িতেছে; কিন্তু ছবিটী প্রখর নয়, উজ্জ্বল নয়; তাহাতে নানা ধরণের বর্ণবিন্যাস নাই। ব্যাসের ছবি হৃদগত ভাবের অনুকৃতি, তাহাতে যেন জীবন উপন্যস্ত রহিয়াছে; তোমাকে যেন কি বলিতে যাইতেছে। বাল্মীকির চিত্র উজ্জ্বল, ভাদ্রপদের প্রদীপ্তরৌদ্র দিবাকরের ন্যায়,—চক্ষু পাতিবার যো নাই। কিন্তু অনেক স্থলে নীরব নিশ্চল; তুমি কথা কও,—সে কহিবে না। ব্যাস যদি কাব্য জগতের উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান হইতেন, তবে আজ মহাভারত কাব্যাংশে রামায়ণকে পরাজয় করিত। আদি কবিরা প্রকৃতি দেবীর বরপুত্র; তাঁহাদের চিত্রই অকৃত্রিম ও উৎকৃষ্ট।

সাংসারিক সকল ব্যাপারই ক্রমোন্নতি নিয়মের বশানুবর্ত্তী। উত্তরোত্তর সকল কার্য্যেরই উৎকর্ষ সাধন হইতেছে। প্রথম উদ্যমে যে কাজ সম্পাদিত হয়, তাহা কখন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না; তাহার অনেক অঙ্গহীনতা, অনেক দোষ থাকিয়া যায়। উত্তরকালে আবার কেহ সেই কার্য্যে হস্তক্ষেপ

(1) Buckle's History of Civiliyation.

করিলে, তাহার কোন অংশ পরিত্যক্ত কোন অংশ পরিবর্ত্তিত এবং কোন অংশ পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে। সুতরাং ক্রমে যাবতীয় দোষভাগ অপগত হয়, এবং অভিনব গুণভাগ উপযদ্ধ হইতে থাকে। অবশেষে একটী অনিন্দ্য অঙ্গহীন বিরস পরিপাটী রূপ ধারণ করে। আদর্শদৃষ্টে এই মহোপকার সাধিত হয়। কিন্তু কাব্যপ্রণয়ন, চিত্রকর্ম্ম এবং সংগীত, এ কয়েকটী স্বতন্ত্র বিদ্যা। (২) আদর্শ দৃষ্টে ইহাদের উন্নতি সাধন হয় না। গুরুপবিষ্ট অনুকৃতি দর্শনে বরং ভাবভঙ্গী সম্যক্‌ জড়তা জন্মে। চক্ষু টানিলে; কিন্তু নয়নের সতেজ জ্যোতি হয় ত পরিস্ফুট হইল না; মুখ আঁকিলে,হয় ত ওষ্ঠপুট কুঞ্চিত করিয়া গুটাইয়া উল্টাইয়া হাসিল না। দেহ আছে, কিন্তু জীবন নাই। কাব্যও একটী চিত্রপট,—সেটী হৃদয়গত ভাবের প্রতিবিম্ব। কবিতা বসন ভূষণ পরিয়া যত্নে সুন্দরী হইলে চলিবে না; তাঁহার অঙ্গে সকল স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের প্রভা চাই; কৃত্রিম বর্ণ দ্বারা তুলিকায় সে ভাবটুকু উঠে না। চিত্রকর বর্ণ ফলাইয়া অবিকল অনুকৃতি তুলেন, কবি মনশ্চক্ষুর প্রতিবিম্বিত ছায়া বাক্যে চিত্র করিয়া প্রকাশ করেন। আদর্শ দৃষ্টে কাব্যশাস্ত্রের কতক-গুলি কাল্পনিক ব্যবস্থা হইতে পারে, তদ্ভিন্ন আর কোন উপকার নাই। এক একটী বৃত্তের আদ্যোপান্ত হ্রস্ব দীর্ঘ ও বর্ণসংখ্যার সামঞ্জস্য; কোন স্থলে হ্রস্বপ্রাণ কোন স্থলে দীর্ঘপ্রাণ বর্ণ গ্রথিত হইবে তাহার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম, এই-রূপ কতকগুলি কল্পিত বিধিবিশেষ ব্যবস্থাপিত হইতে পারে। আদি কবি-দিগের বর্ণ নির্ব্বাচন ছিল না, ছন্দের ব্যবস্থা ছিল না; হৃদয়তন্ত্রী যেমন স্বরে বাজিত, তাঁহারা সেই তানে লয় দিয়া গাইতেন। আদি কবিরা ততটা পরাধীন ছিলেন না। অকৃত্রিম সুসাধ্য শব্দেই মনের ভাব স্পষ্ট ব্যক্ত হয়। আমি এমন কথা বলি না যে, আদি কবি বেদব্যাস এবং বাল্মীকি যদৃচ্ছাক্রমে মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের ছন্দোবন্ধের ব্যবস্থা নাই। তাঁহাদের কাব্য অনেক মার্জ্জিত হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু আমরা প্রকৃত আদি কবি কোথায় হারাইয়াছি। আমরা সংস্কৃতের বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস কবিকঙ্কণকে পাইতেছি না। একটী বৃত্ত দশটী অক্ষরে গ্রথিত হইতেছে,

(২) But it is not thus with music with painting and with sculpture still less is it thus with poitry the progress of refinemout rarely supplies these arts with better objects of imitartion.

Lord Macualay.

বারটী অক্ষরেও গ্রথিত হইতেছে; সংস্কৃতের যেমন আদি কবি বুঝি কালের সর্ব্বভুক গ্রাসে পতিত হইয়াছেন,—এখন তাঁহাদের নাম পর্য্যন্ত নাই।

এখন দেখুন, প্রকৃত কবি এবং কাব্যই বা কি? প্রকৃত কবি অনেকটা ঋজু প্রকৃতির লোক। তিনি মুগ্ধস্বভাবসম্পন্ন, বালোচিত চপল; তাঁহার চিত্তের গাম্ভীর্য্য নাই; যাহা দেখিতেছেন, সকলি যেন অলৌকিক অসামান্য; যাহা ভাবিতেছেন, সকলি যেন কৌতুকাকুলিত। মন নাচিল, নিজেও একবার নাচিলেন; মন ভাবের উৎসে দুলিয়া উঠিল, নিজেও দুলিতে লাগিলেন। কবির চক্ষে এ জগৎ নূতন, ইহার সকলি অদ্ভুত। তিনি পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সকলি ভুলিয়া যান; প্রভাতে সূর্য্যোদয় হয়, নিশিতে তারকামালায় আকাশের অঙ্গ বিভূষিত হয়, এই সকল চির প্রথিত বাক্য তিনি বিস্মৃত হইয়া থাকেন; তাঁহার পূর্ব্ব সংস্কার তিরোহিত হইয়া যায়। তিনি নূতন জগতে পদার্পণ করেন, তিনি নূতন সংসারের সংসারী তাঁহার চিত্ত কেবল অদ্ভুত জগতে বিচরণ করিতেছে। বিশ্বসংসার যেন ইন্দ্রজাল, মনশ্চক্ষুতে তাহার ছায়া প্রতিফলিত, যেন সম্মোহন মন্ত্রে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে। জগৎ যেন কি! দেখিলে কেবল ভাবের ঢেউ মনে ভাসিয়া উঠে। কবি তবে কেমন ব্যক্তি? তিনি বালক, বালোচিত চপলতাগুলিই তাঁহাতে বিদ্যমান আছে। শিশু ক্রন্দন করিতে লাগিল, কোলে লইয়া তাহাকে পাখী দেখাও, চাঁদ দেখাও,—তাহার মন ভুলিয়া যাইবে। শিশুর চক্ষে এ জগৎ নূতন, সে সকলি অদ্ভুত জ্ঞান করে। একটী বিষয় বারম্বার দেখিয়া তাহাতে অভ্যস্ত হয় নাই, সুতরাং সে যাহা দেখে তাহাতেই কৌতূহল জন্মে (৩)। আমরা দেখিতে পাই, ভাঙ্গড় বাতুল এবং বালকেরাই অধিক ভাবুক। তরঙ্গায়িত স্ফুরৎ ভাবোচ্ছ্বাস সর্ব্বদাই তাহাদের চিত্তে খেলা করিতেছে; সর্ব্বদাই তাহারা আমোদে ভোর। গুলিখোর বাতুল এবং বালকের রসাত্মক কৌতুককর বাক্যে কে না আমোদিত হইয়াছে? তাহাদের ভাবুকতার পরিচয় কাহার অবিদিত আছে? মেরু দেখিলে ভাবপ্রসঙ্গসঙ্গতি হেতু কালিদাসকে মনে পড়ে। সরস্বতী তাঁর রসনায় নাচিয়াছিলেন, আর নাচেন মেরুযন্ত্রে; সেটী বরদাত্রীর পদ্মাসন, সর্ব্বদাই তাহাতে ভাবের ঢেউ উঠিতেছে।

---

(3) Hence of all people children are the most imaginative.

Macaulay.

শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, মাদক দ্রব্য সেবনে মনুষ্যের চিত্তগাম্ভীর্য্য থাকে না এবং মস্তিষ্কের কৈশিকনাড়ীসূত্রে রক্তাধিক্য হয়, তজ্জন্যই সর্ব্বদা হৃদয়ে নানাবিধ অলীক অদ্ভুত ভাবের উদয় হইতে থাকে। ক্রমে তাহাতে মানুষকে বালকের মত করিয়া ফেলে, আর আত্মশাসন-ক্ষমতা থাকে না; বালোচিত অকিঞ্চিৎকর আমোদে রত হইতে প্রবৃত্তি জন্মে। অকিঞ্চিৎকর সুখে সুখী হইতে পারিলেই সকলি বিচিত্র বিভূতি সম্পন্ন দেখায়, সকল বিষয়েই একটু একটু নূতনত্ব প্রতীয়মান হয়। আমরা এ স্থলে ভাঙ্গড়, বাতুল এবং বালকের রসাত্মক বাক্যের কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। কয়েকজন গুলিখোর তাহাদের রঙ্গ চত্বরে বসিয়া আছে, মুদ্রিত নয়নে ধূমপান করিতেছে, ইত্যবসরে একজন "খিল খিল" করিয়া হাসিয়া উঠিল। সহচরেরা জিজ্ঞাসিল,—"ভাই! তুমি হাসিলে কেন?" ভাঙ্গীর বন্ধু বড় আদরের ধন। উত্তর না দিলে কি চলে? মনের ভাব ব্যক্ত করিতে হইল,—"ভাই! রাবণের সারি সারি দশটা মাথা তবে ত সে পাশ ফিরিয়া শুইতে পারে না?" পাঠক! দেখুন, ভাঙ্গীর মনে কেমন রসাত্মক ভাবের উদয় হইয়া থাকে। বাতুলের বাক্যও শুনিতে বড় মিষ্ট। কাশীনাথ ক্ষেপা নামে জনৈক প্রসিদ্ধ পাগল ছিল। সে কোন হঠাৎ বাবুর নিকট যাতায়াত করিত। হঠাৎ বাবুর ধনৈশ্বর্য্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু সৎকর্ম্মে ব্যয়ভূষণ ছিল না। তিনি বঙ্গদেশের একজন বিখ্যাত কৃপণ ব্যক্তি। এক দিন হঠাৎ বাবু সভায় বসিয়া আছেন, কাশীনাথ কতকগুলি খোলার কুচি লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। বাবু অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে স্থান দিলেন। কাশীনাথ বলিল,—"হাত পাতুন" বাবু হাত পাতিলেন। ক্ষেপা এক একটী করিয়া তাবৎ খোলার কুচি তাঁহার হস্তে দিল। পরে কাশীনাথ স্বয়ং হাত পাতিয়া বলিল,—"একটী একটী করিয়া আমার হস্তে দিউন।" বাবু দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাশীনাথ! এ আবার কি? কাশীনাথ দারুণ ক্ষিপ্ত ও স্পষ্টবাদী ছিল; সে কি উত্তর দেয়, আগ্রহান্বিত চিত্তে সকলেই তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কাশীনাথ বলিল,—"দুই তিন মাস এইরূপে খোলার কুচি দিয়ে লেনা দেনা করিতে হইবে। অকিঞ্চিৎকর দ্রব্যে অল্পে অল্পে আপনার হাত সরিলে তখন পয়সা কা লোককে দান করিতে পারিবেন।" পাঠক! দেখুন উন্মত্তের প্রলাপ বাক্যেও কতদূর গূঢ়ভাব নিহিত রহিয়াছে।

পরন্তু মনুষ্য জাতির মধ্যে শিশুরাই অধিক ভাবুক। বালকণ্ঠ ধ্বনি শুনিতে মিষ্ট বলিয়াই যে লোকে বলে—"অমৃতং বালভাষিতং"—তা নয়; তাহাদের বাক্যের রসাত্মকতাই অধিক শ্রুতিসুখকর। পূর্ণিমার রাত্রি, নির্ম্মল জ্যোৎস্নায় সকলি ধপ্ ধপ্ করিতেছে; বালক জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা! কোথাও ত অন্ধকার নেই, তবে চাঁদের কালতে আল হয় নি কেন?" কি স্বাভাবিক! অভাবনীয় গভীর ভাবুকতার পরিচয়! বালক দেখিল, উপর্য্যুপরি কয়েকবার চন্দ্রগ্রহণ হইয়া গেল; কিন্তু তত্তাবৎ কাল মধ্যে একবারও সূর্য্যগ্রহণ হইল না। গ্রহণের সময় চন্দ্রসূর্য্যকে চণ্ডাল গ্রাস করে এ কথা শুনিয়াছিল, বালক মনে মনে বিচার করিয়া পিতাকে বলিতেছে,—"বাবা! চাঁড়ালটা চাঁদকে এত বার খেলে আগুনপানা বলে বুঝি সূর্জ্জিকে খেতে পারে না?" পাঠক! ভাবিয়া দেখুন কি অভাবনীয় ভাবুকতা! কি আশ্চর্য্য কল্পনা! মহাকবি মাঘ অতলস্পর্শ ভাবস্রোতে মগ্ন হইয়া যে অপ্রস্তুত প্রশংসা ভেদের নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা বালকের সরলবুদ্ধিসুলভ। মাঘ কবি লিখিয়াছেন,—

তুল্যেঽপরাধে স্বর্ভানুর্ভানুমন্তং চিরেণ যৎ।
হিমাংশুমাশু গ্রসতে তন্ম্রদিম্নঃ স্ফুটং ফলম্। ২। ৪৯

চণ্ডালরাহু চন্দ্রসূর্য্যকে গ্রাস করে; অপরাধ ত উভয়েরই সমান। কিন্তু সূর্য্যকে কচিৎ কখন গ্রাস করিতে পারে; পরন্তু চন্দ্রকে নিস্তেজ পাইয়া মনে করিলেই গ্রাস করিয়া ফেলে। এই অকৃত্রিম গম্ভীর ভাব সহজেই শিশুর চিত্তভূমীতে নাচিয়া উঠিল। শিশু সহজেই উভয়ের বলাবল এবং ক্ষমতার ফলাফল বুঝিতে পারিল।

এখন দেখুন কাব্য তবে কেমন সামগ্রী? পণ্ডিতেরা বলেন,—

বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং দোষাস্তস্যাপকর্ষকাঃ।
উৎকর্ষহেতবঃ প্রোক্তাগুণালঙ্কাররীতয়ঃ।

কিন্তু সে রসাত্মক বাক্য কেমন? কিসে রস উথলিয়া পড়ে? ব্যাজোক্তিতেই রস; কবি যেন কিছুই জানেন না, শিশুর ন্যায় বিষয়বোধপরিশূন্য। ভাণ করিয়া কি বলিলেন,—কথাটা অযুক্ত, যেন অতীব অসার, প্রকৃত তত্ত্ব গোপন রাখিয়া কবি কেমন একটুকু একটুকু ছল করেন; এই রাগদেশ বাক্যবিন্যাসেই কাব্যের যত অলঙ্কার যত সৌন্দর্য্য। কবির বাক্যে বালোচিত সরল কপটতা, তাহাতে কেমন যেন নূতন প্রকার মাধুর্য্য আছে। অপ্রকৃত

কাল্পনিক পদার্থে কবির অদ্ভুত কাব্যসংসার নির্ম্মিত হইয়া থাকে। চিত্তে যে প্রকার চিত্র অঙ্কিত হয়, বাক্‌চাতুর্য্যে অনুরঞ্জিত করিয়া কবি তাহাই প্রকটিত করেন। আদি কবিদিগের চিত্রচাতুর্য্যে অলৌকিক কল্পনাই অধিক। তাঁহাদের চিত্রের কারুকার্য্য কল্পনায় ভিন্ন, চিত্রতুলিকামুখে কখন ফলিত হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহার কারণ এই, আদি কবিরা এ অদ্ভুত জগৎ চিত্র বিচিত্র চক্ষে দৃষ্টি করিতেন, তাঁহাদের চিত্রপটে বিচিত্র ভাবের অলেপ্য অঙ্গুলিখিত হইত। অধুনা দর্শন শাস্ত্র, জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুশীলন দ্বারা বিশ্বব্যাপারের কতক গূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়া পড়িতেছে। ইন্দ্রধনু কি, কেহই বা নানা বর্ণে চিত্রিত, এবং ধনুকের ন্যায় বক্রাকার; চন্দ্র কি প্রকার পদার্থ, কি নিমিত্ত উহার অঙ্ক কলঙ্কদূষিত, উহার অমৃত-নিস্যন্দী রশ্মিই বা কেন এত তৃপ্তিকর, নৈসর্গিকতত্ত্ব জ্যোতিষতত্ত্ব এই সমস্ত বৃত্তান্ত তোমাকে বলিয়া দিতেছে। এখন তুমি কবিচক্ষে আর জগৎ-চিত্র অবলোকন কর না; এখন তুমি বৈজ্ঞানিক হইয়াছ। পূর্ব্বে তুমি চিত্র দেখিতে, চিত্রের অনুকৃতি তুলিয়া লইতে। এক্ষণে চক্ষের দেখায় আর তোমার কৌতূহল শান্তি হয় না। তখন বাহ্যচিত্রের দ্রষ্টা ছিলে, এখন অন্ত-র্ভূত সূত্রানুসূত্রের পরিচ্ছেত্তা হইয়াছ। পূর্ব্বে চিত্রের উপর চক্ষু বুলাইলেই তোমার হৃদয় আহ্লাদে উচ্ছলিত হইত; এখন তোমার অনুসন্ধিৎসা বৃত্তি প্রবল হইয়াছে; তুমি চিন্তাশীল বিরস, গাঢ় ভাবনায় ডুবু ডুবু,—আর তেমন রসময় ভাবে ডুবু ডুবু নও;—এক মনে এক ধ্যানে চিত্রখানি কাটি-তেছ, ছিঁড়িতেছ, তাহার অন্তরতর নিগূঢ় গুহায় প্রবিষ্ট হইতেছ। আদিম কবিরা সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। বিজ্ঞানানুশীলন তাঁহাদের বৃত্তি ছিল না; ইন্দ্রধনু দেখিলেন, আহ্লাদে একেবারে অভিভূত,—এ কি! মেঘের কোলে ও কি ভাসিল! জলধর অঙ্গে এমন বিচিত্র ধনুক কেন? এ দিকে চক্‌মক্‌ চপলার স্ফুরবেগ; এ দিকে আবার বজ্রপাতের কড় মড় বিকট নির্ঘোষ,—নব ভাবুকের মন রসে ঢুবু ঢুবু, ভাবে ডুবু ডুবু,—সরল চক্ষে দেখিলেন, সরল চিত্তে ভাবিলেন; সরল ভাবে বলিয়া বসিলেন,—ধনুকে ব্রহ্মাস্ত্র জুড়িয়া কে কোথায় বাণ নিক্ষেপ করিল,—ভয়ে জৈমিনি জৈমিনি স্মরণ করিয়া উঠিলেন।

সরল চক্ষে, সরল বুদ্ধিতে অদ্ভুত জগৎ চিত্র না দেখিলে মনে অভিনব ভাবোদয় হয় না। প্রাকৃত গ্রাম্য লোকের বুদ্ধি সরল, তাহাদের বিশ্বাসও

সরল; সুতরাং তাহাদের কল্পনা অপার। তুমি সত্যের অনুশীলন করিতেছ; তাহারা বনমালাবিভূষিতা কল্পনা সুন্দরীর হাত ধরিয়া নাচিতেছে। তুমি বিশ্বতত্ত্বের কতক জানিয়াছ, কতক জানিতেছ, চক্ষুর দৃষ্টি একপক্ষে অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছে। প্রাকৃত লোকের চক্ষে ঝাপ্সা ঘোরে ভেল্কি লাগিয়াছে, তাহারা জগতকে কেমন কেমন দেখিতেছে; তাহাদের সত্যতত্ত্বোন্নয়নের ক্ষমতা নাই, কল্পনাই তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব, জগতটাকে কেমন কেমন ভাবিতেছে।

মনুষ্যের যত বয়োবৃদ্ধি হয়, জগতচিত্রের সকলি পুরাতন হইয়া পড়ে। প্রকৃতিচ্ছবির আর নূতনত্বটুকু থাকে না। সেই হাসি, সেই অঙ্গের ভাঁমন যেন পুরাণ পুরাণ দেখায়। বাসন্তিক হিল্লোলে কুসুমমালিনী লতা আর যেন তেমন করিয়া দুলে না; কোকিল যেন তেমন করিয়া ডাকিতে ভুলিয়া গিয়াছে। এখন আর সে রসালভাব মনে উদয় হয় না। শৈশবে কোকিলের কালরূপ দেখিতাম, তার কণ্ঠের মধুর স্বর শুনিতাম,—আর দর দর করিয়া চক্ষে জলধারা পড়িত। আর সে চিন্তা নাই, এখন তর্ক-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, কার্য্য-কারণ কলের বিচার করিয়া থাকি। বিশুদ্ধ রক্তবর্ণ শোণিতে পরিষ্কৃত মাংসপেশীতে উৎপন্ন হইয়া কোকিলের পক্ষ কৃষ্ণবর্ণ হইল কেন,—এখন তাহার বক্ষোব্যবচ্ছেদ করিতে বসিয়াছি। আর রস-শাস্ত্রের মাধুর্য্যে আসক্তি নাই, এখন দুর্ব্বোধ তত্ত্বের মর্ম্মভেদ করিতে অগ্রসর হইয়াছি। অতএব বাল্যাবস্থা এবং প্রৌঢ়াবস্থার ভাবে প্রভেদ অনেক। বয়োবৃদ্ধি হইলে আর সে বাল্যোচিত ভাবুকতাটুকু থাকে না।

আদি কবিরা নূতন প্রকৃতির অঙ্কে বসিয়া ক্রীড়া করিতেন; বিচিত্র নূতন নূতন ভাব তাঁহাদের সমক্ষে হাসিতে থাকিত। আজ সেই ভাব পুরাতন, অধুনাতন নূতন কবির আর নূতন ভাব নাই। তখন সেই ভাব-গুলির কাছে আদি কবিরা ঋজুমতি শিশুর তুল্য ছিলেন (৪)। তাঁহারা ভাবের ভাণ্ডার শূন্য করিয়া দিয়াছেন, প্রকৃতির অঙ্গে আর নূতন রত্ন নূতন আভরণ নাই। আদি কবিরা সকলি উন্মোচন করিয়া লইয়াছেন; এখন

---

(4) In a rude state of society men are children with a great many variety of ideas it is therfore in such a state of society that we may expect to find the poetical temperament in its highest perfection.

Macaulay.

যাহা বলিব, তাহাই পুনরাবৃত্তি হইবে,—কিছুতে আর নূতনত্ব নাই। ভাবের সৌন্দর্য্যই বল আর অর্থের সৌন্দর্য্যই বল, বারম্বার আবৃত্তি করিলে তাহার রস নিষ্পিষ্ট হয়,—আর তাহাতে সৌন্দর্য্য থাকে না। একটী সুশ্রাব্য মনোহর স্বর বারম্বার শুনিলে আর শ্রুতিসুখকর বোধ হয় না। ইতর ভদ্র সকলেই পুনঃ পুনঃ যে ভাবাত্মক বাক্যের আবৃত্তি করে, তাহার আর সৌন্দর্য্য থাকে না (৫)। কিন্তু আদি কবিরা অক্ষুণ্ণ পথের পথিক। তাঁহাদের চিত্রিত ছবিগুলি নূতন; সুতরাং তাহার মনোহারিত্বও অপূর্ব্ব। তাঁহারা নবপ্রস্ফুটিত ফুলের মালা পরিয়া গিয়াছেন, আধুনিক কবিরা বাসি ফুলের মালা পরিতেছেন, সুতরাং তাহা ম্লান হইয়া গিয়াছে।

জগৎ ছবির চিত্রচাতুর্য্যের এবং মনুষ্যের দশাবর্ত্তনের বর্ণনাবাহুল্য লইয়াই কবির কবিত্ব। যেমন কতকগুলি বর্ণ পর্য্যায়ানুসারে বিভিন্ন স্থানে উপন্যস্ত করিলে কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট বারের অতিরিক্ত এ প্রক্রিয়া সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই (৬); তদ্রূপ জগতের চিত্রচাতুর্য্যের এবং মনুষ্যের দশাবর্ত্তেরও কতিপয় নির্দ্দিষ্ট পর্য্যায় আছে; সেইগুলি সমাপ্ত হইলে আর নবীনতর উপন্যাস দেখাইবার উপায় নাই। কোন কবি সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ বর্ণনা করিলেন, কেহ ভয় কেহ অভয়; কেহ সম্পদ কেহ বিপদ অবিকল বর্ণে চিত্রিত করিলেন; দশাবর্ত্তনের সকল পর্য্যায় নিঃশেষিত হইল, কবিরও কবিত্ব ফুরাইল। এই বিচিত্র জগৎ-চিত্রের সকল অঙ্গেই আদি কবিরা তূলিকা সংযোগ করিয়াছেন, তাহার কোন অঙ্গ আর অবশিষ্ট নাই। সুতরাং নূতন কবির পক্ষে এখন সকলি পুরাতন হইয়াছে।

---

(5) The great masters in composition know very well that many an elegant phrase becomes improper for a poet or an orator when it has been debased by common use. Addision

(৬) পর্য্যাবর্ত্ত এবং সমবায়ের (Permutations and combinations) ব্যবস্থানুসারে কতকগুলি পদার্থের পর্য্যায়ানুসারে কেবল কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সংস্থান সিদ্ধ হয়। তদতিরিক্ত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ক, খ, গ, তিনটী পদার্থ; তন্মধ্যে দুটী একত্র লইয়া বিভিন্ন সংস্থানে স্থাপিত করিলে কখ, কগ, খক, খগ, গক, গখ। এবং সমস্তগুলি একত্র লইয়া বিভিন্ন সংস্থানে স্থাপিত করিলে কখগ, কগখ, খকগ, গকখ, খগক, গখক। এই কয়েকটী পর্য্যায় পরিসমাপ্ত হইলে আর উহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন সংস্থানে স্থাপিত করিবার উপায় নাই। তদ্রূপ দশাবর্ত্তনের যতগুলি পর্য্যায় আছে, তাহা পরিসমাপ্ত হইলে আর নূতন চিত্র দেখাইবার উপায় থাকে না।

সেই দিন সেই রাত্রি, সেই ঋতু, সেই চন্দ্রসূর্য্য তারকাভূষিত গগনমণ্ডল সেই ভয়ঙ্কর বাত্যাবিঘূর্ণন; সেই বজ্র, সেই বিদ্যুৎ,—আদি কবিরা তাহাদের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তুলিকায় তুলিয়াছেন; মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত, কষ্টের পরা কাষ্ঠা বর্ণন করিয়াছেন; এখন কবি নূতন; কিন্তু প্রকৃতির অঙ্গভঙ্গী সেই,—তাহার নূতনত্ব গিয়াছে। তাহার সকল অঙ্গই অনুরঞ্জিত হইয়াছে, নবীন কবি আর কোথায় তুলী বুলাইবেন? তাঁহাকে নিরঙ্কিত পথে পাদ-বিক্ষেপ করিতে হইবে; কিন্তু অন্যত্র পথ খুজিয়া মিলে না,—চতুর্দ্দিকেই পাদাহত চিহ্ন। আদি কবিদিগের এ ক্লেশ, এ অসুবিধা ছিল না। তাঁহারা যে দিকে পাদবিক্ষেপ করিলেন, সেই দিকেই নূতন পথ; যাহাতে তুলী টানিলেন, তাহাই নূতন।

বালকের নিকটে কিম্বা প্রাকৃত ব্যক্তির নিকটে একটী গল্প কর, তাহা তদ্গত চিত্তে শুনিবে, কৌতুকে অভিভূত হইয়া পড়িবে। কিন্তু সুশিক্ষিত ব্যক্তির নিকট সেই গল্প কর, তাঁহার মনে কিছু মাত্র ভাবোদ্রেক হইবে না। পূর্ব্বে কবিরা এক একটী শ্লোক রচনা করিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইতেন; নৃপতি তৎশ্রবণে মোহিত হইয়া যাইতেন। বিক্রমাদিত্য প্রভৃতির সকল রাজসভাই কবিরত্নে অলঙ্কৃত থাকিত। প্লেটো বলেন, গ্রীসদেশীয় ভাটেরা হোমরের কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে গদগদ চিত্তে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। কথিত আছে ভূমধ্যসাগরগর্ভভূত কাপ্রিয়া দ্বীপের সান্নিধ্যে (৭) সাইরেন দেবী বংশীযোগে এমন সুমধুর গান করিতেন যে, নাবিকেরা মাধুর্য্যমদ-বিহ্বল চিত্তে তন্ময় হইয়া হর্ষে উদাস হইয়া পড়িত; বিলুণ্ঠিত শরীর হইতে কখন প্রাণ বায়ু উড়িয়া যাইত, তাহা জানিতে পারিত না। এটা গল্প; কিন্তু আদিম লোকেরা কাব্য ও সংগীতে কত মোহিত হইতেন, ইহা তদ্বিষয়ের সুন্দর উদাহরণ স্থল, সন্দেহ নাই। ওয়েল্‌স এবং জার্ম্মণ রাজ্যে ভাটেরা এমন কবিতা আবৃত্তি করিত যে, শ্রোতৃগণের চিত্ত ভাবে একেবারে গলিয়া যাইত। কিন্তু এখন সেই সমস্ত কবিতা শ্রবণে কাহারও চিত্ত বিচলিত হয় না। এক্ষণে শিক্ষিত সমাজের লোক নানাবিধ ভাবের কবিতা অহরহঃ আবৃত্তি করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট কিছুই নূতন বোধ হয় না।

---

(7) Next where the sirens dwell you plow the seas; their song is death and makes destruction please. Pope.

কোন অভিনব বিষয় দেখিলে চিত্ত কি প্রকার বিচলিত হয়,—দেখুন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থের মতে, পূর্ব্বে ভূমণ্ডলে জরা রোগ শোক কিছুই ছিল না; পাপ বিষফল ভোজনে অবনীতে রোগ শোক মৃত্যুর সঞ্চার হইল। রোগের দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণায় রোগী আতারি কাতারি খাইতেছে। আদম এমন বিসদৃশ কাণ্ড কখন দেখেন নাই, শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে রোগীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—(৮) কি ভীষণ বিকট হস্তপদাদির আস্ফালন! কি গভীর আর্ত্তনাদ, রোগী হতাশ হইয়া কখন এ শয্যায় কখন ও শয্যায় ছট্ফট্ করিতেছে। আবার অজেয় কাল করাল দণ্ড হস্তে দণ্ডায়মান; উদ্যত প্রহরণ চালনা করিতেছে, কিন্তু সহসা প্রহার করিতেছে না।

কি মর্ম্মভেদী ভয়ঙ্কর চিত্র! আদমের চক্ষে দর দর বাষ্পধারা বহিতে লাগিল; তিনি বলিলেন—কি পাষাণ হৃদয় এই দৃশ্য নিরশ্রুনয়নে অধিক ক্ষণ দেখিতে পারে? আদম ত সহিতে পারিল না,—তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িল। কি!—(৯) আদম অবলানারীগর্ভসম্ভূত নয়, তবু তার এত শোকোদ্বেগ?—আদম কখন মৃত্যু দেখেন নাই,—আজি মৃত্যু দেখিলেন। কিন্তু সে দিকে আর চাহিতে পারিলেন না। কি সর্ব্বনাশ! এই কি মানুষের চরম দশা?—(১০) তবে আমি নাকি মৃত্যু দেখিলাম? পরিণামে এইরূপে নাকি ধূলিসাৎ হইতে হইবে? আদম অসংস্থিত চিত্তে বিলাপ করিলেন; আর মৃত্যুর শ্রীহীন পাণ্ডুর বদন দেখিতে পারিলেন না। তিনি এই সমস্ত ব্যাপারে অভ্যস্ত ছিলেন না, তাঁহার হৃদয় ফাটিতে লাগিল; কিন্তু ফাটে কই? বোধ হইতেছে ফাটিয়া খান্ খান হইল অথচ ফাটিল না,—কেবল ফাটার যন্ত্রণাভোগ মাত্র। কবিদের একি ভয়ানক কল্পনা!—কি নিদারুণ মর্ম্মব্যথার পরিচয়! আদম বলিলেন,—মৃত্যু দোর্দ্দণ্ড দণ্ড হস্তে দাঁড়াইয়া আছে, এক একবার

---

(8) Dire was the tossing deep the groans; despair tended the sick, busiest from coach to coach; and over them triumphant death his dart shook but delayed to strike,— Milton.

(9) Sight so deform what heart of rock could long dry-ey'd behoald? Adam could not but wept though not of woman born. Milton.

(10) But have I now seen Death? is this the way I must return to native dust?— Milton.

তাহা উদ্যত করিতেছে, কিন্তু প্রহার করিতেছে না। এ প্রকার লোমহর্ষণ চিত্র আর কিসে উঠিতে পারে? ভট্ট ভবভূতি লিখিয়াছেন—

দলতি হৃদয়ং গাঢ়োদ্বেগং দ্বিধা তু ন ভিদ্যতে।
বহতি বিকলঃ কায়ো মোহং ন মুঞ্চতি চেতনাম্।
জ্বরয়তি তনূমন্তর্দাহঃ করোতি ন ভস্মসাৎ।
প্রহরতি বিধির্মর্মচ্ছেদী ন কৃন্ততি জীবিতম্।

দারুণ উদ্বেগে হৃদয়কে দলন করিতেছে, কিন্তু তবু ফাটিয়া দ্বিখণ্ড হইতেছে না। দুঃসহ মনোবেদনায় বিকল হইয়া পড়িতেছি, কিন্তু তবু চৈতন্য যাইতেছে না। অন্তর্দাহে শরীর জর জর হইতেছে, কিন্তু এককালে পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইতেছে না। আর মর্ম্মভেদী বিধি এত প্রহার করিতেছে, কিন্তু প্রাণ যাইতেছে না।

কি ভয়ানক! কি বিসদৃশ বিকট চিত্র! ভাবিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আদি কবিরাই ভাবুক, তাঁহাদের চিত্রই অকৃত্রিম। সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে (১১) কাব্যও জনসমাজ হইতে অন্তর্হিত হয়। কাব্য নিবিড় নিকুঞ্জবনের প্রসূনরত্ন, সে হিরণ্য ভবনের মণিমাণিক্য নহে। বনচারীরা; গোষ্ঠের রাখালেরাই তাহার মর্ম্ম বুঝে, তাহারাই কাব্যামৃতের রসাস্বাদের অধিকারী। তবে শিক্ষিত সমাজে কেহই যে কবি হইতে পারিবেন না, এমত নহে। যদি কবি হইতে বাসনা কর, (১২) পূর্ব্ব সংস্কার বিস্মৃত হও; বাল্যোচিত চপল ভাব ধারণ কর। আবার নূতন চক্ষে এই জগৎকে দেখিতে থাক। তবে কাব্যের রসময় আস্বাদনে অধিকারী হইবে, তোমার হৃদয়কাননে কাব্যকুসুমের মঞ্জরী বিকসিত হইবে (১৩)

---

(11) We think that as civilisation advances, poetry almost necessarily declines. Macaulay.

(12) He who in on enlightened and literary society aspires to be a best poet must first become a little child. He must take to pieces the whole of his mind. he must unlearn much of that knowledge which has perhaps constituted hither to his cheif title to superiority.

Macaulay.

(১৩) আমরা আরও একটী আশ্চর্য্য দেখিতে পাই, ইতর জাতিরাই অধিক স্বরবান্ হয়। প্রাকৃত লোকদিগের মধ্যে অনেকেরই কণ্ঠ অতি মিষ্ট; কিন্তু সম্পন্ন ভদ্র লোকের স্বর তত মিষ্ট হয় না এবং তাঁহাদের মধ্যে অল্প লোকেই সুগায়ক হন।

আধুনিক কবিদিগের এক পক্ষে সুবিধা অনেক, আবার পক্ষান্তরে অসুবিধাও অনেক। পূর্ব্বাদর্শ দৃষ্টে তাঁহারা ভাষাটী মার্জ্জিত করিয়া লইতে পারেন, কাব্যের দোষভাগ পরিত্যাগ করিয়া গুণভাগ গ্রহণ করিতে পারেন। আবার অসুবিধাও বিস্তর; তাঁহাদিগকে অনেক বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিতে হয়। প্রথমতঃ একটী অক্ষুণ্ণ পটে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে, তৎপরে তাহাকে অদৃষ্টপূর্ব্ব বর্ণে অনুরঞ্জিত করিতে হইবে। এমন ভাগ্যবান কবি অল্প। মহানুভব কালিদাস কবি সকল বিপত্তি অতিক্রম করিয়া তাঁহার চিত্রপট অলৌকিক বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন।

সভ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে শব্দনির্ব্বাচন বিশুদ্ধ কাব্য রচনার পক্ষে আর একটী প্রধান প্রতিবন্ধক। চলিত ভাষায় যে প্রকার মনের ভাব স্ফুটিত হয়, আভিধানিক শব্দে তেমন হয় না। আদিম কবিরা প্রাকৃত লোক ছিলেন, (১৪) প্রাকৃত শব্দে তাঁহাদের কাব্য রচিত হইয়াছে; সুতরাং সে কবিতা নয় ত,—যেন মনের ছাঁচটী অবিকল তুলিয়া আনা হইয়াছে। এখন তদ্রূপ ভাষায় কাব্য রচনা করিলে, তুমি বিকট নাক সিঁকট করিয়া দুহাতের দশ অঙ্গুলিতে গ্রাম্যতা দোষ দেখাইবে,—কাব্য স্পর্শ করিবে না। আদি কবিরা সহজে গ্রাম্য লোক ছিলেন, তাঁহাদের ভাষাও গ্রাম্য, অতএব কাব্যে আর গ্রাম্যতা দোষ ঘটিবে কি?—তাঁহাদের সরল ভাষায় গ্রথিত শ্লোক জনসমাজে নিন্দার্হ হইত না। পণ্ডিতেরা বলেন,—সাহিত্য ক্ষেত্রে কাব্যই শ্রেষ্ঠ, আবার কাব্যের মধ্যে নাটকই শ্রেষ্ঠ—ইহার কারণ সহজেই উপলব্ধ হয়। প্রয়োজনানুসারে নাটকের কথা গুলি চলিত ভাষায় লিখিত হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাতে মনের ঠাট ভাবভঙ্গী অকৃত্রিম রূপে উঠিয়া আইসে। কবির স্বভাব,—তিনি ন্যাকা; কথা বলেন আর একটু একটু ন্যাকাম করেন। সে ন্যাকাম টুকু চলিত শব্দেই স্ফুটরূপে ব্যক্ত হয়।

পূর্ব্বে প্রাকৃত লোকের মধ্যে প্রহেলিকা ভূরি পরিমাণে চলিত ছিল। সকলেই সমস্যা বড় ভাল বাসিতেন; সকল কাজেই চিত্রচাতুর্য্য ও রচনা কৌশল দেখাইতে চাহিতেন। তাঁহাদের শব্দ সম্বল ছিল না, চিত্রময় ভাবকে নানা

(১৪) এখানে বেদব্যাস, বাল্মীকি প্রভৃতি প্রাকৃত কবি বলিয়া উল্লিখিত হইতেছেন না। প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের আদি প্রাকৃত কবি নাই। তবে অপেক্ষাকৃত প্রাকৃত কবিদিগকে লক্ষ্য করিয়াই এমন নির্দ্দেশ করা হইল। অতঃপর নাটকোক্ত প্রাকৃত ভাষায় কিরূপ মনের ভাব ব্যক্ত হইয়া থাকে, তাহা কথিত হইতেছে।

প্রকারে সাজাইতেন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কবিকঙ্কণ, তুলসীদাস প্রভৃতি কবিদিগের রচিত বিস্তর হিয়ালি দৃষ্ট হয়। প্রাকৃত লোকেরা কথায় কথায় আজও কত হিয়ালি বলেন। প্রাচীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা চিত্রময় সমস্যা রচনা করিতে ভাল বাসেন। পূর্ব্বে রাক্ষসেরা রাজসভায় আসিয়া সমস্যা পূরণ করিতে দিত। প্রাচীন মিশরের হাইরোগ্লিফিক্স যদি চ বর্ণজ্ঞানের অসদ্ভাবে ব্যবহৃত হইত,কিন্তু তাহাও এক প্রকার সমস্যা বলিতে হইবে। প্রাচীন গ্রীস এবং রোমেও পণ্ডিতেরা সমস্যাপ্রিয় ছিলেন। মহাভারত-গ্রথিত ব্যাসকূট ও অন্যান্য অনেক সঙ্কেত বাক্যকেও সমস্যা বলিতে হইবে। সভ্যতার উন্মেষে সমস্যার প্রতি লোকের আর তাদৃশ অনুরক্তি থাকিল না। ব্যবদেশই তাঁহাদের অধিক মনঃপূত হইল। তজ্জন্য অপেক্ষাকৃত নবীনতর পুস্তকে সমস্যা দৃষ্ট হয় না।

প্রকৃত কবি অস্ফুটরূপে চিত্রের কেবল আভাসটুকু টানিয়া রাখেন; তাহাতেই সকল ভাব বিন্যস্ত থাকে। সহৃদয় রসিক পাঠক তাহার যথাস্থানে উপযুক্ত বর্ণ ফলাইয়া লন। শকুন্তলা মন্মথপীড়ায় ব্যথিত; অন্তর্দাহে শরীর জর জর হইতেছে। অনসূয়া এবং প্রিয়ম্বদা পদ্মপত্রে ব্যজন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—

হলা সউন্দলে অবি সুহয়দি দে ণলিণীপত্তবাদো ?

কেমন শকুন্তলা, পদ্মপাতার বাতাসে এখন একটু স্বস্তি বোধ হচ্চে না ?

সখীদের সস্নেহ বাক্যে শকুন্তলা বলিলেন—

কিং বীঅঅন্তি মং সহীও ?

সে কি! তোমরা আমাকে বাতাস কচ্ছ নাকি ?

বলিবেন ত! স্নিগ্ধ নলিনী পত্র ব্যজনে কি সে জ্বালা যায় ? শকুন্তলা জানিতে পারিবেন কি, তাঁর মনের ভিতর দারুণ সন্তাপ ধূ ধূ করিয়া জলিতেছে। পাঠক! দেখুন, শকুন্তলা যদি বলিতেন,—না সখি! আমার অন্তর্জ্বালা এত অধিক যে, সামান্য পদ্মপত্রের ব্যজনে আমার কিছুই সুখবোধ হইতেছে না। তোমরা বাতাস করিতেছ কি না তাহা আমি জানিতেও পারিতেছি না।—তবে কি এ রসটুকু থাকিত ? এখানে কবি কেবল চিত্রের আভাসটুকু টানিয়া দিয়াছেন; কয়েকটী চুম্বক শব্দই পর্য্যাপ্ত হইয়াছে; তাহাতেই সকল ভাবভঙ্গী নিহিত রহিয়াছে; সহৃদয় পাঠক তাহার উপর বর্ণ ফলাইয়া লউন। আবার বিচার করুন, দীর্ঘ সমাস যুক্ত বড় বড় আভি-

খানিক শব্দে যদি এই ভাবটী প্রকটিত হইত, তবে কি এত রস থাকিত? কখনই নহে। চলিত ভাষায় স্ফুটরূপে মনের ভাব ব্যক্ত হয়। অতএব আদি কবিই যথার্থ ভাবুক, প্রাকৃত শব্দেই তাঁহার মনের ভাব সুন্দররূপে চিত্রিত হয়।

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।

ত্রিভঙ্গ মুখোপাধ্যায়।

বালুকারাশিনিক্ষিপ্ত জল যেমন ক্ষণকাল মধ্যে শুষ্ক হইয়া যায়, জলবিম্ব যেমন ক্ষণে বিলীন হয়, নিবিড় নীরদজাল যেমন দক্ষিণ মারুতের মৃদুমন্দ সঞ্চারে নিমিষমধ্যে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের উজ্জ্বল শিখা যেমন ক্ষণকাল মধ্যে নির্ব্বাণ হইয়া যায়, ত্রিভঙ্গের ক্ষণোন্মীলিত চৈতন্য তেমনি ক্ষণমধ্যে নির্ব্বাণ হইয়া গেল। সে গাঁজাখোরদিগকে লইয়া যেমন প্রতিদিন সভা করিয়া থাকে, তেমনি সভা করিয়া বসিয়াছে, নানাপ্রকার রসাভাস হইতেছে, মিষ্ট কথোপকথন চলিতেছে, রসাল বক্তৃতা হইতেছে, এমন সময়ে এক জন গাঁজাখোর আসিয়া বলিল, বাবা! আজ বড় তামাসা হয়েছে, আমাদের গোবিন্দ খুড়ো কয়েকটী চক্ চকে টাকা হাতে করে আস্‌তেছিলেন, এক শালার চিল পুঁটিমাছ মনে করে ছোঁ মেরে একটা টাকা নিয়ে গেল, খুড়ো আমাদের অমনি সেই সঙ্গে সঙ্গে চিল ধর্ত্তে উড়লেন। আমি দেখে এলেম, চিলে আর খুড়োতে ৫। ৭ হাত তফাৎ, চিলও উড়ছে খুড়োও উড়ছেন, খুড়ো এতক্ষণ চিল ধরলেন বোধ হয়।

পুকুরে মাছের ঝাঁক ভাসছে, এমন সময় একটা ঢেলা পড়িলে যেমন শব্দ হয়, সভামধ্যে বা গোবিন্দ খুড়ো! বা গোবিন্দ খুড়ো! বলে তেমনি একটা শব্দ উঠিল, ক্ষণমধ্যে সে শব্দ লীন হইয়া গেল। এক জন গাঁজাখোর এক পার্শ্ব হইতে বলিল "বাবা তুমি সত্যি সত্যি দেখলে, না, গাঁজার ঝোকে দেখলে, মানুষ কি কখন উড়তে পারে? আর এক জন গাঁজাখোর আর দিক হইতে বলিয়া উঠিল, বাবা তুমি থাক, আমি উত্তর দিচ্চি। মানুষে না পারে, এমন কি কাজ আছে? দেখ মানুষ মশার মত কথায় কথায় কুট কুট্ করে কামড় খেতে পারে; গাছের মত নিশ্চল হয়ে বসে থাক্‌তে পারে, মাছের মত জলে সাঁতার দিতে পারে, সকল পারে, আর উড়তে পারে না? বাবা! তোমরা কি কখন নারদ খুড়োর কথা শুন

নাই? তিনি যে ত্রিজগতে বেড়াতেন, আমি ত অনেক বার তোমাদের নিকটে সে কথা বলেছি। কেহ কি তোমাদিগকে বলে নাই যে মুনিদিগের অষ্টসিদ্ধি আছে? মুনিরা ইচ্ছামত স্থূল ও সূক্ষ্ম হইতে পারেন, লঘু ও গুরু হইতে পারেন, যেথা ইচ্ছা সেথায় যাইতে পারেন। দেবতার কৃপা হইলে আমরা সকলে এখনই উড়্‌তে পারি। বোধ হয়, গোবিন্দ খুড়োর প্রতি বাবা পঞ্চাননের কৃপা হয়েছে, তাই তিনি উড়তে পেরেছেন।

কথা শেষ হইতে না হইতে আর এক জন গাঁজাখোর আর এক দিক হইতে বলিয়া উঠিল, বাবা! সেকেলে বুড়োর মত কি বক্ বক্ করে বকুচো আষাড়ে গল্প করছ, দৈবশক্তির কথা ছেড়ে দাও বাবা! কলির দেবতা সব নিদ্রিত। এখন বিজ্ঞান শাস্ত্রের কথা বল। বিজ্ঞান বলে না হয় কি? এই বাবা! তুমি এখানে বসে আছ, কিছু জানতে পারবে না, যেমন বসে আছ, তেমনি থাকবে, বিজ্ঞানশাস্ত্র তোমাকে এক ক্রোশ পথ দূরে নিয়ে ফেলবে। আমাদের ভারতবাসিরা অলসপ্রধান, শরীর ও মনকে ক্লেশ দিতে চায় না। বিজ্ঞান শাস্ত্রের চর্চ্চায় হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম আছে বলে কেহ সে-মুখো হতে চায় না। ভারতবাসিরা পূর্ব্বে যেমন বালক ছিল, এখনও তেমনি বালক। বালকেরা যেমন দিদি মার কাছে উপন্যাস শুনতে ভাল বাসে, হাঁ করে উপন্যাস শুনে, কখন হাসে কখন বিষণ্ণ হয়, ভারতের শিক্ষিত যুবারাও সেইরূপ বালক, যুবা হয়েও সেইরূপ বালক, হাঁ করে কেবল উপন্যাস শুনতে ভাল বাসে। লেখা পড়া শিখে কতকগুলি দিদি মাও তৈয়ের হয়েছেন, তাঁহারা কেবল উপন্যাসই লিখছেন, দেশটা নষ্ট করেছেন। দর্শন বিজ্ঞানাদি যেন তাঁদের বাঘ। পূর্ব্বে কি এই ভারতবর্ষে বিজ্ঞান শাস্ত্রের চর্চ্চা ছিল না! নলরাজা প্রভৃতি বিজ্ঞান শাস্ত্রের কি না উন্নতি করিয়াছিলেন! এখন বেলুন বেলুন শুনছ, কিন্তু ব্যোমযান শব্দটা কোন্ দেশের সৃষ্টি? যদি ভারতে ব্যোমযান না থাকিত, তাহা হইলে এ শব্দটার কখন সৃষ্টি হইত না। ইউরোপের কেহ শ্রাদ্ধ করে না। সেখানে কি শ্রাদ্ধ শব্দ আছে? দিদি মারা উপন্যাস নিয়ে থাকুন, এস আমরা বিজ্ঞানের আলোচনা করি, বিজ্ঞান বলে উড়া যায় কি না, এখনই আমরা দেখাব। তমাক খেয়ে নেও।

এই বলিয়া সকলে জোরদম গাঁজা টানিল। ধোঁয়ায় আটচালা অন্ধকার হইয়া গেল। কেহ শালিক পাখীর ছটী পালক, কেহ চিলের, কেহ

কাকের, কেহ টিয়া পাখীর চুটী করিয়া পালক আটা দিয়া দুই পার্শ্বে বসাইয়া সকলে আটচালার চালের উপর গিয়া উঠিল। সেখান হইতে সকলে এককালে উড়িতে আরম্ভ করিল। পড়িয়া কাহার হাত ভাঙ্গিল, কাহার পা ভাঙ্গিল, কাহার কোমর ভাঙ্গিয়া গেল।

মনুসংহিতা।

সপ্তম অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ভৃগু ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে রাজধর্ম্ম বলিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, এক্ষণে সেই প্রতিজ্ঞা পরিপূরিত হইতেছে।

রাজধর্ম্মান্ প্রবক্ষ্যামি যথাবৃত্তোভবেন্নৃপঃ।
সম্ভবশ্চ যথা তস্য সিদ্ধিশ্চ পরমা যথা॥ ১॥

রাজধর্ম্ম বলিব। রাজার যেরূপ আচরণ হওয়া উচিত, তাঁহার যেরূপে উৎপত্তি হইয়াছে, এবং তাঁহার যেরূপে কার্য্য সিদ্ধি লাভ হয়, এ সমুদায়ও বলিব। টীকাকার বলেন, রাজন শব্দে কেবল ক্ষত্রিয় জাতিকে বুঝাইবে না। যিনি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রজাপালন করিবেন, তাঁহাকে বুঝাইবে। ধর্ম্ম শব্দে রাজার অনুষ্ঠেয় কার্য্য বুঝায়।

ব্রাহ্মং প্রাপ্তেন সংস্কারং ক্ষত্রিয়েণ যথাবিধি।
সর্ব্বস্যাস্য যথান্যায়ঙ্কর্ত্তব্যম্পরিরক্ষণং॥ ২॥

ক্ষত্রিয় যথাবিধি উপনয়ন সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া ন্যায়ানুসারে এই সমস্ত জগতের রক্ষা করিবেন।

রাজসত্তার প্রয়োজন প্রদর্শিত হইতেছে।

অরাজকে হি লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ॥ ৩॥

জগৎ রাজশূন্য হইলে সকলেই প্রবলের ভয়ে বিচলিত হয়, অতএব বিধাতা এই সমস্ত চরাচর জগতের রক্ষার্থ রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

যেরূপে রাজার সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহা বলা হইতেছে।

ইন্দ্রানিলযমার্কাণামগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রানির্হৃত্য শাশ্বতীঃ॥ ৪॥

ইন্দ্র, পবন, যম, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, কুবের ইহঁাদিগের সার গ্রহণ করিয়া রাজাকে নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

যস্মাদেষাং সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভ্যোনির্ম্মিতোনৃপঃ।
তস্মাদভিভবত্যেষ সর্ব্বভূতানি তেজসা॥ ৫॥

যে হেতু রাজা এই সকল দেবতার সার লইয়া নির্ম্মিত হইয়াছেন, অতএব ইনি নিজ তেজ দ্বারা সকল প্রাণীকে অভিভূত করিয়া থাকেন।

তপত্যাদিত্যবচ্চৈব চক্ষূংষি চ মনাংসি চ।
ন চৈনং ভুবি শক্নোতি কশ্চিদপ্যভিবীক্ষিতুং॥ ৬॥

যে হেতু রাজা সূর্য্যের ন্যায় নিজ তেজ দ্বারা দর্শকদিগের চক্ষু ও মন তাপিত করেন, অতএব পৃথিবীতে কেহ ইহঁার সম্মুখীন হইয়া দর্শন করিতে শক্ত হয় না।

সোগ্নির্ভবতি বায়ুশ্চ সোহর্কঃ সোমঃ সধর্ম্মরাট্।
সকুবেরঃ সবরুণঃ সমহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ॥ ৭॥

রাজা ইন্দ্র চন্দ্রাদির অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তিনি অগ্নি বায়ু সূর্য্য, চন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ ও ইন্দ্রের ন্যায় প্রভাবশালী হন।

বালোপি নাবমন্তব্যোমনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি॥ ৮॥

রাজা বালক হইলেও তাঁহাকে মনুষ্য বিবেচনা করিয়া অবজ্ঞা করিবে না। যে হেতু রাজা নররূপী দেবতা। দেবতাকে অবজ্ঞা করিলে যেমন পাপ হয়, রাজাকে অবজ্ঞা করিলে তেমনি পাপ হইয়া থাকে।

একমেব দহত্যগ্নির্নরং দুরুপসর্পিণং।
কুলন্দহতি রাজাগ্নিঃ সপশুদ্রব্যসঞ্চয়ং॥ ৯॥

যদি কেহ অনবধানতা বশতঃ অগ্নিকে পদমর্দ্দনাদি দ্বারা অবমানিত করে, অগ্নি কেবল তাঁহাকেই দগ্ধ করিয়া থাকে। কিন্তু রাজা অপরাদ্ধ ব্যক্তির পশু ও সুবর্ণ প্রভৃতি দ্রব্যাদি সহিত কুল দগ্ধ করেন।

কার্য্যং সোবেক্ষ্য শক্তিঞ্চ দেশকালৌ চ তত্ত্বতঃ।
কুরুতে ধর্ম্মসিদ্ধ্যর্থং বিশ্বরূপং পুনঃ পুনঃ॥ ১০॥

সেই রাজা নিজ কার্য্য,শক্তি ও দেশ কাল বিবেচনা করিয়া কার্য্যানুরোধে বহুরূপ ধারণ করেন, অর্থাৎ কখন কাহার প্রতি মিত্রভাব কাহার প্রতি বা শত্রুভাব কাহার প্রতি বা উদাসীন ভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন, অতএব

আমি রাজার প্রিয় রাজা আমাকে কিছু বলিবেন না, এরূপ ভাবিয়া কেহ যেন তাঁহাকে অবজ্ঞা না করে।

যস্য প্রসাদে পদ্মাশ্রীর্ব্বিজয়শ্চ পরাক্রমে।

মৃত্যুশ্চ বসতি ক্রোধে সর্ব্বতেজোময়োহি সঃ॥ ১১॥

যে রাজা প্রসন্ন হইলে মহৎ ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, যাঁহার পরাক্রমে জয় হয়, অর্থাৎ যাহার ঐশ্বর্য্য লাভের ইচ্ছা আছে, তিনি যদি রাজার অনুগত হইয়া থাকেন, তাঁহার ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। আর যাহার শত্রু আছে, তাহার শত্রু বধ হয়। পক্ষান্তরে রাজাকে রাগাইলে মৃত্যু নিশ্চিত। অতএব রাজার কোপ ভাজন হইবে না। যাহাতে তিনি প্রসন্ন থাকেন, সেই চেষ্টাই করিবে।

তং যস্তু দ্বেষ্টি সম্মোহাৎ সবিনশ্যত্যসংশয়ং।

তস্য হ্যাশু বিনাশায় রাজা প্রকুরুতে মনঃ॥ ১২॥

যে ব্যক্তি মোহ হেতু রাজার বিদ্বেষ করে অর্থাৎ তাঁহার অপ্রীতিকর কার্য্য করে, সে নিঃসংশয় বিনষ্ট হয়। রাজা তাহার বিনাশের নিমিত্ত শীঘ্র মনোনিবেশ করিয়া থাকেন।

তস্মাদ্ধর্ম্মং যমিষ্টেষু সব্যবস্যেন্নরাধিপঃ।

অনিষ্টঞ্চাপ্যনিষ্টেষু তদ্ধর্ম্মং ন বিচালয়েৎ॥ ১৩॥

যেহেতুক রাজা সর্ব্বতেজোময়। অতএব তিনি কর্ত্তব্য বলিয়া যে নিয়ম নিবদ্ধ করিবেন এবং অকর্ত্তব্য বলিয়া যে বিষয়ের নিষেধ করিবেন, তাহার অতিক্রম করিবে না।

তস্যার্থে সর্ব্বভূতানাং গোপ্তারন্ধর্ম্মমাত্মজং।

ব্রহ্মতেজোময়ন্দণ্ডমসৃজৎ পূর্ব্বমীশ্বরঃ॥ ১৪॥

ব্রহ্মা সেই রাজার নিমিত্ত সর্ব্বপ্রাণির রক্ষাকর্ত্তা নিজ পুত্র ব্রহ্মতেজোময় দণ্ডের প্রথমে সৃষ্টি করিয়াছেন।

তস্য সর্ব্বাণি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।

ভয়াদ্ভোগায় কল্পন্তে স্বধর্ম্মান্ন চলন্তি চ॥ ১৫॥

চরাচর সমস্ত জগৎ সেই দণ্ডের ভয়ে স্ব স্ব বিষয় ভোগে সমর্থ হইতেছে এবং স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্য হইতে বিচলিত হইতেছে না। দণ্ড ভয় না থাকিলে দুর্ব্বল ও ধার্ম্মিকেরা প্রবলের ও দুষ্টের দৌরাত্ম্যহেতু স্ব স্ব বিষয় ভোগ করিতে ও স্ব স্ব কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিত না।

তন্দেশকালৌ শক্তিঞ্চ বিদ্যাঞ্চাবেক্ষ্য তত্ত্বতঃ।

যথার্হতঃ সম্প্রণয়েন্নরেষন্যায়বর্ত্তিষু ॥ ১৬ ॥

রাজা দেশ কাল শক্তি এবং যাহার যেমন অপরাধ এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া ন্যায়ানুসারে অন্যায়কারী ব্যক্তির প্রতি সেই দণ্ড বিনিয়োজিত করিবেন।

সরাজা পুরুষোদণ্ডঃ স নেতা শাসিতা চ সঃ।
চতুর্ণামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মস্য প্রতিভূঃ স্মৃতঃ ॥ ১৭ ॥

সেই দণ্ডই বাস্তবিক রাজা ; কারণ, সে দণ্ড না থাকিলে রাজা রাজশক্তি প্রয়োগ করিতে পারিতেন না। সেই দণ্ডই পুরুষ, অর্থাৎ পুরুষের ন্যায় ক্ষমতাপন্ন। সেই দণ্ডই সকল কার্য্যের সাধক। সেই দণ্ডই শাসনকর্ত্তা, কারণ সেই দণ্ডের প্রভাবে আজ্ঞাদানাদি কার্য্য সম্পাদিত হয়। সেই দণ্ডই চারি আশ্রমের ধর্ম্মরক্ষার প্রতিভূ স্বরূপ, মনু প্রভৃতি মুনিগণ এই কথা বলিয়াছেন।

দণ্ডঃ শাস্তি প্রজাঃ সর্ব্বাদণ্ড এবাভিরক্ষতি।
দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি দণ্ডন্ধর্ম্মং বিদুর্বুধাঃ ॥ ১৮ ॥

দণ্ডই সকল প্রজাকে শাসন করে, দণ্ডই সকল প্রজাকে রক্ষা করে, অতএব দণ্ডকে যে রাজা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। দণ্ড নিদ্রিত ব্যক্তির সম্বন্ধে জাগরিত থাকে অর্থাৎ দণ্ডভয়েই চৌর্য্যাদি উপদ্রব হয় না, পণ্ডিতেরা দণ্ডকে ধর্ম্মরক্ষার হেতু বলিয়া জানেন।

সমীক্ষ্য সধৃতঃ সম্যক্ সর্ব্বারঞ্জয়তি প্রজাঃ।
অসমীক্ষ্য প্রণীতস্তু বিনাশয়তি সর্ব্বতঃ ॥ ১৯ ॥

শাস্ত্রানুসারে সম্যক নিরূপণ করিয়া অপরাধানুরূপ দণ্ড বিধান করিলে সকল প্রজা অনুরক্ত হয়, আর যদি রাজা ক্রোধ লোভাদির বশীভূত হইয়া বিপরীত রূপে দণ্ড প্রণয়ন করেন, তাঁহার রাজ্য ও পুত্রাদি সমুদায় বিনষ্ট হয়।

যদি ন প্রণয়েদ্রাজা দণ্ডন্দণ্ড্যেষ্বতন্দ্রিতঃ।
শূলে মৎস্যানিবাপক্ষ্যন্ দুর্ব্বলান্ বলবত্তরাঃ ॥ ২০ ॥

যদি রাজা অনলস হইয়া দণ্ডনীয় ব্যক্তির প্রতি যথাশাস্ত্র দণ্ডবিধান না করেন, তাহা হইলে বলবানেরা দুর্ব্বলদিগকে শূলে পক্ক মৎস্যের ন্যায় ভক্ষণ করিয়া ফেলে। প্রবলেরা কেবল দণ্ডভয়ে দুর্ব্বলদিগের অনিষ্ট করিতে পারে না।

অদ্যাৎ কাকঃ পুরোডাশং শ্বাবলিহ্যাদ্ধবিস্তথা।
স্বাম্যঞ্চ ন স্যাৎ কস্মিংশ্চিৎ প্রবর্ত্তেতাধরোত্তরং ॥ ২১ ॥

যদি রাজা দণ্ড না করিতেন, তাহা হইলে কাকে যজ্ঞিয় দ্রব্য ভক্ষণ করিত এবং কুক্কুরে পায়সাদি লেহন করিত, কোন বিষয়ে কাহারও প্রভুত্ব